বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

নবম-দশম শ্রেণি

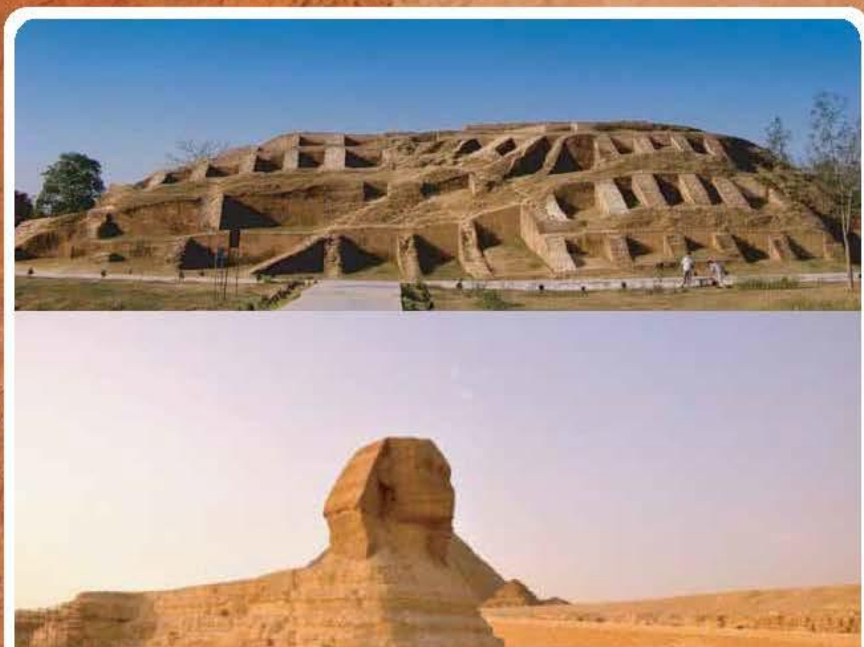

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা

নবম-দশম শ্রেণি

রচনায়

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সেলিম
প্রফেসর ড. সুলতানা নিগার চৌধুরী
প্রফেসর প্রদ্যুত কুমার ভৌমিক

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
সৈয়দ মাহফুজ আলী

প্রচ্ছদ
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ
পারফর্ম কালার গ্রাফিক্স (প্রাঃ) লিঃ

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত জনশক্তি। ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। জ্ঞানার্জনের এই প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাহিদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের বয়স, মেধা ও গ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনের জন্য জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকল্প-২০২১- এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে (নবম-দশম শ্রেণি) মানবিক শাখায় **বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা** একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। স্বাধীন দেশের প্রত্যেক নাগরিকের তার দেশ-জাতির ইতিহাস জানা জরুরি। ইতিহাসে আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তন ধারাবাহিকভাবে প্রতিফলিত হয়। তাই, ইতিহাসচর্চার মাধ্যমেই একজন নাগরিক তার নিজ দেশের ইতিহাস, জাতিসত্ত্বা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও বিশ্বসভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হবে। **বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা** পাঠ্যপুস্তকটিতে মানবিক বোধসম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাসমৃদ্ধ নাগরিক গড়ে তোলার বিষয়টি বিশেষ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল যুক্ত করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং অনুশীলনমূলক কাজ, বহুনির্বাচনি প্রশ্ন, সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করে মূল্যায়নকে সৃজনশীল করা হয়েছে। আশা করি নবম-দশম শ্রেণির **বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা** পাঠ্যপুস্তকে নতুন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির উদ্দেশ্যগুলো যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্ত কটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্ত ক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্ত কটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে– যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্ক রণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্ত কটি রচনা, সম্পাদনা, সৃজনশীল প্রশ্ন ও কর্ম–অনুশীলন প্রণয়ন, পরিমার্জন এবং প্রকাশনার কাজে যাঁরা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্ত কটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	ইতিহাস পরিচিতি	১-৬
দ্বিতীয়	বিশ্বসভ্যতা (মিশর, সিন্ধু, গ্রিক ও রোম)	৭-২১
তৃতীয়	প্রাচীন বাংলার জনপদ	২২-২৬
চতুর্থ	প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)	২৭-৩৯
পঞ্চম	প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস	৪০-৫১
ষষ্ঠ	মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (১২০৪ -১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)	৫২-৭৩
সপ্তম	মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস	৭৪-৮৬
অষ্টম	বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্ব	৮৭-৯৮
নবম	ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন	৯৯-১১০
দশম	ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন	১১১-১৩০
একাদশ	ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ	১৩১-১৪০
দ্বাদশ	সামরিক শাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন (১৯৫৮ - ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ)	১৪১-১৫১
ত্রয়োদশ	সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ	১৫২-১৭২
চতুর্দশ	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল (১৯৭২-১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)	১৭৩-১৮২
পঞ্চদশ	সামরিক শাসন ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ (১৯৭৫- ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ)	১৮৩-১৯৬

প্রথম অধ্যায়
ইতিহাস পরিচিতি

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘঠিত হয়। নয় মাস পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাণপণ লড়াই করে ১৬ ডিসেম্বর আমাদের দেশ শত্রুমুক্ত হয়। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গর্বের, গৌরবের কাহিনি। বাঙালি জাতির এমন অনেক গৌরবের কাহিনি আছে। যেসব জানতে হলে ইতিহাস পড়তে হবে, চর্চা করতে হবে। ইতিহাস সত্য ঘটনা উপস্থাপন করে। ইতিহাস সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান করতে হলে ইতিহাসের উপাদান, প্রকারভেদ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে।

এজন্য আগে আমাদের জানতে হবে ইতিহাস কী? জানতে হবে কত ধরনের ইতিহাস লেখা যায় বা ইতিহাস কত ধরনের হয়। ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তাই বা কী? এই অধ্যায়ে এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং

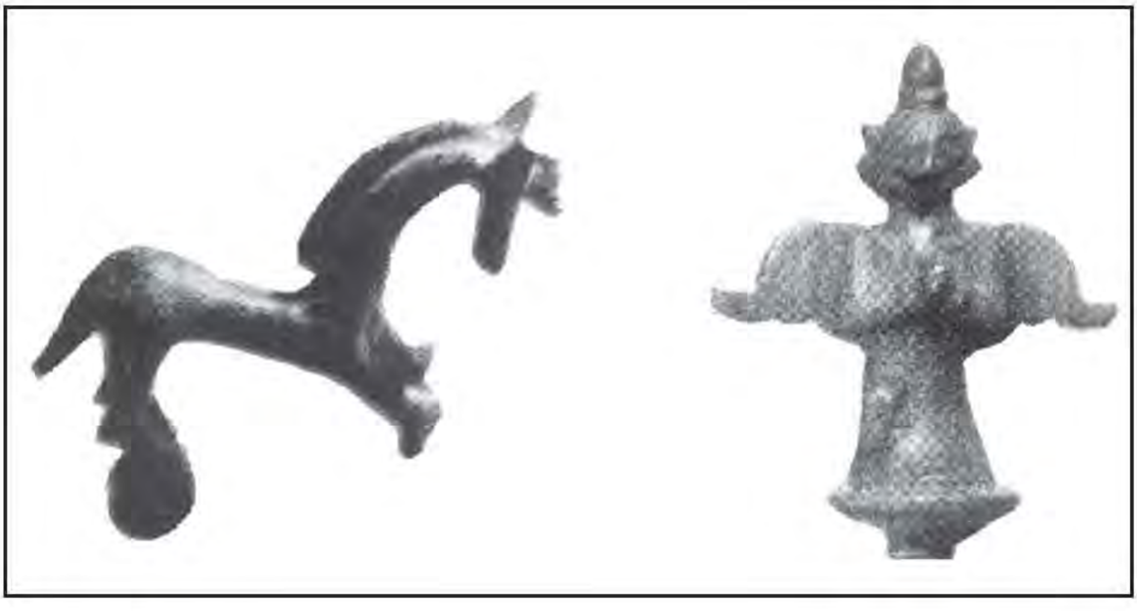

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারণা, স্বরূপ ও পরিসর ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইতিহাসের উপাদান ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারব;
- ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারব;
- ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহী হব।

ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ধারণা

'ইতিহাস' শব্দটির উৎপত্তি 'ইতিহ' শব্দ থেকে যার অর্থ 'ঐতিহ্য'। ঐতিহ্য হচ্ছে অতীতের অভ্যাস, শিক্ষা, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি যা ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত থাকে। এই ঐতিহ্যকে এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয় ইতিহাস। ই.এইচ.কার-এর ভাষায় বলা যায় যে, ইতিহাস হলো বর্তমান ও অতীতের মধ্যে এক অন্তহীন সংলাপ।

বর্তমানের সকল বিষয়ই অতীতের ক্রমবিবর্তন ও অতীত ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। আর অতীতের ক্রমবিবর্তন ও ঐতিহ্যের বস্তুনিষ্ঠ বিবরণই হলো ইতিহাস। তবে এখন বর্তমান সময়েরও ইতিহাস লেখা হয়, যাকে বলে সাম্প্রতিক ইতিহাস। সুতরাং ইতিহাসের পরিসর সুদূর অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত।

ইতিহাস শব্দটির সন্ধি বিচ্ছেদ করলে এরূপ দাড়ায়, ইতিহ + আস। যার অর্থ এমনই ছিল বা এরূপ ঘটেছিল। ঐতিহাসিক ড. জনসনও ঘটে যাওয়া ঘটনাকেই ইতিহাস বলেছেন। তাঁর মতে, যা কিছু ঘটে তাই ইতিহাস। যা ঘটে না তা ইতিহাস নয়।

হেরোডোটাস

গ্রিক শব্দ 'হিস্টরিয়া' (Historia) থেকে ইংরেজি 'হিস্ট্রি' (History) শব্দটির উৎপত্তি, যার বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ইতিহাস। 'হিস্টরিয়া' শব্দটির প্রথম ব্যবহার করেন গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক)। তিনি 'ইতিহাসের জনক' হিসেবে খ্যাত। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর গবেষণাকর্মের নামকরণে এ শব্দটি ব্যবহার করেন যার আভিধানিক অর্থ হলো সত্যানুসন্ধান বা গবেষণা। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইতিহাস হলো যা সত্যিকার অর্থে ছিল বা সংঘটিত হয়েছিল তা অনুসন্ধান করা ও লেখা। তিনি তাঁর গবেষণায় গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় অনুসন্ধান করেছেন। এতে তিনি প্রাপ্ত তথ্য, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং গ্রিসের বিজয়গাথা লিপিবদ্ধ করেছেন। যাতে পরবর্তী প্রজন্ম এ ঘটনা ভুলে না যায়, এ বিবরণ যেন তাদের উৎসাহিত করে এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। হেরোডোটাসই প্রথম ইতিহাস এবং অনুসন্ধান- এ দুইটি ধারণাকে সংযুক্ত করেন। ফলে ইতিহাস পরিণত হয় বিজ্ঞানে, পরিপূর্ণভাবে হয়ে ওঠে তথ্য নির্ভর এবং গবেষণার বিষয়ে। প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের অনন্ত ঘটনাপ্রবাহই হলো ইতিহাস। আর এক ইতিহাসবিদ র‍্যাপসন বলেছেন, ইতিহাস হলো ঘটনার বৈজ্ঞানিক এবং ধারাবাহিক বর্ণনা।

হিউয়েন সাং

আধুনিক ইতিহাসের জনক জার্মান ঐতিহাসিক লিওপোল্ড ফন্ র‍্যাংকে মনে করেন, প্রকৃতপক্ষে যা ঘটেছিল তার অনুসন্ধান ও তার সত্য বিবরণই ইতিহাস। সুতরাং ইতিহাস হচ্ছে মানব সভ্যতার বিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিক ও সত্যনিষ্ঠ বিবরণ। সঠিক ইতিহাস সবসময় সত্যকে নির্ভর করে রচিত।

ইতিহাসের উপাদান

যে সব তথ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে ঐতিহাসিক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব, তাকেই ইতিহাসের উপাদান বলা হয়। ইতিহাসের উপাদানকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা : লিখিত উপাদান ও অলিখিত উপাদান।

১. **লিখিত উপাদান ঃ** ইতিহাস রচনার লিখিত উপাদানের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য, বৈদেশিক বিবরণ, দলিলপত্র ইত্যাদি। বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সাহিত্যকর্মেও তৎকালীন সময়ের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। যেমন: বেদ, কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী', মিনহাজ-উস-সিরাজের 'তবকাত-ই-নাসিরী', আবুল ফজল-এর 'আইন-ই-আকবরী' ইত্যাদি।

বিদেশি পর্যটকদের বিবরণ সব সময়ই ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হয়েছে। যেমন– পঞ্চম থেকে সপ্তম শতকে বাংলায় আগত চৈনিক পরিব্রাজক যথাক্রমে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাং ও ইৎসিং-এর বর্ণনা। পরবর্তী সময়ে আফ্রিকান পরিব্রাজক ইবনে বতুতাসহ অন্যদের লেখাতেও এ অঞ্চল সম্পর্কে বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। এসব বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়।

সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে আরও রয়েছে, রূপকথা, কিংবদন্তি, গল্পকাহিনি। তিব্বতীয় লেখক লামা তারনাথের বর্ণনায় পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের সিংহাসন আরোহণ সম্পর্কে যে বর্ণনা আছে সেটি এক ধরনের কল্পকাহিনি। তবে অনেক কাহিনির আড়ালে অনেক সত্য ঘটনা থেকে যায় যা ঐতিহাসিকরা বিচার-বিশ্লেষণ-অনুসন্ধান করে আবিষ্কার করেন। তাছাড়া সরকারি নথি, চিঠিপত্র ইত্যাদি থেকেও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব।

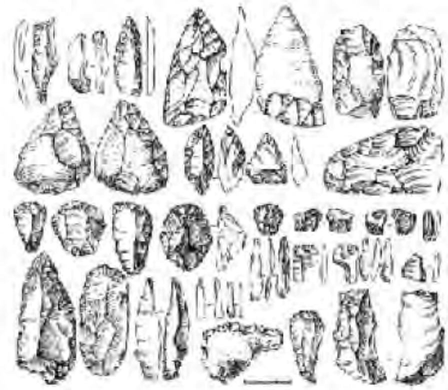

ইতিহাসের উপাদান

২. **অলিখিত বা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ঃ** যেসব বস্তু বা উপাদান থেকে আমরা বিশেষ সময়, স্থান বা ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাই সে বস্তু বা উপাদানই প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ মূলত অলিখিত উপাদান। যেমন : মুদ্রা, শিলালিপি, স্তম্ভলিপি, তাম্রলিপি, ইমারত ইত্যাদি। এ সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের ফলে সে সময়ের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ধারণা করা সম্ভব প্রাচীন অধিবাসীদের সভ্যতা, ধর্ম, জীবনযাত্রা, নগরায়ণ, নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা, কৃষি উপকরণ ইত্যাদি সম্পর্কে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায় সিন্ধু সভ্যতা, বাংলাদেশের মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি ইত্যাদি স্থানের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা। নতুন নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বদলে দিতে পারে একটি জাতির ইতিহাস। যেমন– সম্প্রতি নরসিংদীর উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। ঐ অঞ্চলের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনে প্রমাণ হয়েছে যে, বাংলাদেশে আড়াই হাজার বছর পূর্বেও নগর সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। এই আবিষ্কারের ফলে বাংলার প্রাচীন সভ্যতার নবদিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে বাংলার প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে অনেক ধারণা। অদূর ভবিষ্যতে নতুন ভাবে লিখতে হবে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস।

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত নিদর্শন

একক কাজ ঃ ইতিহাসের বিভিন্ন ধরনের উপাদানের একটি তালিকা কর।

ইতিহাসের প্রকারভেদ

মানব সমাজ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বিষয়ের ইতিহাস লেখা হচ্ছে। ফলে সম্প্রসারিত হচ্ছে ইতিহাসের পরিসর। ইতিহাস বিরামহীনভাবে অতীতের ঘটনা বর্তমান প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়। সেক্ষেত্রে ইতিহাসকে বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত করা কঠিন। তাছাড়া ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে মানুষ, মানুষের সমাজ, সভ্যতা ও জীবনধারা পরস্পর সম্পৃক্ত এবং পরিপূরক।

তারপরও পঠন-পাঠন, আলোচনা ও গবেষণাকর্মের সুবিধার্থে ইতিহাসকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-ভৌগোলিক অবস্থানগত ও বিষয়বস্তুগত ইতিহাস।

১. ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক বা ভৌগোলিক অবস্থানগত ইতিহাস ঃ যে বিষয়টি ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তা কোন প্রেক্ষাপটে রচিত স্থানীয়, জাতীয় না আন্তর্জাতিক? এভাবে ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে শুধু বোঝার সুবিধার্থে ইতিহাসকে আবারো তিনভাগে ভাগ করা যায় যথা– স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস, জাতীয় ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক ইতিহাস।

২. বিষয়বস্তুগত ইতিহাস ঃ কোন বিশেষ বিষয়ের উপর ভিত্তিকরে যে ইতিহাস রচিত হয় তাকে বিষয়বস্তুগত ইতিহাস বলা হয়। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর পরিসর ব্যাপক। তবু সাধারণভাবে একে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস, অর্থনৈতিক ইতিহাস, সাংস্কৃতিক ইতিহাস ও সাম্প্রতিক ইতিহাস।

ইতিহাসের বিষয়বস্তু

মানুষ তার সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিক পরিবর্তনের প্রমাণ ও লিখিত দলিল হলো ইতিহাস। ঐতিহাসিক ভিকো (Vico)মনে করেন যে, মানব সমাজ ও মানবীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপত্তি ও বিকাশই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, মানুষের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন যা মানব সমাজ-সভ্যতার উন্নতি ও অগ্রগতিতে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তা সবই ইতিহাসভুক্ত বিষয়। যেমন- শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতি, দর্শন, স্থাপত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ, ধর্ম, আইন–প্রভৃতি বিষয়, সামগ্রিকভাবে যা কিছু সমাজ-সভ্যতা বিকাশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে তাই ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

ইতিহাসের স্বরূপ

ইতিহাস অন্যান্য বিষয় থেকে আলাদা। জ্ঞান অর্জনের অন্যান্য শাখা থেকে এর রচনা ও উপস্থাপনা পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য-প্রকৃতি আলোচনা করলে, ধারণা পরিষ্কার হবে।

প্রথমত ঃ ইতিহাস অতীতমুখী। অতীতের ঘটনাপ্রবাহই এ বিষয়ের বিচরণক্ষেত্র সত্যনিষ্ঠ তথ্যের সাহায্যে অতীতকে পুনর্গঠন করাই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়ত ঃ ইতিহাসের বিষয়বস্তু মানুষ এবং মানুষের সমাজ-সভ্যতা। মানবসমাজ ও সভ্যতার ক্রমঅগ্রগতির ধারাবাহিক তথ্য নির্ভর বিবরণই হচ্ছে ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়।

তৃতীয়ত ঃ ইতিহাসে আবেগ ও অতি কথনের বাহুল্য নেই। ঘটে যাওয়া ঘটনার সঠিক বিবরণ পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরাই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থত ঃ ইতিহাস থেমে থাকে না, এটি গতিশীল এবং বহমান। যে কারণে কাল বিভাজনে কোন সন-তারিখ ব্যবহার করা কঠিন। আবার পরিবর্তনের ধারা সব দেশে এক সঙ্গে ঘটেনি।

পঞ্চমত ঃ বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষতা ইতিহাসের মৌলিক ভিত্তি তবে প্রতিটি মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, দৃষ্টিভঙ্গিভিন্ন ভিন্ন। যে কারণে একই ইতিহাসের বর্ণনা-ব্যাখ্যা এক এক ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে দিয়ে থাকেন। ঘটনার নিরপেক্ষ বর্ণনা না হলে সেটা সঠিক ইতিহাস হয় না।

একক কাজ ঃ সত্যনিষ্ঠ তথ্যের সাহায্যে অতীতকে পুনর্গঠন করাই ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য–ব্যাখ্যা কর।

ইতিহাসের পরিসর

মানুষ কর্তৃক সম্পাদিত সকল বিষয় ইতিহাসের আওতাভুক্ত। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, পরিকল্পনা, কার্যক্রম যতো শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত, ইতিহাসের সীমাও ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে এ বিস্তৃতির সীমা স্থিতিশীল নয়। মানুষের চিন্তা-ভাবনা, কর্মধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের পরিসরও সম্প্রসারিত হচ্ছে। যেমন-প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রথম পর্বের মানুষের কর্মকাণ্ড খাদ্য সংগ্রহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উৎপাদন কৌশল তখনও তাদের অজানা ছিল। ফলে সে সময় ইতিহাসের পরিসরও খাদ্য সংগ্রহমূলক কর্মকাণ্ডপর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সময়ের বিবর্তনে, সভ্যতার অগ্রগতির কারণে মানুষের কর্মকাণ্ডের পরিধি বেড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস চর্চায়-গবেষণায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও অনুসৃত হচ্ছে।

ফলে ইতিহাসের শাখা-প্রশাখার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে, বিস্তৃত হচ্ছে ইতিহাসের সীমানাও। উনিশ শতকে শুধু রাজনীতি ইতিহাসের বিষয় হলেও মার্কসবাদ প্রচারের পর অর্থনীতি, সমাজ, শিল্পকলার ইতিহাসও রচিত হতে থাকে। এভাবে একের পর এক বিষয় ইতিহাসভুক্ত হচ্ছে আর সম্প্রসারিত হচ্ছে ইতিহাসের পরিধি ও পরিসর।

ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা

মানবসমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের সত্য নির্ভর বিবরণ হচ্ছে ইতিহাস। এ কারণে জ্ঞানচর্চার শাখা হিসেবে ইতিহাসের গুরুত্ব অসীম। ইতিহাস পাঠ মানুষকে অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান অবস্থা বুঝতে, ভবিষ্যৎ অনুমান করতে সাহায্য করে। ইতিহাস পাঠের ফলে মানুষের পক্ষে নিজের ও নিজদেশ সম্পর্কে মঙ্গল-অমঙ্গলের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব। সুতরাং দেশ ও জাতির স্বার্থে এবং ব্যক্তি প্রয়োজনে ইতিহাস পাঠ অত্যন্ত জরুরি।

জ্ঞান ও আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করে ঃ অতীতের সত্যনিষ্ঠ বর্ণনা মানুষের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। আর এ বিবরণ যদি হয় নিজ দেশ-জাতির সফল সংগ্রাম ও গৌরবময় ঐতিহ্যের– তাহলে তা মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। একই সঙ্গে আত্মপ্রত্যয়ী, আত্মবিশ্বাসী হতে সাহায্য করে। সে ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধ, জাতীয় সংহতি সুদৃঢ়করণে ইতিহাস পাঠের বিকল্প নেই।

সচেতনা বৃদ্ধি করে ঃ ইতিহাস জ্ঞান মানুষকে সচেতন করে তোলে। উত্থান-পতন এবং সভ্যতার বিকাশ ও পতনের কারণগুলো জানতে পারলে মানুষ ভালো-মন্দের পার্থক্যটা সহজেই বুঝতে পারে। ফলে সে তার কর্মের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন থাকে।

দৃষ্টান্তের সাহায্যে শিক্ষা দেয় : ইতিহাসের ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষ ইতিহাস পাঠ করে অতীত ঘটনাবলির দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নিতে পারে। ইতিহাসের শিক্ষা বর্তমানের প্রয়োজনে কাজে লাগানো যেতে পারে। ইতিহাস দৃষ্টান্তের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় বলে ইতিহাসকে বলা হয় শিক্ষণীয় দর্শন।

ইতিহাস পাঠ করলে বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, যা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সাহায্য করে। ফলে জ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ জন্মে।

দলীয় কাজ ঃ তোমার এলাকার অথবা কাছাকাছি কোনো ঐতিহাসিক স্থান/নিদর্শন পরিদর্শন করে তার ঐতিহাসিক উপাদানগুলো চিহ্নিত কর।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. কাকে আধুনিক ইতিহাসের জনক বলা হয়?

ক. হেরোডোটাস খ. লিওপোল্ড ফন্ র‌্যাংকে

গ. টয়েনবি ঘ. ই. এইচ. কার

২. উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ প্রমাণ করে-

i. প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ মৃৎশিল্পে সমৃদ্ধ ছিল;

ii. বহু প্রাচীন আমলে বাংলাদেশে নগর-সভ্যতা গড়ে ওঠে;

iii. প্রাচীন বাংলার অধিবাসীদের ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত উন্নত মানের ছিল।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i
খ. i ও ii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

রিমা ঈদের ছুটিতে মা-বাবার সাথে কুমিল্লার ময়নামতি জাদুঘর পরিদর্শনে যায়। সেখানে সে মুদ্রা, শিলালিপি. স্তম্ভলিপি. তাম্রলিপি, ইমারত ইত্যাদি দেখতে পায়।

৩. রিমা ময়নামতি জাদুঘরে ইতিহাসের যে উপাদান দেখতে পায় তা হলো —

i. লিখিত
ii. অলিখিত
iii. প্রত্নতাত্ত্বিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

৪. রিমা ময়নামতি জাদুঘর পরিদর্শন করে জানতে পারবে, প্রাচীন বাংলার—

i. সামাজিক ইতিহাস
ii. অর্থনৈতিক ইতিহাস
iii. সাংস্কৃতিক ইতিহাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১. সজল তার মামার সাথে জাতীয় গণগ্রন্থাগারে যায়। সেখানে সে বিভিন্ন বইপত্র পড়ে। সজল বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও ইতিহাসের বই তার ভালো লাগে। সে বিভিন্ন উৎস থেকে ইতিহাসের বইপত্র সংগ্রহ করে পড়ে। সজলের বাবা তাকে বললেন, শুধু শুধু এসব বই পড়ে সময় নষ্ট করছো কেন?

ক. হিউয়েন সাং কোন্ দেশের পরিব্রাজক?

খ. সময়ের বিবর্তনে কীভাবে ইতিহাসের পরিসর বিস্তৃত হচ্ছে?

গ. সজল জাতীয় গণগ্রন্থাগারে ইতিহাসের কোন ধরনের উপাদান দেখতে পায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কী সজলের বাবার মানসিকতার সাথে একমত? যুক্তি দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্বসভ্যতা

আদিম যুগের মানুষ কৃষিকাজ জানত না। বনে বনে ঘুরে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ করত। তা-ই ছিল তাদের খাদ্য। এরপর মানুষ পাথর ভেঙে ঘসে ঘসে ধারালো অস্ত্র তৈরি করতে শেখে। সে সময় পাথরই ছিল তাদের একমাত্র হাতিয়ার। সে কারণে এ যুগকে পাথরের যুগ বলা হতো। পাথর যুগের প্রথম পর্যায়কে বলা হতো পুরনো পাথরের যুগ বা পুরোপলীয় যুগ। এ যুগে মানুষ পাথরের অস্ত্র দিয়ে দলবদ্ধভাবে পশু শিকার করত। এরা আগুনের ব্যবহারও জানত।

পুরনো পাথরের যুগ শেষ হয় মানুষের যাযাবর জীবনের অবসান ঘটিয়ে কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এ যুগকে বলা হয় নতুন পাথরের যুগ বা নবোপলীয় যুগ। কৃষির প্রয়োজনে এযুগে মানুষ নদীর তীরে বসবাস শুরু করে। ঘর-বাড়ি নির্মাণ করতে শেখে। এভাবেই মানবসভ্যতার শুরু। এই অধ্যায়ে কীভাবে মানুষ ধাপে ধাপে সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে তারই সত্য কাহিনি, যাকে আমরা বলি ইতিহাস– সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা –

- প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা বর্ণনা করতে পারব;
- নীল নদের অবদান উল্লেখপূর্বক প্রাচীন মিশরের রাষ্ট্র ও সমাজের বর্ণনা করতে পারব;
- বিশ্ব সভ্যতা বিকাশে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ অবদানসমূহ মূল্যায়ন করতে পারব;
- সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের কাহিনি ও ভৌগোলিক অবস্থান জানতে পারব;
- সিন্ধু সভ্যতার রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- সভ্যতার বিকাশে সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনা, শিল্পকলা ও ভাস্কর্যের বর্ণনা করতে পারব;
- ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কালের বর্ণনাপূর্বক গ্রিক সভ্যতার উদ্ভবের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
- সামরিক নগররাষ্ট্রের ধারণা প্রদানপূর্বক গণতান্ত্রিক নগররাষ্ট্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে গ্রিক সভ্যতার শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের অবদান বর্ণনা করতে পারব;
- ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল উল্লেখপূর্বক প্রাচীন রোমান সভ্যতা বর্ণনা করতে পারব;
- রোম নগরী ও রোমান শাসনের বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারব;
- শিক্ষা, সাহিত্য ও লিখন পদ্ধতির বিকাশে প্রাচীন রোমান সভ্যতার অবদান বিশ্লেষণ করতে পারব;
- সভ্যতার বিকাশে প্রাচীন রোমান সভ্যতার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞানের অবদান বর্ণনা করতে পারব;
- বিশ্ব সভ্যতায় প্রাচীন রোমান সভ্যতার ধর্ম, দর্শন ও আইনের প্রভাব আলোচনা করতে পারব;
- বিশ্ব সভ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের মাধ্যমে প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

মিশরীয় সভ্যতা

পটভূমি : আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব অংশে বর্তমানে যে দেশটির নাম ইজিপ্ট, সেই দেশেরই প্রাচীন নাম মিশর। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ অব্দে মিশরে প্রথম সাম্রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। যার একটি ছিল উত্তর মিশর (নিম্ন মিশর) অপরটি ছিল দক্ষিণ মিশর (উচ্চ মিশর)। খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে ৩২০০ অব্দ পর্যন্ত নীল নদের অববাহিকায় একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। সে সময়ে প্রাচীন মিশরের ইতিহাসকে প্রাক-রাজবংশীয় যুগ বলে। এ সময় থেকে মিশর প্রাচীন সভ্যতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে শুরু করে।

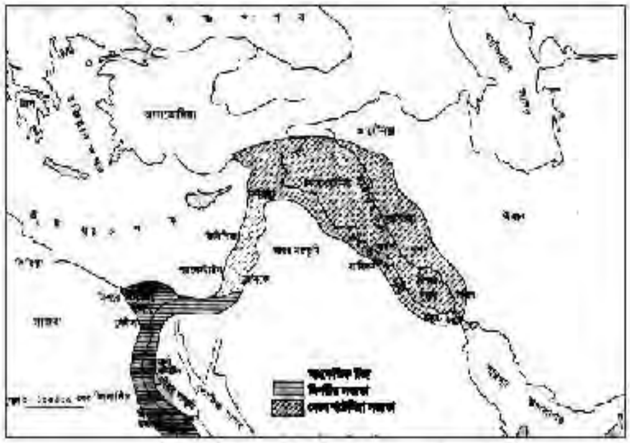
মানচিত্র : প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা

এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০ অব্দ থেকে প্রথম রাজবংশের শাসন আমল শুরু হয়। ঐ সময় থেকে মিশরের ঐতিহাসিক যুগের সূচনা হয়। একই সময়ে নিম্ন ও উচ্চ মিশরকে একত্রিত করে নারমার বা মেনেস হন একাধারে মিশরের প্রথম নরপতি এবং পুরোহিত। তিনি প্রথম ফারাও-এর মর্যাদাও লাভ করেন। এরপর থেকে ফারাওদের অধীনে মিশর প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতে একের পর এক উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

ভৌগোলিক অবস্থান ঃ তিনটি মহাদেশ দ্বারা ঘিরে থাকা মিশরের ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশটি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ মহাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ভূমধ্যসাগরের উপকূলে অবস্থিত। এর উত্তরে ভূমধ্যসাগর, পূর্বে লোহিত সাগর, পশ্চিমে সাহারা মরুভূমি, দক্ষিণে সুদান ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ। এর মোট আয়তন প্রায় চার লক্ষ বর্গমাইল।

সময়কাল ঃ মিশরীয় সভ্যতা ২৫০০ বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী স্থায়ী হয়েছিল। প্রাচীন মিশরের নিরবচ্ছিন্ন ও দীর্ঘ ইতিহাসের সূচনা হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ অব্দে। বিশেষ করে নবোপলীয় যুগে।

তবে মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন হয় মেনেসের নেতৃত্বে, যা প্রায় তিন হাজার বছর ধরে স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব দশম শতকে লিবিয়ার এক বর্বর জাতি ফারাওদের সিংহাসন দখল করে নেয়। ৬৭০-৬৬২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে অ্যাসিরীয়া মিশরে আধিপত্য বিস্তার করে। ৫২৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পারস্য মিশর দখল করে নিলে প্রাচীন মিশরের সভ্যতার সূর্য অস্তমিত হয়।

রাষ্ট্র ও সমাজ ঃ প্রাক-রাজবংশীয় যুগে মিশর কতগুলো ছোট ছোট নগর রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে 'নোম' বলা হতো। মিশরের প্রথম রাজা বা ফারাও (মেনেস বা নারমার) সমগ্র মিশরকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০০ অব্দে ঐক্যবদ্ধ করে একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলে। যার রাজধানী ছিল দক্ষিণ মিশরের মেম্ফিসে। তখন থেকে মিশরে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র ও রাজবংশের উদ্ভব। মিশরীয় 'পের-ও' শব্দ থেকে ফারাও শব্দের জন্ম। ফারাওরা ছিল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। তারা নিজেদেরকে সূর্য দেবতার বংশধর মনে করত। ফারাও পদটি ছিল বংশানুক্রমিক। অর্থাৎ ফারাওয়ের ছেলে হতো উত্তরাধিকার সূত্রে ফারাও।

একক কাজ ঃ মিশরীয় সভ্যতার উত্থান-পতনের একটি ধারাবাহিক চার্ট তৈরি কর।

পেশার উপর ভিত্তি করে মিশরীয়দের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন- রাজপরিবার, পুরোহিত, অভিজাত, লিপিকার, ব্যবসায়ী, শিল্পী এবং কৃষক ও ভূমিদাস শ্রেণি।

মিশরের অর্থনীতি মূলত ছিল কৃষিনির্ভর। উৎপাদিত ফসলের মধ্য উল্লেখযোগ্য ছিল গম, যব, তুলা, পেঁয়াজ, পিচ ইত্যাদি। ব্যবসা-বাণিজ্যেও মিশর ছিল অগ্রগামী। মিশরে উৎপাদিত গম, লিলেন কাপড় ও মাটির পাত্র ক্রিট দ্বীপ, ফিনিশিয়া, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় রপ্তানি হতো। বিভিন্ন দেশ থেকে মিশরীয়রা স্বর্ণ, রৌপ্য, হাতির দাঁত, কাঠ ইত্যাদি আমদানি করত।

নীল নদ ঃ মিশরের নীল নদের উৎপত্তি আফ্রিকার লেক ভিক্টোরিয়া থেকে। সেখান থেকে নদটি নানা দেশ হয়ে মিশরের মধ্য দিয়ে ভূ-মধ্যসাগরে এসে পড়েছে। ইতিহাসের জনক হেরোডোটাস যথার্থই বলেছেন– 'মিশর নীল নদের দান'। নীল নদ না থাকলে মিশর মরুভূমিতে পরিণত হতো। প্রাচীনকালে প্রতিবছর নীল নদে বন্যা হতো। বন্যার পর পানি সরে গেলে দুই তীরে পলিমাটি পড়ে জমি উর্বর হত। জমে থাকা পলিমাটিতে জন্মাতো নানা ধরনের ফসল।

সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান ঃ প্রাচীন সভ্যতায় মিশরীয়দের অবদান অস্বীকার করার উপায় নেই। ধর্মীয় চিন্তা, শিল্প, ভাস্কর্য, লিখন পদ্ধতি কাগজের আবিষ্কার জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চা-সবকিছুই তাদের অবদানে সমৃদ্ধ। মিশরীয়দের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তাদের জীবন ধর্মীয় চিন্তা ও বিশ্বাস দ্বারা প্রভাবিত।

মিশরীয়দের ধর্মবিশ্বাস ঃ সম্ভবত প্রাচীন মিশরীয়দের মতো অন্য কোনো জাতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এতটা ধর্মীয় নিয়ম-কানুন অনুশাসন দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। সে কারণে মানবসভ্যতার অনেক ধ্যানধারণা, রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠানের জন্ম প্রাচীন মিশরে। তারা জড়বস্তুর পূজা করত, মূর্তি পূজা করত, আবার জীবজন্তুর পূজাও করত। বিভিন্ন সময়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটেছে। মিশরীয়দের ধারণা ছিল, সূর্যদেবতা 'রে' বা 'আমন রে' এবং প্রাকৃতিক শক্তি, শস্য ও নীলনদের দেবতা 'ওসিরিস' মিলিতভাবে সমগ্র পৃথিবী পরিচালিত করেন। তবে, তাদের জীবনে সূর্যদেবতা 'রে'– এর গুরুত্ব ছিল অনেক বেশি।

একক কাজ ঃ মিশরের উৎপাদিত ফসল ও আমদানিকৃত পণ্যের ছক তৈরি কর।

মিশরীয়রা মনে করত মৃত ব্যক্তি আবার একদিন বেঁচে উঠবে। সে কারণে দেহকে তাজা রাখার জন্য তারা মমি করে রাখত। এই চিন্তা থেকে মমিকে রক্ষার জন্য তারা পিরামিড তৈরি করেছিল। ফারাওরা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে দেশ শাসন করত। তাঁরা ছিল প্রধান পুরোহিত এবং অন্যান্য পুরোহিতদেরও তাঁরা নিয়োগ করত।

পিরামিড

শিল্প ঃ মিশরীয়দের চিত্রকলা বৈচিত্র্যপূর্ণ ও ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য দেশের মতো চিত্রশিল্পও গড়ে উঠেছিল ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে। তারা সমাধি আর মন্দিরের দেয়াল সাজাতে গিয়ে চিত্রশিল্পের সূচনা করে। তাদের প্রিয় রং ছিল সাদা-কালো। সমাধি, পিরামিড, মন্দির, প্রাসাদ, প্রমোদ কানন, সাধারণ ঘর-বাড়ির দেয়ালে মিশরীয় চিত্রশিল্পীরা অসাধারণ ছবি এঁকেছেন। এসব ছবির মধ্যে সমসাময়িক মিশরের রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের কাহিনি ফুটে উঠেছে।

কারুশিল্পেও প্রাচীন মিশরীয় শিল্পীরা অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। আসবাবপত্র, মৃৎপাত্র, সোনা, রুপা, মূল্যবান পাথরে খচিত তৈজসপত্র, অলংকার, মমির মুখোশ, দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসপত্র, হাতির দাঁত ও ধাতুর দ্রব্যাদি মিশরীয় কারু শিল্পের দক্ষতার প্রমাণ বহন করে।

একক কাজ : মিশরীয় শিল্পীরা যেসব স্থাপনার দেয়ালে ছবি এঁকেছে বিষয়বস্তু উল্লেখসহ তার একটি চার্ট তৈরি কর।

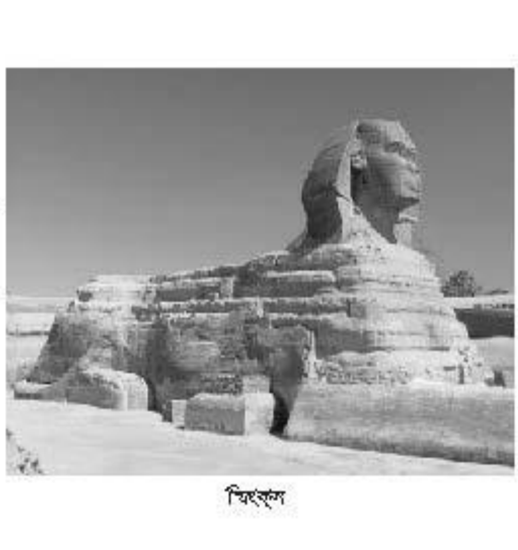
স্ফিংক্স

ভাস্কর্য ঃ ভাস্কর্য শিল্পে মিশরীয়দের মতো প্রতিভার ছাপ আর কেউ রাখতে সক্ষম হয়নি। ব্যাপকতা, বৈচিত্র্য এবং ধর্মীয় ভাবধারায় প্রভাবিত বিশাল আকারের পাথরের মূর্তিগুলো ভাস্কর্য শিল্পে তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রতিটি ভাস্কর্য ধর্মীয় ভাবধারা, আচার অনুষ্ঠান, মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত

ছিল। প্রতিটি শিল্পই ছিল আসলে ধর্মীয় শিল্পকলা। সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য হচ্ছে গিজার অতুলনীয় স্ফিংক্স। স্ফিংক্স হচ্ছে এমন একটি মূর্তি, যার দেহটা সিংহের মতো, কিন্তু মুখ মানুষের। মিশরের সবচেয়ে বড় পিরামিডটি হচ্ছে ফারাও খুফুর পিরামিড। মন্দিরগুলোতে মিশরীয় ভাস্কর্য স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে।

লিখনপদ্ধতি ও কাগজ আবিষ্কার ঃ মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল লিপি বা অক্ষর আবিষ্কার। নগর সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরীয় লিখনপদ্ধতির উদ্ভব ঘটে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তারা সর্বপ্রথম ২৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের বর্ণমালা আবিষ্কার করে। প্রথম দিকে ছবি এঁকে তারা মনের ভাব প্রকাশ করত। এই লিখন পদ্ধতির নাম ছিল চিত্রলিপি।

এই চিত্রলিপিকে বলা হয় 'হায়ারোগ্লিফিক' বা পবিত্র অক্ষর। মিশরীয়রা নাল খাগড়া জাতীয় গাছের খণ্ড থেকে কাগজ বানাতে শেখে। সেই কাগজের উপর তারা লিখত। গ্রিকরা এই কাগজের নাম দেয় 'প্যাপিরাস'। এই শব্দ থেকে ইংরেজিতে পেপার শব্দের উৎপত্তি। এখানে উল্লেখ্য নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মিশর জয়ের সময় একটি পাথর আবিস্কৃত হয় যা রসেটা স্টোন নামে পরিচিত। যাতে গ্রিক এবং 'হায়ারোগ্লিফিক' ভাষায় অনেক লেখা ছিল, যা থেকে প্রাচীন মিশরের অনেক তথ্য জানা যায়।

লিখন পদ্ধতি

বিজ্ঞান ঃ মিশরীয় সভ্যতা ছিল কৃষিনির্ভর। সে কারণে নীল নদের প্লাবন, নাব্যতা, পানিপ্রবাহের মাপ জোয়ারভাটা ইত্যাদি ছাড়াও জমির মাপ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল। এসবের সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র ও অঙ্ক শাস্ত্রের ছিল গভীর যোগাযোগ। ফলে এ দুইটি বিদ্যা তারা আয়ত্ত করেছিল প্রয়োজনের তাগিদে। তারা অংক শাস্ত্রের দুইটি শাখা জ্যামিতি এবং পাটিগণিতেরও প্রচলন করে। মিশরীয় সভ্যতার মানুষ যোগ, বিয়োগ ও ভাগের ব্যবহার জানত। খ্রিষ্টপূর্ব ৪২০০ অব্দে তারা প্রথম সৌর পঞ্জিকা আবিষ্কার করে। ৩৬৫ দিনে বছর এ হিসাবের আবিষ্কারকও তারা। প্রাচীন মিশরের অধিবাসীরা সময় নির্ধারণের জন্য সূর্য ঘড়ি, ছায়াঘড়ি, জলঘড়ি আবিষ্কার করে।

ধর্মের কারণে মিশরীয়রা বিজ্ঞানচর্চায় আগ্রহী ছিল। তারা পরলোকে বিশ্বাস করত এবং ফারাওরা পরবর্তী জন্মেও রাজা হবেন এই বিশ্বাস তাদের ছিল। তাই তারা ফারাওদের দেহ তাজা রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। এ কারণেই মমি তৈরি শুরু হয়। মিশরীয় বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মৃতদেহ পচন থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।

চিকিৎসাশাস্ত্রেও প্রাচীন মিশরীয়রা বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছিল। তারা চোখ, দাঁত, পেটের রোগ নির্ণয় করতে জানত। অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে চিকিৎসা করার বিদ্যাও তাদের জানা ছিল। তারা হাড় জোড়া লাগানো, হৃৎপিণ্ডের গতি এবং নাড়ির স্পন্দন নির্ণয় করতে পারত।

মিশরীয়রা দর্শন ও সাহিত্যচর্চা করত। তাদের রচনায় দুঃখ- হতাশার কোনো প্রকাশ ছিল না। তারা আশাবাদী ছিল। তাদের লেখায় সব সময়ই আনন্দের প্রকাশ দেখা গেছে।

একক কাজ ঃ মিশরীয় কৃষিব্যবস্থার সঙ্গে জ্যোতিষশাস্ত্র এবং অঙ্ক শাস্ত্রের কী সম্পর্ক?

সিন্ধু সভ্যতা

পটভূমি ঃ সিন্ধুনদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল বলে এই সভ্যতার নাম রাখা হয় সিন্ধু সভ্যতা। সিন্ধু সভ্যতার সংস্কৃতিকে অনেক সময়ে হরপ্পা সংস্কৃতি বা হরপ্পা সভ্যতা বলা হয়ে থাকে। এই সভ্যতার আবিষ্কার কাহিনি অত্যন্ত চমৎকার। পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারো শহরে উঁচু উঁচু মাটির ঢিবি ছিল।

স্থানীয় লোকেরা বলত মরা মানুষের ঢিবি (মহেঞ্জোদারো কথাটির মানেও তাই)। বাঙালি প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগের লোকেরা ঐ স্থানে বৌদ্ধস্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে ভেবে মাটি খুঁড়তে থাকেন।

অপ্রত্যাশিতভাবে বেরিয়ে আসে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগের নিদর্শন। একই সময়ে ১৯২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দে দয়ারাম সাহানীর প্রচেষ্টায় পাঞ্জাবের পশ্চিম দিকে মন্টোগোমারি জেলার হরপ্পা নামক স্থানেও প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়। জন মার্শালের নেতৃত্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগ অনুসন্ধান চালিয়ে আরো বহু নিদর্শন আবিষ্কার করেন।

মানচিত্র : সিন্ধু সভ্যতা

ভৌগোলিক অবস্থান : উপমহাদেশের প্রাচীনতম সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি বিশাল এলাকা জুড়ে। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পাতে এই সভ্যতার নিদর্শন সবচেয়ে বেশি আবিষ্কৃত হয়েছে। তা সত্ত্বেও ঐ সভ্যতা শুধু সিন্ধু অববাহিকা বা ঐ দুটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। পাকিস্তানের পাঞ্জাব, সিন্ধু প্রদেশ, ভারতের পাঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাটের বিভিন্ন অংশে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে পাঞ্জাব থেকে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক এলাকা জুড়ে সিন্ধু সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

একক কাজ : ভারত ও পাকিস্তানের কোন কোন অঞ্চলে সিন্ধু সভ্যতার নির্দশন পাওয়া গেছে? অঞ্চলগুলোর আলাদা আলাদা তালিকা প্রস্তুত কর।

সময়কাল : সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ মনে করেন, খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ থেকে ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত এ সভ্যতার উত্থান-পতনের কাল। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন, আর্য জাতির আক্রমণের ফলে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ অথবা ১৪০০ অব্দে সিন্ধু সভ্যতার অবসান ঘটে। তবে, মর্টিমার হুইলার মনে করেন, এই সভ্যতার সময়কাল হচ্ছে খ্রিষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত।

রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা : সিন্ধু সভ্যতার জনগণের রাজনৈতিক জীবন ও শাসনপ্রণালি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। মহেঞ্জোদারো হরপ্পার নগর বিন্যাস প্রায় একই রকম ছিল। এগুলোর ধ্বংসাবশেষ দেখে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী উঁচু ভিতের উপর শহরগুলো নির্মাণ করা হয়েছিল। শহরগুলোর এক পাশে উঁচু ভিত্তির উপরে একটি করে নগরদুর্গ নির্মাণ করা হতো। চারদিক থাকত প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। নগরের শাসনকর্তারা নগর দুর্গে বসবাস করতেন। প্রশাসনিক বাড়িঘরও দুর্গের মধ্যে ছিল। নগরের ছিল প্রবেশদ্বার। দুর্গ বা বিরাট অট্টালিকা দেখে মনে হয় একই ধরনের কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে নগর দুটিতে প্রচলিত ছিল। এই প্রশাসন জনগণের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত।

সিন্ধু সভ্যতার যুগে মানুষ সমাজবদ্ধ পরিবেশে বসবাস করত। সেখানে একক পরিবার পদ্ধতি চালু ছিল। সিন্ধু সভ্যতার যুগে সমাজে শ্রেণিবিভাগ ছিল। সব লোক সমান সুযোগ-সুবিধা পেত না। সমাজ ধনী ও দরিদ্র দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। কৃষকেরা গ্রামে বসবাস করত। শহরে ধনী এবং শ্রমিকদের জন্য আলাদা-আলাদা বাসস্থানের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

পোশাক-পরিচ্ছদের জন্য তারা মূলত সুতা ও পশম ব্যবহার করত। সিন্ধু সভ্যতার সমাজব্যবস্থা ছিল মাতৃতান্ত্রিক। মহিলারা খুবই শৌখিন ছিল। তাদের প্রিয় অলংকারের মধ্যে ছিল হার, বালা, আংটি, দুল, বিছা, বাজুবন্ধ, চুড়ি, বালা, পায়ের মল ইত্যাদি। তারা নকশা করা দীর্ঘ পোশাক পরত। পুরুষরাও অলংকার ব্যবহার করত।

অর্থনৈতিক অবস্থা : সিন্ধু সভ্যতার অর্থনীতি ছিল মূলত কৃষি নির্ভর। তাছাড়াও অর্থনীতির আর একটি বড় দিক ছিল পশুপালন। কৃষি ও পশুপালনের পাশাপাশি মৃৎপাত্র নির্মাণ ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, অলংকার নির্মাণ, পাথরের কাজ ইত্যাদিতেও তারা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছিল। এই উন্নতমানের শিল্প পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে সেখানকার বণিকরা

বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলত। বণিকদের সাথে আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, মধ্য এশিয়া, পারস্য, মেসোপটেমিয়া, দক্ষিণ ভারত, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

ধর্মীয় অবস্থা ঃ সিন্ধু সভ্যতায় কোনো মন্দির বা মঠের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। যে কারণে তাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়। তবে, তাদের মধ্যে যে ধর্মবিশ্বাস ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। মন্দির উপাসনা গৃহের অস্তিত্ব না থাকলেও স্থানে স্থানে অসংখ্য পোড়ামাটির নারীমূর্তি পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয়, তারা ঐ ধরনের দেবীমূর্তির পূজা করত। সিন্ধুবাসীর মধ্যে মাতৃপূজা খুব জনপ্রিয় ছিল। তাছাড়া তারা দেব-দেবী মনে করে বৃক্ষ, পাথর, সাপ এবং পশুপাখির উপাসনাও করত। সিন্ধুবাসী পরলোকে বিশ্বাস করত। যে কারণে কবরে মৃতের ব্যবহার করা জিনিসপত্র ও অলংকার রেখে দিত।

একক কাজ ঃ

১। সিন্ধু সভ্যতার মহিলাদের প্রিয় অলংকারের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

২। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন শিল্পের সমৃদ্ধির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কী সম্পর্ক?

সিন্ধু সভ্যতার অবদান ঃ পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সিন্ধু সভ্যতা। নিম্নে এই সভ্যতার অবদান আলোচনা করা হলো।

নগর পরিকল্পনা ঃ সিন্ধু সভ্যতার এলাকায় যেসব শহর আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সবচেয়ে বড় শহর। ঘরবাড়ি সবই পোড়া মাটির বা রোদে পোড়ানো ইট দিয়ে তৈরি। শহরগুলোর বাড়িঘরের নকশা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে সিন্ধু সভ্যতাযুগের অধিবাসীরা উন্নত নগরকেন্দ্রিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর নগর পরিকল্পনা একই রকম ছিল। নগরীর ভেতর দিয়ে চলে গেছে পাকা রাস্তা। রাস্তাগুলো ছিল সোজা। প্রত্যেকটি বাড়িতে খোলা জায়গা, কূপ ও স্নানাগার ছিল। জল নিষ্কাশনের জন্যে ছোট ছোট নর্দমাগুলি মূল নর্দমার সাথে সংযুক্ত করা হতো। রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হতো। পথের ধারে ছিল সারিবদ্ধ ল্যাম্পপোস্ট।

পরিমাপ পদ্ধতি ঃ সিন্ধু সভ্যতাযুগের অধিবাসীরা দ্রব্যের ওজন পরিমাপ করতে শিখেছিল। তাদের এই পরিমাপ পদ্ধতির আবিষ্কার সভ্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলে বিবেচিত। তারা বিভিন্ন দ্রব্য ওজনের জন্য নানা মাপের ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির বাটখারা ব্যবহার করত। দাগ কাটা স্কেল দিয়ে দৈর্ঘ্য মাপার পদ্ধতিও তাদের জানা ছিল।

শিল্প ঃ সিন্ধু সভ্যতাযুগের অধিবাসীদের শিল্পবোধ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মৃৎশিল্পের কথা বলতে হয়। তারা কুমারের চাকার ব্যবহার জানত এবং তার সাহায্যে সুন্দর মাটির পাত্র বানাতে পারত। পাত্রগুলোর গায়ে অনেক সময় সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকা থাকত। তাঁতিরা বয়নশিল্পে পারদর্শী ছিল। ধাতুর সাহায্যে আসবাবপত্র, অস্ত্র এবং অলংকার তৈরি করা হতো। তারা তামা ও টিনের মিশ্রণে ব্রোঞ্জ তৈরি করতে শিখেছিল। কারিগররা রূপা, তামা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি দ্বারা তৈজসপত্র তৈরি করত। তাছাড়া সোনা, রূপা, তামা ইলেক্ট্রাম ও ব্রোঞ্জ ইত্যাদি ধাতুর অলংকার তৈরিতে তারা পারদর্শী ছিল। অলংকারের মধ্যে আংটি, বালা, নাকফুল, গলার হার, কানের দুল, বাজুবন্দ ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। সিন্ধু সভ্যতা যুগের অধিবাসীরা লোহার ব্যবহার জানত না। ধাতু ছাড়া দামি পাথরের সাহায্যে অলংকার তৈরি করতেও তারা পারত। হাতির দাঁতসহ অন্যান্য হস্তশিল্পেরও দক্ষ কারিগর ছিল।

দলীয় কাজ ঃ সিন্ধু সভ্যতাযুগের অধিবাসীরা যে যে শিল্পে পারদর্শী ছিল তার একটি তালিকা তৈরি কর।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ সিন্ধু সভ্যতাযুগের অধিবাসীরা গুরুত্বপূর্ণ এবং চমৎকার স্থাপত্য শৈলীর নিদর্শন রেখে গেছে। সেখানে দুই কক্ষ থেকে পঁচিশ কক্ষের বাড়ির সন্ধানও পাওয়া গেছে।

বৃহৎ স্নানাগার

আবার কোথাও দুই তিন তলা ঘরের অস্তিত্ব আবিষ্কার হয়েছে। মহেঞ্জোদারোর স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো 'বৃহৎ মিলনায়তন' যে মিলনায়তনটি ৮০ ফুট জায়গা জুড়ে তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া বিশাল এক প্রাসাদের সন্ধান পাওয়া গেছে। হরপ্পাতে বিরাট আকারের শস্যাগারও পাওয়া গেছে। মেহেঞ্জোদারোতে একটি 'বৃহৎ স্নানাগার'-এর নিদর্শন পাওয়া গেছে যার মাঝখানে বিশাল চৌবাচ্চাটি ছিল সাঁতার কাটার উপযোগী।

সীলমোহর

ভাস্কর্যশিল্পেও সিন্ধু সভ্যতাযুগের অধিবাসীদের দক্ষতা ছিল। পাথরে খোদিত ভাস্কর্যের সংখ্যা কম হলেও সেগুলোর শৈল্পিক ও কারিগরি দক্ষতা ছিল উল্লেখ করার মতো। এ যুগে মোট ১৩টি ভাস্কর্য মূর্তি পাওয়া গেছে। চুনাপাথরে তৈরি একটি মূর্তির মাথা পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে নৃত্যরতা একটি নারী মূর্তি। এছাড়া মাটির তৈরি ছোট ছোট মানুষ আর পশুমূর্তিও পাওয়া গেছে। হরপ্পা মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্ম হলো বিভিন্ন ধরনের প্রায় ২৫০০ সিল। ধর্মীয় ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রয়োজনে এগুলো ব্যবহৃত হতো।

কাজ ঃ ছক পূরণ কর–

সিন্ধু সভ্যতার স্থাপত্য	প্রাপ্তিস্থান

গ্রিক সভ্যতা

পটভূমি ঃ গ্রিসের মহাকবি হোমারের 'ইলিয়ড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য দুটিতে বর্ণিত চমকপ্রদ কাহিনির মধ্যে লুকিয়ে থাকা সত্যকে খুঁজে বের করার অদম্য ইচ্ছা উৎসাহিত করে তোলে প্রত্নতত্ত্ববিদদের । উনিশ শতকের শেষে হোমারের কাহিনি আর কবিতায়ই তা সীমাবদ্ধ থাকে না, বেরিয়ে আসে এর ভিতরের সঠিক ইতিহাস। ঈজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে আবিষ্কৃত হয় উন্নত এক প্রাচীন নগর সভ্যতা। সন্ধান মেলে মহাকাব্যের ট্রয় নগরীসহ একশত নগরীর ধ্বংস স্তূপের। যাকে বলা হয় ঈজিয়ান সভ্যতা বা প্রাক ক্লাসিক্যাল গ্রিক সভ্যতা।

ক্রিট দ্বীপ, গ্রিস উপদ্বীপের মূল ভূখণ্ড, এশিয়া মাইনরের পশ্চিম উপকূলে এবং ঈজিয়ান সাগরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠে এই সভ্যতা। এই সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল সমৃদ্ধশালী এক সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের অধিকারী। এই সভ্যতাকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. **মিনিয়ন সভ্যতাঃ** ক্রিট দ্বীপে যে সভ্যতার উদ্ভব এর স্থায়ীত্ব ধরা হয়েছে খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১৪০০ অব্দ পর্যন্ত।

২. **দ্বিতীয়টি হচ্ছে মাইসিনিয় বা এজিয়ান সভ্যতাঃ** গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত মাইসিনি নগরের নাম অনুসারে এর নামকরণ হয়। এই সভ্যতার স্থায়িত্ব ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দ পর্যন্ত। ধারণা করা হয় বন্যা অথবা বিদেশি আক্রমণের ফলে এই সভ্যতার অবসান ঘটে।

ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল ঃ গ্রিস দেশটি আড্রিয়াটিক সাগর, ভূমধ্যসাগর ও ঈজিয়ান সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। গ্রিক সভ্যতার সঙ্গে দুইটি সংস্কৃতির নাম জড়িত। একটি 'হেলেনিক' অপরটি 'হেলেনিস্টিক'। গ্রিক উপদ্বীপের প্রধান শহর এথেন্সকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'হেলেনিক সংস্কৃতি'। অপরদিকে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে মিশরের আলেজান্দ্রিয়াকে কেন্দ্র করে গ্রিক ও অগ্রিক সংস্কৃতির মিশ্রণে জন্ম হয় নতুন এক সংস্কৃতির। ইতিহাসে এ সংস্কৃতি 'হেলেনিস্টিক সংস্কৃতি' নামে পরিচিত।

সামরিক নগর রাষ্ট্র স্পার্টা ঃ প্রাচীন গ্রিসে যে অসংখ্য নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল তার একটি ছিল স্পার্টা। এ নগররাষ্ট্রের অবস্থান ছিল দক্ষিণ গ্রিসের পেলোপনেসাস নামক অঞ্চলে। অন্যান্য নগর রাষ্ট্র থেকে স্পার্টা ছিল আলাদা। স্পার্টানদের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমরতন্ত্র দ্বারা তারা প্রভাবিত ছিল। মানুষের মানবিক উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে সামরিক শক্তি সঞ্চয়ের দিকে তাদের দৃষ্টি ছিল বেশি। খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দে দীর্ঘ যুদ্ধের পর ডোরিয় যোদ্ধারা স্পার্টা দখল করতে সক্ষম হয়েছিল। এই পরাজিত স্থানীয় অধিবাসীদের ভূমিদাস বা হেলট বলা হতো। এরা সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত।

পরাজিত অধিবাসী যারা ভূমিদাস হতে বাধ্য হয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি। ফলে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা আর বিদ্রোহ দমন ছাড়া স্পার্টার রাজাদের মাথায় আর কোনো চিন্তা ছিল না।

স্পার্টানদের জীবন স্পার্টা রক্ষার জন্যই নিয়োজিত ছিল। স্পার্টার সমাজ তৈরি হয়েছিল যুদ্ধের প্রয়োজনকে ঘিরে। সরকারের মূল উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের জন্য নাগরিকদের প্রস্তুত করা ও যুদ্ধ পরিচালনা করা। সামরিক দিকে অত্যধিক মনোযোগ দেওয়ার কারণে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তারা ছিল অনগ্রসর।

গণতান্ত্রিক নগর রাষ্ট্র এথেন্স ঃ প্রাচীন গ্রিসে প্রথম গণতন্ত্রের সূচনা হয় এথেন্সে। তবে, প্রথম দিকে এথেন্সে ছিল রাজতন্ত্র। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে এক ধরনের অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্ষমতা চলে আসে অভিজাতদের হাতে। দেশ শাসনের নামে তারা শুধু নিজের স্বার্থই দেখতো। ফলে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যদিও তাদের পক্ষে ক্ষমতা দখল করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাদের নামে কিছু লোক ক্ষমতা হাতে নিয়ে নেয়। তাদের বলা হতো 'টাইরান্ট'। জনগণের মধ্যে অসন্তোষ এবং বঞ্চিত কৃষকদের মধ্যে বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম অব্দের মাঝামাঝি সময়ে রাষ্ট্রব্যবস্থায় এক পরিবর্তন আসে। আগে অভিজাত পরিবারের সন্তান অভিজাত বলে গণ্য হতো। এখন অর্থের মানদণ্ডে অভিজাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হলো।

দেশে মারাত্মক সংকটের সময়ে সব শ্রেণি সর্বসম্মতভাবে কয়েকজনকে সংস্কারের জন্য আহ্বান জানায়। তার মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন অভিজাত বংশে জন্ম নেয়া 'সোলন'। তিনি কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেন এবং গ্রিক আইনের কঠোরতা হ্রাস করেন। তিনি ঋণ থেকে কৃষকদের মুক্ত করার জন্য আইন পাস করেন। তাঁর সময় অনেক অর্থনৈতিক সংস্কারও করা হয়।

পেরিক্লিস

সোলনের পর জনগণের কল্যাণে তাদের অধিকার দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন পিসিসট্রেটাস এবং ক্লিসথেনিস। তারা জনগণের কল্যাণের জন্য অনেক আইন পাস করেন। তবে চূড়ান্ত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় পেরিক্লিসের সময়। তার সময়কে গ্রিক সভ্যতার 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়ে থাকে। ৪৬০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ক্ষমতায় এসে তিনি ৩০ বছর রাজত্ব করেন। তিনি নাগরিকদের সব রাজনৈতিক অধিকারের দাবি মেনে নেন।

তিনি এ সময় প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগে নাগরিকদের অবাধ অংশগ্রহণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। নাগরিকদের মধ্য থেকে নিযুক্ত জুরি বিচারের দায়িত্ব পালন করত।

পেরিক্লিসের যুগে এথেন্স সর্বক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে। ৪৩০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এথেন্সের ভয়াবহ মহামারিতে এক চতুর্থাংশ লোক মৃত্যুবরণ করে। এই মহামারিতে পেরিক্লিসেরও মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর পরই এথেন্সের দুর্ভোগ শুরু হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য ও রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে বিশ্ব সভ্যতায় অবিস্মরণীয় অবদান রাখা নগররাষ্ট্র এথেন্সের পতন হয় সামরিক নগররাষ্ট্র স্পার্টার কাছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তা ইতিহাসে পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬০ থেকে ৪০৪ পর্যন্ত মোট তিনবার এই যুদ্ধ সংঘঠিত হয়। এই যুদ্ধে দুই রাষ্ট্র পরস্পরের মিত্রদের নিয়ে জোট গঠন করে। এথেন্সের মিত্র রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত জোটের নাম ছিল 'ডেলিয়ান লীগ'। অপরদিকে স্পার্টা তার মিত্রদের নিয়ে যে জোট গঠন করে তার নাম ছিল 'পেলোপনেসীয় লীগ'। এই মরণপণ যুদ্ধে এথেন্সের মান-মর্যাদা ও স্বাধীনতা বিলীন হয়ে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৬৯ অব্দে এথেন্স চলে যায় স্পার্টার অধীনে। এরপর নগররাষ্ট্র থিব্স্ অধিকার করে নেয় এথেন্স। খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৮ অব্দে মেসিডোনের (গ্রিস) রাজা ফিলিপ থিব্স্ দখল করে নিলে এথেন্স মেসিডোনের অধীনে চলে যায়।

দলীয় কাজ ঃ জনগণের কল্যাণের জন্য এথেন্সের যেসব মনীষী বিভিন্ন সংস্কার ও আইন পাস করেন, তাঁদের নামের তালিকা প্রস্তুত কর।

সভ্যতায় গ্রিসের অবদান ঃ ভৌগোলিক কারণে গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলো একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলেও তাদের সংস্কৃতি ছিল অভিন্ন। রাজনৈতিক অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা একই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করত। তাদের ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য, খেলাধুলা-সবকিছু এক সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছিল। এই সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে মূল অবদান ছিল এথেন্সের। আর এই সংস্কৃতির নাম হচ্ছে হেলেনীয় সংস্কৃতি।

শিক্ষা ঃ শিক্ষা সম্পর্কে গ্রিক জ্ঞানী-গুণীরা বিভিন্ন ধারণা পোষণ করতেন। তারা নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের কেউ কেউ মনে করতেন সুশিক্ষিত নাগরিকের হাতেই শাসনভার দেওয়া উচিত। সরকারের চাহিদা ও লক্ষ্য অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল আনুগত্য ও শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া। স্বাধীন গ্রিসবাসীর ছেলেরা সাত বছর বয়স থেকে পাঠশালায় যাওয়া আসা করত। ধনী ব্যক্তিদের ছেলেদের ১৮ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া করতে হতো। কারিগর আর কৃষকের ছেলেরা প্রাথমিক শিক্ষা পেত। দাসদের সন্তানের জন্য বিদ্যালয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। মেয়েরাও কোনো প্রতিষ্ঠানে যেয়ে লেখাপড়া করতে পারত না।

দলীয় কাজ ঃ

ছক পূরণ কর

এথেন্সের নাগরিকদের কল্যাণে কে কী করেন–	
সোলন	
পেরিক্লিস	

সাহিত্য ঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন গ্রিসের সৃষ্টি আজও মানবসমাজে মূল্যবান সম্পদ। হোমারের 'ইলিয়াড' ও 'ওডিসি' মহাকাব্য তার অপূর্ব নির্দশন। সাহিত্য ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল নাটক রচনায়। বিয়োগান্তক নাটক রচনায় গ্রিকরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। এসকাইলাসকে এই ধরনের নাটকের জনক বলা হয়। তাঁর রচিত নাটকের নাম 'প্রমিথিউস বাউন্ড'। গ্রিসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন সোফোক্লিস। তিনি একশটিরও বেশি নাটক রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত নাটকের মধ্যে রাজা অয়দিপাউস, আন্তিগোনে ও ইলেকট্রা অন্যতম। আর একজন বিখ্যাত নাট্যকারের নাম ইউরিপিদিস। এরিস্টোফেনেসের মিলনান্তক ও ব্যঙ্গ রচনায় বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইতিহাস রচনায়ও গ্রিকরা কৃতিত্ব দেখিয়েছিল।

ইতিহাস রচনা এ সময় থেকে শুরু। হেরোডটাস ইতিহাসের জনক নামে পরিচিত ছিলেন। হেরোডটাস রচিত ইতিহাস-সংক্রান্ত প্রথম বইটি ছিল গ্রিস ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে। থুকিডাইডেস ছিলেন বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাসের জনক। তাঁর বইটির শিরোনাম ছিল 'দ্য পেলোপনেসিয়ান ওয়র'।

ধর্ম ঃ গ্রিকদের বারটি দেব-দেবী ছিল। বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির পূজা ছাড়াও তারা বীর যোদ্ধাদের পূজা করত। জিউস ছিল দেবতাদের রাজা। অ্যাপোলো ছিলেন সূর্য দেবতা, পোসিডন ছিলেন সাগরের দেবতা। এথেনা ছিলেন জ্ঞানের দেবী। বারজনের মধ্যে এই চারজন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। রাষ্ট্রের নির্দেশে পুরোহিতরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করতেন। ডেলোস দ্বীপে অবস্থিত ডেলফির মন্দিরে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মানুষ সমবেত হয়ে এক সঙ্গে অ্যাপোলো দেবতার পূজা করত।

দর্শন ঃ দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে গ্রিসে অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, প্রতিদিন কীভাবে এর পরিবর্তন ঘটছে–এসব ভাবতে গিয়ে গ্রিসে দর্শনচর্চার সূত্রপাত। থালেস ছিলেন প্রথম দিককার দার্শনিক। তিনিই প্রথম সূর্যগ্রহণের প্রাকৃতিক কারণ ব্যাখ্যা করেন। এরপর গ্রিসে যুক্তিবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে। এদের বলা হতো সফিস্ট। এরা বিশ্বাস করতেন যে চূড়ান্ত সত্য বলে কিছু নেই। পেরিক্লিস এদের অনুসারী ছিলেন। সক্রেটিস ছিলেন এ দার্শনিকদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান। তার শিক্ষার মূল দিক ছিল আদর্শ রাষ্ট্র ও সৎ নাগরিক গড়ে তোলা। অন্যায় শাসনের প্রতিবাদ করার শিক্ষাও তিনি দেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গ্রিক দর্শনকে চরম উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হন। প্লেটোর শিষ্য এরিস্টটলও একজন বড় দার্শনিক ছিলেন।

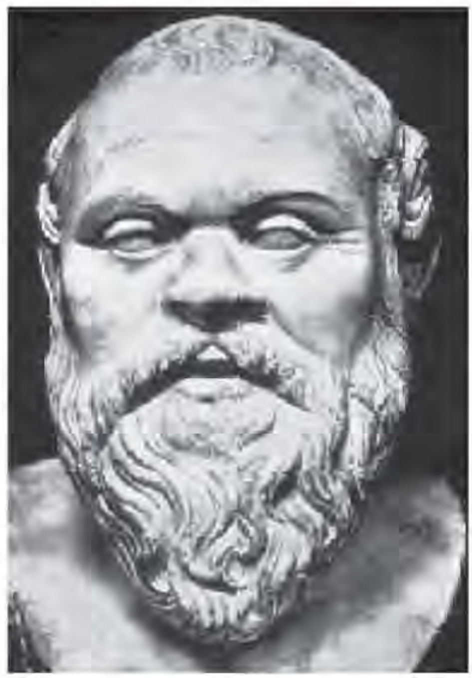

সক্রেটিস

বিজ্ঞান ঃ গ্রিকরা প্রথম বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত করে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দে। পৃথিবীর মানচিত্র প্রথম অঙ্কন করে গ্রিক বিজ্ঞানীরা। তারাই প্রথম প্রমাণ করে যে, পৃথিবী একটি গ্রহ এবং তা নিজ কক্ষপথে আবর্তিত হয়। গ্রিক জ্যোতির্বিদরা সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের কারণ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। বজ্র ও বিদ্যুৎ জিউসের ক্রোধের কারণে নয়, প্রাকৃতিক কারণে ঘটে। এই সত্য তারাই প্রথম আবিষ্কার করে। জ্যামিতির পণ্ডিত ইউক্লিড পদার্থবিদ্যায়ও পারদর্শী ছিলেন। বিখ্যাত গণিতবিদ পিথাগোরাস, চিকিৎসা বিজ্ঞানী হিপোক্রেটসের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ঃ গ্রিক শিল্পের বিশেষ করে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বিশেষ উন্নতি হয়েছিল। গ্রিক চিত্রশিল্পের নির্দশন মৃৎপাত্রে আঁকা চিত্রের মধ্যে দেখা যায়। স্থাপত্যের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন গ্রিসের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে আছে। বড় বড় স্তম্ভের উপর তারা প্রাসাদ তৈরি করত। আর প্রাসাদের স্তম্ভগুলো থাকত অপূর্ব কারুকার্যখচিত। পার্থেনন মন্দির বা দেবী এথেনার মন্দির স্থাপত্য কীর্তির অন্যতম নিদর্শন। এথেন্সের অ্যাক্রোপলিসে স্থাপত্যের সুন্দর নির্দশনের ভগ্নাবশেষ এখনও চোখে পড়ে।

গ্রিক ভাস্কর্য পৃথিবীর শিল্পকলার ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের জন্ম দিয়েছিল। সে যুগের প্রখ্যাত ভাস্কর্য শিল্পী ছিলেন মাইরন, ফিদিয়াস ও প্রাকসিটেলেস।

খেলাধুলা ঃ শিশুদের খেলাধুলার প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হতো। বিদ্যালয়ে তাদের খেলাধুলার হাতেখড়ি হত। শরীরচর্চা খেলাধুলার প্রতি গ্রিকদের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। উৎসবের দিনে গ্রিসে নানা ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হত। এরমধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল দেবতা জিউসের সম্মানে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতা।

অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গ্রিসের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদরা অংশ নিত। এতে দৌড়ঝাঁপ, মল্লযুদ্ধ, চাকা নিক্ষেপ, বর্শা ছোড়া, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকত। বিজয়ীদের জলপাই গাছের ডাল-পাতায় তৈরি মালা দিয়ে পুরস্কৃত করা হত। প্রতি চার বছর পরপর এই খেলা অনুষ্ঠিত হত। এ খেলায় বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের খেলোয়াড়রা অংশ নিত। এই খেলাকে ঘিরে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শত্রুতার বদলে সৌহার্দ্যপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠে।

একক কাজ ঃ গ্রিক সভ্যতার বিখ্যাত মনীষীর নামের তালিকা প্রস্তুত কর।

রোমান সভ্যতা

পটভূমি ঃ গ্রিসের সভ্যতার অবসানের আগেই ইতালিতে টাইবার নদীর তীরে একটি বিশাল সম্রাজ্য ও সভ্যতা গড়ে উঠে। রোমকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা এই সভ্যতা রোমীয় সভ্যতা নামে পরিচিত। প্রথম দিকে রোম একজন রাজার শাসনাধীন ছিল। এ সময় একটি সভা ও সিনেট ছিল। রাজা স্বৈরাচারী হয়ে উঠলে তাকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ৫১০ অব্দে রোমে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। রোমান সভ্যতা প্রায় ছয়শত বছর স্থায়ী হয়েছিল।

ভৌগোলিক অবস্থান ও সময়কাল ঃ ইতালির মাঝামাঝি পশ্চিমাংশে রোম নগর অবস্থিত। ইতালি দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর থেকে উত্তর দিকে আল্পস্ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতালি ও যুগোস্লোভিয়ার মাঝখানে আড্রিয়াটিক সাগর। আড্রিয়াটিক সাগর তীরে ইতালির উত্তর-পূর্ব অংশে গড়ে উঠেছিল প্রাচীন সমুদ্রবন্দর এড্রিয়া। ইতালির পশ্চিমাংশেও ভূমধ্যসাগর অবস্থিত। সাগরের এ অংশকে প্রাচীনকালে বলা হতো এটুস্কান সাগর। কৃষি বিকাশের সুযোগ ছিল বলে প্রাচীন রোম ছিল কৃষিনির্ভর দেশ। ফলে রোমের আদি অধিবাসীদের সঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের সংঘর্ষ সাধারণ বিষয় ছিল। যে কারণে এসব সংঘাত-সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে রোমানরা যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হতে থাকে। রোমীয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নানা উত্থান-পতন, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫৩ অব্দে রোম নগরী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে জার্মান বর্বর জাতিগুলোর হাতে রোমান সম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন হয়।

রোম নগরী ও রোমান শাসনের পরিচয় ঃ গুরুত্বপূর্ণ টাইবার নদীর উৎসমুখ থেকে প্রায় বারো-তেরো মাইল দূরে সাতটি পর্বত শ্রেণির উপর রোম অবস্থিত। এজন্য একে সাতটি পর্বতের নগরীও বলা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠির একদল মানুষ ইতালিতে বসবাস শুরু করে। তাদেরকেই লাতিন বলা হতো। এদের নাম অনুসারে ভাষার নামও হয় লাতিন ভাষা। লাতিন রাজা রোমিউলাস রোম নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর নাম অনুযায়ী নগরের নাম হয় রোম।

রোমের গণতন্ত্র একদিনে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ধাপে ধাপে নানা সংস্কার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিকরা রোমীয় ইতিহাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যথা: খ্রিষ্টপূর্ব ৭৫৩-৫১০ অব্দ পর্যন্ত ছিল রাজতন্ত্রের যুগ। এ যুগে সাতজন সম্রাট দেশ শাসন করেন। এ যুগের সর্বশেষ সম্রাট টারকিউনিয়াস সুপারকাসকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর রোমে প্রজাতন্ত্রের সূত্রপাত। এই প্রজাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চলে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৬০ অব্দ পর্যন্ত। রোমে প্রজাতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে জনগণ বিদ্রোহী নেতা ব্রুটাস এবং অপর এক ব্যক্তিকে জনপ্রতিনিধি হিসেবে শাসনের সুযোগ প্রদান করে। রাজতন্ত্রের পতনের পর রোমের জনগণ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে, প্যাট্রিসিয়ান অর্থাৎ অভিজাত শ্রেণি, আর প্লিবিয়ান যারা সাধারণ নাগরিক। ক্ষুদ্র কৃষক, কারিগর, বণিকরা প্লিবিয়ান শ্রেণিভুক্ত।

একক কাজ ঃ
রোমীয় সভ্যতার বর্ণনা করতে যেসব নদী-সাগর-পাহাড়ের উল্লেখ আছে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে মানচিত্রের কোন স্থানে এগুলোর অবস্থান তা নির্দেশ কর।

প্রজাতন্ত্রের প্রথম ২০০ বছর ছিল প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ানদের মধ্যে সংঘাতের ইতিহাস। সমাজে প্লিবিয়ানরা বঞ্চিত শ্রেণি ছিল। অধিকার বঞ্চিত প্লিবিয়ানরা ক্রমাগত সংগ্রাম করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত প্লিবিয়ানরা কিছু অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়। প্লিবিয়ানদের দাবির মুখে রোমান আইন সংকলিত হতে থাকে। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দে প্লিবিয়ানরা ব্রোঞ্জপাতে ১২টি আইন লিখিতভাবে প্রণয়ন করে। আন্দোলনের চূড়ান্ত বিজয় হিসেবে দুইজন কনসালের মধ্যে একজন প্লিবিয়ানদের পক্ষ থেকে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এভাবে, রোমান প্রজাতন্ত্র গণতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়।

রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ক্রমে দেশটি সম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে রোম সমগ্র ইতালির উপর প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়। ১৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৪৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রোমান সভ্যতার অন্ধকার যুগ। ধনী-দরিদ্র সংঘাত, দাস বিদ্রোহ, ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে চরম বিশৃঙ্খলা, হানাহানি, সহিংসতায় উন্মত্ত হয়ে উঠে রোম।

রোমের অর্থনীতি ছিল দাসদের উপর নির্ভরশীল। অমানুষিক নির্যাতনে দাসরা স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। দুই বছরব্যাপী তারা তাদের বিদ্রোহ টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। ৭১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে স্পার্টাকাস নিহত হলে বিদ্রোহের অবসান হয়। চরম নির্যাতন নেমে আসে দাসদের উপর।

অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা ছাড়াও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়ে রোম। ফলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক নেতারা ক্ষমতায় আসতে থাকে এবং রোমে গৃহযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতার দ্বন্দ্বের একপর্যায়ে সমঝোতার ভিত্তিতে তিনজন নেতা একযোগে ক্ষমতায় আসেন, যা ইতিহাসে ত্রয়ী শাসন নামে পরিচিত। বিশাল রোম সাম্রাজ্যকে তিন ভাগ করে শাসনের দায়িত্ব নেন অক্টোভিয়াস সিজার, মার্ক এন্টনি ও লেপিডাস। লেপিডাসের দায়িত্বে ছিল আফ্রিকার প্রদেশসমূহ, অক্টোভিয়াস সিজারের দায়িত্বে ছিল ইতালিসহ সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশ, এন্টনির দায়িত্বে ছিল পূর্বাঞ্চল। তবে তিনজনের শাসন বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। কারণ প্রত্যেকেরই আকাঙ্ক্ষা ছিল রোমের একচ্ছত্র অধিপতি বা সম্রাট হওয়ার। ফলে, খুব শীঘ্রই আবার ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়ে যায়। অক্টোভিয়াস সিজার পরাজিত করে লেপিডাসকে, এদিকে মার্ক এন্টনি মিশরের রাজকন্যা ক্লিওপেট্রাকে বিয়ে করে তাঁর শক্তি বৃদ্ধি করেন। কিন্তু, অক্টোভিয়াস সিজারের সঙ্গে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাজিত হন। ক্ষমতা দখল করে অক্টোভিয়াস সিজার অগাস্টাস সিজার নাম ধারণ করে সিংহাসন আরোহণ করেন। ইতিহাসে তিনি এই নামেই বেশি পরিচিত। ১৪ খ্রিষ্টাব্দে অগাস্টাস সিজারের মৃত্যু হয়। তাঁর সময়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা যিশুখ্রিষ্টের জন্ম। অগাস্টাস সিজারের মৃত্যুর পর রোমে আবার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিদেশি আক্রমণ, বিশেষ করে জার্মান বর্বর গোত্রগুলোর আক্রমণ তীব্র হতে থাকে। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার কোন্দলের কারণে রোমানদের শক্তি ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে। রোমের শেষ সম্রাট রোমিউলাস অগাস্টুলাস জার্মান বর্বর গোত্রের তীব্র আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হলে ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাজ্যের চূড়ান্ত পতন ঘটে। ইতোমধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মের অগ্রযাত্রা শুরু হয় এবং জার্মানদের উত্থান ঘটে।

সভ্যতায় রোমের অবদান ঃ রোম শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, স্থাপত্য সর্বক্ষেত্রে গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। তারা এই সব বিষয়ে গ্রিকদের অনুসরণ ও অনুকরণ করেছে। তবে সামরিক সংগঠন, শাসন পরিচালনা, আইন ও প্রকৌশল বিদ্যায় তারা গ্রিক ও অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে আধুনিক বিশ্ব রোমানদের কাছে ব্যাপক ঋণী।

শিক্ষা, সাহিত্য ও লিখন পদ্ধতি ঃ এ সময়ে শিক্ষা বলতে বুঝাতো খেলাধুলা ও বীরদের স্মৃতিকথা বর্ণনা করা। যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে দিয়ে রোমের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সুতরাং তাদের সব কিছুই ছিল যুদ্ধকে কেন্দ্র করে। তারপরেও উচ্চ

শ্রেণিভুক্ত রোমানদের গ্রিক ভাষা শিক্ষা ছিল একটি ফ্যাশন। ফলে এদের অনেকেই গ্রিক সাহিত্যকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করার দক্ষতা অর্জন করে। রোমের অভিজাত যুবকরা গ্রিসের বিভিন্ন বিখ্যাত বিদ্যাপীঠে শিক্ষালাভ করতে যেত।

দলীয় কাজ ঃ রোমের ত্রয়ী শাসন আমলে কে কোন অঞ্চলের শাসক ছিলেন তা ছকে উল্লেখ কর।

শাসকের নাম	শাসিত অঞ্চলসমূহ
১।	
২।	
৩।	

সে যুগে সাহিত্যে অবদানের জন্য প্লুটাস ও টেরেন্সর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরা দুইজন মিলনাত্মক নাটক রচনার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে সবচেয়ে উন্নতি দেখা যায় অগাস্টাস সিজারের সময়। এ যুগের কবি হোরাস ও ভার্জিল যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভার্জিলের মহাকাব্য 'ইনিড' বহু ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। ওভিদ ও লিভি এ যুগের খ্যাতনামা কবি। লিভি ইতিহাসবিদ হিসেবেও বিখ্যাত ছিলেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্যাসিটাসও এ যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও বিজ্ঞান ঃ রোমান স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর বিশালতা। সম্রাট হার্ডিয়ানের তৈরি ধর্মমন্দির প্যানথিয়ন রোমানদের স্থাপত্যের এক অসাধারণ নিদর্শন। ৮০ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সম্রাট টিটাস কর্তৃক নির্মিত কলোসিয়াম নাট্যশালা নির্মিত হয়, যেখানে একসঙ্গে ৫৬০০ দর্শক বসতে পারত। স্থাপত্যকলার পাশাপাশি রোমীয় ভাস্কর্যেরও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। রোমীয় ভাস্করগণ দেব-দেবী, সম্রাট, দৈত্য, পুরাণের বিভিন্ন চরিত্রের মূর্তি তৈরি করতেন মার্বেল পাথরের।

কলোসিয়াম

বিজ্ঞানে রোমানরা তেমন কোনো অবদান রাখতে না পারলেও বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হন। এদের মধ্যে প্লিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশ্বকোষ প্রণয়ন করেন। এতে প্রায় পাঁচশ বিজ্ঞানীর গবেষণাকর্ম স্থান পেয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোমীয়দের অবদান ছিল। বিজ্ঞানী সেলসাস চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর বই লেখেন। এছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রে গ্যালেন বুকাসে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

ধর্ম, দর্শন ও আইন ঃ রোমানরা ধর্মীয় ক্ষেত্রেও গ্রিকদের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। অনেক গ্রিক দেব-দেবীর নাম পরিবর্তন হয়ে রোমানদের দেব-দেবী হয়েছে। রোমাদের অন্যতম প্রধান দেবতার নাম ছিল জুপিটার। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেব-দেবী হচ্ছে জুনো, নেপচুন, মার্স, ভালকান, ভেনাস, মিনার্ভা, ব্যাকাস ইত্যাদি। রোমীয় দেবমন্দিরে প্রধান পুরোহিত ছিলেন যাঁরা, তাঁরা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। তবে রোমানদের পরকালের প্রতি বিশ্বাস ছিল না। অগাস্টাস সিজারের সময় থেকে ঈশ্বর হিসেবে সম্রাটকে পূজা করার রীতি চালু হয়। উল্লেখ্য, এ সময় খ্রিষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যিশু খ্রিষ্টের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে রোমান ধর্মের পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করতে থাকে। অনেক রোমান এই ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করে। এতে সম্রাট ক্ষুব্ধ হন কারণ খ্রিষ্টধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে গেলে সম্রাটকে আর ঈশ্বরের মতো পূজা করা যায় না। ফলে রোমান সম্রাটরা এই ধর্ম প্রচার বন্ধ করে দেন এবং খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণকারী রোমানদের উপর নির্যাতন শুরু করেন। কিন্তু সম্রাট কন্সটানটাইন খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মকে রোমান সরকারি ধর্মে পরিণত করেন।

অনেকে মনে করেন যে রোমীয় দর্শন গ্রিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। তবুও রোমীয় দর্শনে সিসেরো, লুক্রেটিয়াস (খ্রিষ্টপূর্ব ৯৮-৫৫ অব্দে) তাঁদের সুচিন্তিত দার্শনিক মতবাদ দ্বারা অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। রোমে স্টোইকবাদী দর্শন যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০ অব্দে রোডস দ্বীপের প্যানেটিয়াস এই মতবাদ প্রথম রোমে প্রচার করে।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে রোমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে আইন। খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের মাঝামাঝি সময়ে রোমানরা ফৌজদারি ও দেওয়ানি আইনগুলো সুষ্ঠুভাবে একসঙ্গে সাজাতে সক্ষম হন। জাস্টিনিয়ান খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪০ অব্দে ১২টি ব্রোঞ্জ পাতে সর্বপ্রথম আইনগুলো খোদাই করে লিখিত হয় এবং জনগণকে দেখাবার জন্য প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। রোমীয় আইনের দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। রোমান আইনকে তিনটি শাখায় ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

১. **বেসামরিক আইন ঃ** এই আইন পালন করা রোমান নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। এই আইন লিখিত অলিখিত দুই রকম ছিল।

২. **জনগণের আইন ঃ** এ আইন সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য ছিল। তাছাড়া ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষার বিষয়টি এই আইনে ছিল। তবে এর মাধ্যমে দাস প্রথাও স্বীকৃতি লাভ করে। সিসেরো এ আইনের প্রণেতা।

৩. **প্রাকৃতিক আইন ঃ** এ আইনে মূলত নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার কথা বলা হয়েছে।

আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রোমানদের অবদান চিরস্মরণীয়। আধুনিক বিশ্বও সম্পূর্ণভাবে রোমান আইনের উপর নির্ভরশীল। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে সম্রাট জাসটিনিয়ন প্রথম সমস্ত রোমান আইনের সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করেন।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. মিশরীয়রা সর্বপ্রথম কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ আবিষ্কার করে?

ক. ২৩ টি খ. ২৪ টি

গ. ২৫ টি ঘ. ২৬ টি

২. মিশরীয়দের কাছে ধর্ম এত গুরুত্বপূর্ণ ছিল কেন?

ক. মিশরীয়রা সর্বক্ষেত্রে ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল খ. অভিজাত সম্প্রদায় ধর্মের গুরুত্ব দিত

গ. পুরোহিতরা দেশ শাসন করত ঘ. মিশরীয়রা ধর্মে বিশ্বাসী ছিল

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

অলিম্পিক ক্রীড়ার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের পরিবেশনা দেখে সীমা ও তার পরিবার অভিভূত হয়। অনুষ্ঠান দেখে সীমার একটি সভ্যতার কথা মনে পড়ল এবং সে তার স্কুলে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করবে বলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে ধারণা নেয়।

৩. সীমার কোন সভ্যতার কথা মনে পড়ে?

ক. রোমান খ. গ্রিক

গ. চৈনিক ঘ. সিন্ধু

৪. এ ধরনের আয়োজনে বিভিন্ন দেশের মধ্যে গড়ে উঠতে পারে-

i. অর্থনৈতিক ঐক্য

ii. সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়

iii. রাজনৈতিক সমঝোতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। এখানে প্রায় প্রতি বছরই বন্যায় নদীর তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়। বন্যার পানি নেমে গেলে তীরবর্তী এলাকায় পলি জমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। ফলে ঐ অঞ্চলে চাষাবাদ করে কৃষকরা প্রচুর ফসল উৎপাদন করে এবং সমৃদ্ধি লাভ করে।

ক. কোন রাজা রোম নগরী প্রতিষ্ঠা করেন?

খ. রোমে তিনজনের শাসন টিকেনি কেন? বর্ণনা কর।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার সাথে কোন সভ্যতার কোন অববাহিকার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. সভ্যতার বিকাশে উদ্দীপকে বর্ণিত অবস্থার তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার জনপদ

ইতিহাস বিষয়ক আলোচনায় যুগের বিভাজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য এর বিকাশ ও প্রভাবের কার্যকারিতা নিয়েই এ যুগ বিভাজন নির্ণয় করা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিকগণ খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ১৩ শতক পর্যন্ত সময়কালকে বাংলার ইতিহাসের প্রাচীন যুগ বলে মনে করেন। আবার কেউ কেউ খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠশতক পর্যন্ত সময়কালকে আদি ঐতিহাসিক যুগ এবং খ্রিষ্টীয় ৭ম শতক থেকে ১৩ শতক পর্যন্ত সময়কালকে প্রাক মধ্যযুগ বলেও যুগ বিভাজন করে থাকেন।

প্রাচীন যুগে বাংলা (বর্তমানের বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ) এখনকার বাংলাদেশের মতো কোনো একক ও অখণ্ড রাষ্ট্র বা রাজ্য ছিল না। বাংলার বিভিন্ন অংশ তখন অনেক ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আর প্রতিটি অঞ্চলের শাসক যার যার মতো শাসন করতেন। বাংলার এ অঞ্চলগুলোকে তখন সমষ্টিগতভাবে নাম দেয়া হয় 'জনপদ'।

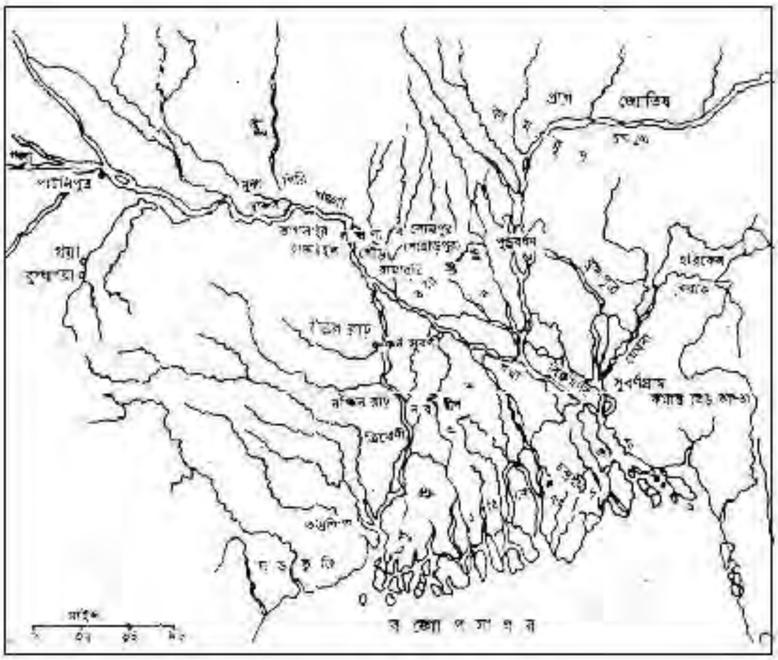

মানচিত্র : প্রাচীন বাংলার জনপদ

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- মানচিত্রে প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর বর্তমান অবস্থান চিহ্নিত ও বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার তথ্য অনুসন্ধানে জনপদগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভে জনপদগুলোর গুরুত্ব জানতে আগ্রহী হব।

জনপদ

চতুর্থ শতক হতে গুপ্ত যুগ, গুপ্ত পরবর্তী যুগ, পাল, সেন প্রভৃতি আমলের উৎকীর্ণ শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রন্থে প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর নাম পাওয়া যায়। এসব জনপদ ঠিক কোথায় কতখানি জায়গা জুড়ে ছিল তা অনুমান করা যায় না। তবে প্রাচীনকালের প্রাপ্ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান হতে তাদের অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিচে কয়েকটি জনপদের বর্ণনা দেওয়া হলো।

গৌড় : গৌড় নামটি সুপরিচিত হলেও প্রাচীনকালে গৌড় বলতে ঠিক কোন অঞ্চলকে বোঝাত এ নিয়ে প্রচুর মতভেদ আছে। আর কেনই বা সে অঞ্চল এ নামে অভিহিত হতো আজ পর্যন্ত সেটাও সঠিকভাবে জানা যায় নি। পাণিনির গ্রন্থে সর্বপ্রথম গৌড়ের উল্লেখ দেখা যায়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' গ্রন্থে গৌড় দেশের অনেক শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাৎসায়নের গ্রন্থেও তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে গৌড়ের নাগরিকদের বিলাস-ব্যসনের পরিচয় পাওয়া যায়। হর্ষবর্ধনের শিলালিপি হতে প্রমাণ হয় যে, সমুদ্র উপকূল হতে গৌড়দেশ খুব বেশি দূরে অবস্থিত ছিল না। ষষ্ঠ শতকে লেখা বরাহ মিহিরের বিবরণ হতে দেখা যায় যে, গৌড় অন্যান্য জনপদ, যথা– পুণ্ড্র, বঙ্গ, সমতট থেকে আলাদা একটি জনপদ। 'ভবিষ্য পুরাণ'-এ একে পদ্মা নদীর দক্ষিণে এবং বর্ধমানের উত্তরে অবস্থিত অঞ্চল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ উক্তির সঙ্গে সপ্তম শতকের লোকদের বর্ণনার যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে। সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাংকের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কর্ণসুবর্ণ। আর শুধু বা শশাংক কেন, পরবর্তীকালে আরও অনেকের রাজধানী ছিল এই গৌড়।

পাল রাজাদের আমলে গৌড়ের নাম-ডাক ছিল সবচেয়ে বেশি। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল হওয়ায় তার প্রতাপ ছিল অপ্রতিহত। পরবর্তীকালে পাল সাম্রাজ্যের ভাগ্য পরিবর্তনের সাথে সাথে গৌড়ের ভাগ্যও পরিবর্তিত হয়ে যায়। গৌড়ের পরিসীমা তখন সীমাবদ্ধ হয়ে আসে। আধুনিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশ গৌড়ের সীমানা বলে মনে করা হয়। সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাংকের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণ। মুসলমান যুগের শুরুতে মালদহ জেলার লক্ষণাবর্তী গৌড় নামে অভিহিত হতো। পরে গৌড় বলতে সমগ্র বাংলাকে বুঝাত।

বঙ্গ ঃ বঙ্গ একটি অতি প্রাচীন জনপদ। অতি প্রাচীন পুঁথিতে একে মগধ ও কলিঙ্গ জনপদের প্রতিবেশী বলা হয়েছে। মহাভারতের উল্লেখ হতে বোঝা যায়, বঙ্গ মূলত, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত ও সুহ্মের সংলগ্ন দেশ। চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, চালুক্য রাজা ও রাষ্ট্রকূটদের শিলালিপি এবং কালিদাসের গ্রন্থে এ জনপদের বর্ণনা পাওয়া যায়। বর্তমান বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বঙ্গ নামে একটি জনপদ গড়ে উঠেছিল। অনুমান করা হয়, এখানে 'বং' নামে এক জাতি বাস করত। তাই জনপদটি পরিচিত হয় 'বঙ্গ' নামে। সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে মনে হয়, গঙ্গা ও ভাগিরথীর মাঝখানের অঞ্চলকেই বঙ্গ বলা হতো।

পাল ও সেন বংশীয় রাজাদের আমলে বঙ্গের আয়তন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। একাদশ শতকে পাল বংশের শেষ পর্যায়ে বঙ্গ জনপদ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বঙ্গ নামে পরিচিত হয়। পদ্মা ছিল উত্তরাঞ্চলের উত্তর সীমা, দক্ষিণের বদ্বীপ অঞ্চল ছিল দক্ষিণ বঙ্গ। পরবর্তীকালে কেশব সেন ও বিশ্বরূপ সেনের আমলেও বঙ্গের দুইটি ভাগ পরিলক্ষিত হয়। তবে এবার নাম আলাদা– একটি 'বিক্রমপুর' ও অপরটি 'নাব্য'। প্রাচীন শিলালিপিতে 'বিক্রমপুর' ও 'নাব্য' নামে বঙ্গের দুটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। বর্তমান বিক্রমপুর পরগনা ও তার সাথে আধুনিক ইদিলপুর পরগনার কিয়দংশ নিয়ে ছিল বিক্রমপুর। নাব্য বলে বর্তমানে কোন জায়গার অস্তিত্ব নেই। ধারণা করা হয়, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালীর নিম্ন জলাভূমি এ নাব্য অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বৃহত্তর বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ জেলার পশ্চিমাঞ্চল, ঢাকা, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালীর কিছু অংশ নিয়ে বঙ্গ গঠিত হয়েছিল। 'বঙ্গ' থেকে 'বাঙালি' জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল।

পুণ্ড্র ঃ প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো পুণ্ড্র। বলা হয় যে, 'পুণ্ড্র' বলে একটি জাতি এ জনপদ গড়ে তুলেছিল। বৈদিক সাহিত্য ও মহাভারতে এ জাতির উল্লেখ আছে। পুণ্ড্রদের রাজ্যের রাজধানীর নাম পুণ্ড্রনগর।

মহাস্থানগড়, বগুড়া

পরবর্তীকালে এর নাম হয় মহাস্থানগড়। সম্ভবত মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ) প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্য স্বাধীন সত্তা হারায়। সমৃদ্ধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে তা পুণ্ড্রবর্ধনে রূপান্তরিত হয়েছে। সে সময়কার পুণ্ড্রবর্ধন অন্তত বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। রাজমহল ও গঙ্গা-ভাগীরথী হতে আরম্ভ করে করতোয়া পর্যন্ত মোটামুটি সমস্ত উত্তর বঙ্গই বোধহয় সে সময় পুণ্ড্রবর্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেন আমলে পুণ্ড্রবর্ধনের দক্ষিণ সীমা পদ্মা পেরিয়ে একেবারে খাড়ি বিষয় (বর্তমান চব্বিশ পরগনার খাড়ি পরগনা) ও ঢাকা-বরিশালের সমুদ্র তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বগুড়া হতে সাত মাইল দূরে মহাস্থানগড় প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। প্রাচীন সভ্যতার নির্দশনের দিক দিয়ে পুণ্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ। বাংলাদেশে প্রাপ্ত পাথরের চাকতিতে খোদাই করা সম্ভবত প্রাচীনতম শিলালিপি এখানে পাওয়া গেছে।

হরিকেল ঃ সপ্তম শতকের লেখকেরা হরিকেল নামে অপর এক জনপদের বর্ণনা করেছেন। চীনা ভ্রমণকারী ইৎসিং বলেছেন, হরিকেল ছিল পূর্ব ভারতের শেষ সীমায়। আবার কারো কারো লিপিতে হরিকেলের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বর্তমান চট্টগ্রামেরও অংশ খুঁজে পাওয়া যায়। সমস্ত তথ্য পর্যালোচনা করে ধরে নেওয়া যায় যে, পূর্বে শ্রীহট্ট (সিলেট) থেকে চট্টগ্রামের অংশ বিশেষ পর্যন্ত হরিকেল জনপদ বিস্তৃত ছিল। বঙ্গ, সমতট ও হরিকেল- তিনটি পৃথক জনপদ হলেও এরা খুব নিকট প্রতিবেশী হওয়ায় কখনো কখনো কোনো কোনো এলাকায় অন্য জনপদের প্রভাব বিরাজ করত বলে ধারণা করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, সপ্তম ও অষ্টম শতক হতে দশম ও একাদশ শতক পর্যন্ত হরিকেল একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। কিন্তু পূর্ব-বাংলার চন্দ্র রাজবংশের রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের চন্দ্রদ্বীপ অধিকারের পর হতে হরিকেলকে মোটামুটি বঙ্গের অংশ বলে ধরা হয়। অনেকে আবার শুধু সিলেটের সাথে হরিকেলকে অভিন্ন বলে মনে করেন।

সমতট ঃ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বঙ্গের প্রতিবেশী জনপদ হিসেবে ছিল সমতটের অবস্থান। এ অঞ্চলটি ছিল আর্দ্র নিম্নভূমি। কেউ কেউ মনে করেন সমতট বর্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম। আবার কেউ মনে করেন, কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল নিয়ে সমতট গঠিত হয়েছিল। সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত বর্তমান ত্রিপুরা জেলা ছিল সমতটের অন্যতম অংশ। এক সময় এ জনপদের পশ্চিম সীমা চব্বিশ পরগনার খাড়ি পরগনা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত সমুদ্রকূলবর্তী অঞ্চলকেই সম্ভবত বলা হতো সমতট। কুমিল্লা শহরের ১২ মাইল পশ্চিমে বড় কামতা নামক রাজধানী ছিল। কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি প্রাচীন নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'শালবন বিহার' এদের অন্যতম।

বরেন্দ্র ঃ বরেন্দ্রী, বরেন্দ্র বা বরেন্দ্র ভূমি নামে প্রাচীন বাংলায় অপর একটি জনপদের কথা জানা যায়। এটিও উত্তর বঙ্গের একটি জনপদ। বরেন্দ্র পুণ্ড্রবর্ধন জনপদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিল। জনপদের প্রধান শহর, মৌর্য ও গুপ্ত আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্তার কেন্দ্র পুণ্ড্রনগরের অবস্থানও ছিল এই বরেন্দ্র এলাকায়। তাই একে জনপদ বলা যায় না। কিন্তু এ নামে এক সময় সমগ্র এলাকা পরিচিত হতো। তাই প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে একে জনপদের মর্যাদা দেওয়া হয়। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ছিল এ জনপদের অবস্থান। বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলার অনেক অঞ্চল এবং সম্ভবত পাবনা জেলা জুড়ে বরেন্দ্র অঞ্চল বিস্তৃত ছিল।

তাম্রলিপ্ত ঃ হরিকেলের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল তাম্রলিপ্ত জনপদ। বর্তমান মেদিনীপুর জেলার তমলুকই ছিল তাম্রলিপ্তের প্রাণকেন্দ্র। সমুদ্র উপকূলবর্তী এ এলাকা ছিল খুব নিচু ও আর্দ্র। নৌ চলাচলের জন্য জায়গাটি ছিল খুব উত্তম। প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্ত গুরুত্বপূর্ণ নৌ-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। হুগলী ও রূপনারায়ণ নদের সঙ্গমস্থল হতে ১২ মাইল দূরে রূপনারায়ণের তীরে এ বন্দরটি অবস্থিত ছিল। সপ্তম শতক হতে এটি দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হতে থাকে। অষ্টম শতকের পর হতেই তাম্রলিপ্ত বন্দরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়।

চন্দ্রদ্বীপ ঃ উপর্যুক্ত জনপদগুলো ছাড়া আরও একটি ক্ষুদ্র জনপদের নাম প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়। এটা হলো চন্দ্রদ্বীপ। বর্তমান বরিশাল জেলাই ছিল চন্দ্রদ্বীপের মূল ভূ-খণ্ড ও প্রাণকেন্দ্র। এ প্রাচীন জনপদটি বালেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল।

এছাড়া বৃহত্তর প্রাচীন বাংলায় দণ্ডভুক্তি, উত্তর রাঢ় (বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ, সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা), দক্ষিণ রাঢ় (বতর্মান বর্ধমানের দক্ষিণাংশ, হুগলীর বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা), বাংলা বা বাঙলা (সাধারণত খুলনা, বরিশাল ও পটুয়াখালীর সুন্দর বনাঞ্চল) ইত্যাদি নামেও শক্তিশালী জনপদ ছিল। এভাবে অতি প্রাচীনকাল হতে ষষ্ঠ-সপ্তম শতক পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। মূলতঃ এটি ছিল রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক বিভাগ। সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে শশাংক গৌড়ের রাজা হয়ে মুর্শিদাবাদ হতে উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) পর্যন্ত সমগ্র এলাকাকে সংঘবদ্ধ করেন। তারপর হতে বাংলা তিনটি জনপদ নামে পরিচিত হত। এগুলো হলো–পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ। অন্য জনপদগুলো এ তিনটির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। বিভক্ত জনপদগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা পাল ও সেন রাজাদের আমলেই অনেকটা পূর্ণতা লাভ করে। শশাংশ এবং পাল রাজারা সমগ্র পশ্চিম বঙ্গের রাজা হয়েও 'রাঢ়াধিপতি' বা 'গৌড়েশ্বর' বলেই পরিচয় দিতেন। ফলে 'গৌড়' নামটি পরিচিতি লাভ করে।

প্রাচীন বাংলার জনপদ হতে আমরা তখনকার বাংলার ভৌগোলিক অবয়ব, সীমারেখা, রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করতে পারি। প্রাচীন বাংলায় তখন কোনো রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। শক্তিশালী শাসকগণ তাদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে একাধিক জনপদের শাসন ক্ষমতা লাভ করতেন। এভাবে জনপদগুলো প্রাচীন বাংলায় প্রথম ভূখণ্ডগত ইউনিট বা প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে ভূমিকা পালন করে পরবর্তীতে রাজনৈতিক ঐক্য গঠনে সহায়তা করেছিল।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন জনপদ থেকে 'বাঙ্গাল' জাতির উৎপত্তি ঘটেছিল?

ক. বরেন্দ্র খ. পুণ্ড্র
গ. বঙ্গ ঘ. গৌড়

২. তাম্রলিপ্ত জনপদটি ছিল–

i. সমুদ্র উপকূলবর্তী খুব নিচু ও আর্দ্র
ii. স্থল বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত
iii. নৌ চলাচলের জন্য অতি উত্তম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিলা শীতকালীন ছুটিতে মা-বাবার সাথে রাজশাহীর বরেন্দ্র জাদুঘর পরিদর্শনে যায় । সেখানে গিয়ে সে প্রাচীন নিদর্শনের সাথে পরিচিতি লাভ করে । এর মধ্যে বিশেষ করে ছিল পাথরের চাকতিতে খোদাই করা লিপি । সে জানতে পারে এটি ছিল বাংলাদেশে পাওয়া প্রাচীন শিলালিপি এবং সম্রাট অশোকের সময় এ লিপি উৎকীর্ণ করা হয়েছিল ।

৩. শিলার পরিচিত হওয়া নিদর্শনগুলো প্রাচীন কোন জনপদের ইঙ্গিত বহন করে?

ক. গৌড় খ. পুণ্ড্র

গ. সমতট ঘ. বরেন্দ্র

৪. উক্ত জনপদটি প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ জনপদ, কারণ এটি-

i. সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন

ii. সমৃদ্ধ নগরী হিসেবে পরিচিত

iii. খ্যাতিপূর্ণ নৌ-বাণিজ্যিক কেন্দ্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১.

শালবন বিহার

ক. জনপদ বলতে কী বোঝায়?

খ. গৌড়রাজ শশাংকের রাজধানী ছিল কোনটি?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত নিদর্শনটি প্রাচীন কোন জনপদে অবস্থিত? ব্যাখ্যা কর ।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত জনপদটিই প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে উন্নত জনপদ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও ।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দ থেকে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)

পাল রাজাদের শাসনকাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। এর আগের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। এ সময়কালে কোনো শাসক দীর্ঘদিন সমগ্র বাংলা জুড়ে শাসন করতে পারেন নি। তাই বিচ্ছিন্নভাবেই বাংলার রাজনৈতিক জীবনের বিকাশ ঘটেছে। মৌর্য ও গুপ্ত শাসনের অবসানের পর এক অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয়। এরই মধ্য দিয়ে উত্থান ঘটে কিছু স্বাধীন রাজ্যের। স্বাধীন রাজ্য উত্থানের যুগে উত্তর বাংলার রাজা শশাংক ছিলেন সবচেয়ে শক্তিমান। তাঁর মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল বাংলায় কোন যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে রাজ্য জুড়ে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রায় একশত বছর এ অবস্থার মধ্যে কাটে। অতঃপর গোপাল নামে এক নেতা এ অরাজক অবস্থার অবসান ঘটান এবং পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। দ্বাদশ শতকের মাঝামাঝি পাল বংশের পতন ঘটে। পাল শাসন যুগেই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠে। এরপর দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে আগত সেন বংশ পূর্ব বাংলায় রাজ্য স্থাপন করে। প্রায় দুইশত বছর সেন শাসন অব্যাহত ছিল। ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দশকে মুসলমান শক্তির হাতে সেন রাজত্বের অবসান ঘটে। শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়– বাংলার মধ্যযুগ।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও তাঁদের শাসনকাল সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাক-পালযুগের বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক চর্চায় তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশসমূহের অবদান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হব;
- গুরুত্বপূর্ণ রাজ বংশগুলো সম্পর্কে ধারণা লাভ করে প্রাচীন বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে জানতে সমর্থ হব;
- দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার রাজ্যসমূহ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারব।

প্রাচীন বাংলার গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশ ও শাসন-ব্যবস্থা

মৌর্য ও গুপ্ত যুগে বাংলা

গুপ্ত যুগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করার তেমন কোনো উপাদান পাওয়া যায়নি। কেননা তখনকার মানুষ আজকের মতো ইতিহাস লেখায় অভ্যস্ত ছিল না। ভারতীয় এবং বিদেশি সাহিত্যে এ সময়কার বাংলা সম্পর্কে ইতস্তত ও বিক্ষিপ্ত উক্তি হতে আমরা ইতিহাসের অল্পস্বল্প উপাদান পাই। এ সকল বিচ্ছিন্ন ঘটনা জোড়াতালি দিয়ে সন-তারিখ ও প্রকৃত ঘটনা সম্বলিত ধারাবাহিক কোনো ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়। বস্তুত খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭-২৬ অব্দে গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় হতে প্রকৃত ইতিহাসের রূপ পরিগ্রহ করে। গ্রিক লেখকদের কথায় তখন বাংলাদেশে 'গঙ্গারিডই' নামে এক শক্তিশালী রাজ্য ছিল। গঙ্গা নদীর যে দুটি স্রোত এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলে পরিচিত–এ উভয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলই 'গঙ্গারিডই' জাতির বাসস্থান ছিল। গ্রিক গ্রন্থকারগণ গঙ্গারিডই ছাড়াও 'প্রাসিঅয়' নামে অপর এক জাতির উল্লেখ করেছে।

তাদের রাজধানীর নাম ছিল পালিবোথরা (পাটলিপুত্র)। গ্রিক লেখকদের বর্ণনার উপর নির্ভর করে অনুমান করা যেতে পারে যে এ দুই জাতি একই রাজবংশের নেতৃত্বে একসঙ্গে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল। এও অনুমান

করা যেতে পারে, আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময় বাংলার রাজা মগধাদি দেশ জয় করে পাঞ্জাব পর্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি ছিলেন পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় কোনো রাজা। এ সময় যে বাংলার রাজাই সমধিক শক্তিশালী ছিলেন প্রাচীন গ্রিক লেখকগণের লেখা থেকে তা নি:সন্দেহে প্রমাণিত হয়।

আলেকজান্ডারের ভারত ত্যাগের মাত্র দুই বছর পর ৩২১ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতের এক বিশাল অঞ্চলের উপর মৌর্য বংশের প্রভুত্ব স্থাপন করেন। উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে (২৬৯-২৩২ খ্রিষ্টপূর্ব)। অঞ্চলটি মৌর্যদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন পুণ্ড্রনগর ছিল এ প্রদেশের রাজধানী। উত্তর বঙ্গ ছাড়াও মৌর্য শাসন কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ), তাম্রলিপ্ত, (হুগলী) ও সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর শুঙ্গ ও পরে কন্ব বংশের আবির্ভাব ঘটে। ধারণা করা হয় তারা কিছু ছোট অঞ্চলের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। এরপর বেশ কয়েকটি বিদেশি শক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে। এদের মধ্যে গ্রিক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে এ আক্রমণকারীরা বাংলা পর্যন্ত এসেছিল কি-না তা বলা যায় না।

ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ৩২০ খ্রিষ্টাব্দে। তখন বাংলায় কিছু স্বাধীন রাজ্যের উত্থান ঘটে। এগুলোর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সমতট রাজ্য ও পশ্চিম বাংলার পুষ্করণ রাজ্য উল্লেখযোগ্য। গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই উত্তর বঙ্গের কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে সমগ্র বাংলা জয় করা হলেও সমতট একটি করদ রাজ্য ছিল। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকাল হতে ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনস্থ একটি 'প্রদেশ' বা 'ভুক্তি' হিসেবে পরিগণিত হতো। মৌর্যদের মতো এদেশে গুপ্তদের রাজধানী ছিল মহাস্থানগড়ের পুণ্ড্রনগর।

গুপ্ত পরবর্তী বাংলা

পঞ্চম শতকে দুর্ধর্ষ পাহাড়ি জাতি হুন ও ষষ্ঠ শতকে মালবের যশোবর্মণের আক্রমণের ফলে ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধেই গুপ্ত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সারা উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। এভাবে গুপ্তদের পর সমগ্র উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সে সুযোগে বাংলাদেশে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। এর একটি হলো বঙ্গ। এর অবস্থান দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম-বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে। দ্বিতীয় রাজ্যের নাম গৌড়। এর অবস্থান ছিল বাংলার পশ্চিম ও উত্তর বাংলা নিয়ে।

একক কাজ ঃ বাংলার ইতিহাসে বঙ্গ ও গৌড় জনপদ দুইটির ঐতিহাসিক পটভূমি উল্লেখ কর।

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বঙ্গ জনপদে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। তাম্র শাসন (তামার পাতে খোদাই করা রাজার বিভিন্ন ঘোষণা বা নির্দেশ) থেকে জানা যায় যে, গোচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিনজন রাজা স্বাধীন বঙ্গরাজ্য শাসন করতেন। এঁরা সবাই 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের রাজত্বকাল ছিল ৫২৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে।

কোন সময়ে এবং কীভাবে স্বাধীন ও শক্তিশালী বঙ্গ রাজ্যের পতন হয়েছিল তা বলা যায় না। ধারণা করা হয়, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য বংশের রাজা কীর্তিবর্মনের হাতে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের পতন ঘটেছিল। ভিন্ন মত যাঁরা পোষণ করেন তাঁরা বলেন, স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উত্থান ঘটলে বঙ্গ রাজ্যের পতন ঘটে। আবার স্বাধীন বঙ্গ রাজ্যের পতনের পেছনে কিছু সামন্ত রাজার উত্থানকেও দায়ি করা হয়। কারণ সপ্তম শতকের পূর্বেই দক্ষিণ বাংলার সমতট রাজ্যে ভদ্র, খড়গ, রাঢ় প্রভৃতি বংশের স্বাধীন ও সামন্ত রাজাদের উত্থান ঘটেছিল।

স্বাধীন গৌড় রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ষষ্ঠ শতকে 'পরবর্তী গুপ্ত বংশ' বলে পরিচিত গুপ্ত উপাধিধারী রাজাগণ উত্তর বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ ও মগধে ক্ষমতা বিস্তার করেছিলেন। ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এ অঞ্চলই গৌড় জনপদ নামে পরিচিতি লাভ করে। মৌখরি ও পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বছর পুরুষানুক্রমিক সংঘর্ষ এবং উত্তর

থেকে তিব্বতীয় ও দাক্ষিণাত্য থেকে চালুক্যরাজগণের ক্রমাগত আক্রমণের ফলে বাংলায় গুপ্তবংশীয় রাজাগণ দুর্বল হয়ে পড়ে। এ অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সামন্তরাজা শশাংক সপ্তম শতকের গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

শশাংক : শশাংকের পরিচয়, তাঁর উত্থান ও জীবন-কাহিনি আজও পণ্ডিতদের নিকট পরিষ্কার নয়। কেননা তাঁর আমলের ইতিহাসের যে সমস্ত উপাদান পাওয়া গেছে তাতে বহু বিপরীতমুখী বর্ণনা রয়েছে। গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোনো অঞ্চলের শাসককে বলা হতো 'মহাসামন্ত'। ধারণা করা হয় শশাংক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেনগুপ্তের একজন 'মহাসামন্ত' এবং তাঁর পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র।

শশাংক ৬০৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। তিনি গৌড়ে অধিকার স্থাপন করে প্রতিবেশী অঞ্চলে রাজ্য বিস্তার শুরু করেন। তিনি দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর), উড়িষ্যার উৎকল (উত্তর উড়িষ্যা) ও কঙ্গোদ (দক্ষিণ উড়িষ্যা) এবং বিহারের মগধ রাজ্য জয় করে তাঁর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করেন। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কামরূপের (আসাম) রাজাও শশাংকের হাতে পরাজিত হন। এরপর তিনি পশ্চিম সীমান্তের দিকে মনোযোগ দেন। উত্তর ভারতে এ সময় দুইজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। একটি পুষ্যভূতি রাজবংশের অধীনে থানেশ্বর এবং অন্যটি মৌখরি রাজবংশের অধীনে কান্যকুব্জ। পশ্চিম দিক থেকে কনৌজের মৌখরি শক্তি বাংলা অধিকারের জন্য বার বার চেষ্টা করছিল। তদুপরি সমসাময়িক সময়ে থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীর সঙ্গে কনৌজের মৌখরি রাজা গ্রহবর্মণের বিয়ে হলে কনৌজ-থানেশ্বর জোট গড়ে উঠে। এ জোটের ফলে বাংলার নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে শশাংকও কূটনৈতিক সূত্রে মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করেন।

থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু হলে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন সিংহাসনে বসেন। এ সময়ে কনৌজের সিংহাসনে ছিলেন প্রভাকরবর্ধনের জামাতা গ্রহবর্মণ। মালবরাজ দেবগুপ্ত মৌখরিরাজ গ্রহবর্মণকে পরাজিত করেন। তাঁর মহিষী রাজশ্রীকে বন্দী করা হয়। দেবগুপ্ত এরপর থানেশ্বরের দিকে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে দেবগুপ্ত রাজ্যবর্ধনের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। কিন্তু কনৌজের উপর নিজ প্রভুত্ব বিস্তার ও ভগ্নী রাজশ্রীকে উদ্ধার করার পূর্বেই তিনি শশাংকর হাতে মৃত্যুবরণ করেন।

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হলে হর্ষবর্ধন কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কাল বিলম্ব না করে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য শশাংকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এ সময় কামরূপের ভাস্করবর্মা তাঁর সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ হন। কিন্তু, এ সংঘর্ষের ফলাফল বা আদৌ কোনো সংঘর্ষ হয়েছিল কি-না সে বিষয়ে সঠিকভাবে জানা যায় না। ৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দের কিছু আগে শশাংক মৃত্যুবরণ করেন।

শশাংক শৈব ধর্মের উপাসক ছিলেন। হিউয়েন-সাং তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মবিদ্বেষী বলে আখ্যায়িত করেছেন। তবে এ ব্যাপারে তেমন কোনো জোরালো প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। সপ্তম শতকে বাংলার ইতিহাসে শশাংক একটি বিশিষ্ট নাম। প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে তিনিই প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সার্বভৌম শাসক।

কাজ ঃ যে সকল শক্তির সঙ্গে শশাংকের সংঘর্ষ হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

মাৎসান্যায় ও পাল বংশ (৭৫০ – ১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ)

শশাংকের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোন যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে, রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্করবর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূ-স্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে উঠে। কেন্দ্রীয় শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। এ অরাজকতার সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'মাৎসান্যায়' বলে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে 'মাৎসান্যায়'।

বাংলার সবল অধিপতিরা এমনি করে ছোট ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করছিল। এ অরাজকতার যুগ চলে একশ বছরব্যাপী। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি এ অরাজকতার অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে।

দীর্ঘদিনের অরাজকতায় বাংলার মানুষের মন বিষিয়ে গিয়েছিল। এ চরম দুঃখ-দুর্দশা হতে মুক্তি লাভের জন্য দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্থির করলেন যে তারা পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করবেন। দেশের জনসাধারণও এ মত সানন্দে গ্রহণ করে। এর ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তি রাজপদে নির্বাচিত হলেন। পরবর্তী শাসক ধর্মপালের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ খালিমপুরের তাম্রলিপি হতে গোপালের এ নির্বাচনের কাহিনি পাওয়া যায়। গোপালের সিংহাসন আরোহণ নিয়ে তিব্বতের ঐতিহাসিক লামা তারনাথ অবশ্য এক রূপকথার অবতারণা করেছেন। তাঁর কাহিনির সারকথা : দেশে দীর্ঘদিন যাবৎ অরাজকতার ফলে জনগণের দুঃখ-কষ্টের আর সীমা ছিল না। দেশের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিরা একমত হয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য একজন 'রাজা' নির্বাচিত করে। কিন্তু, 'নির্বাচিত রাজা' রাতে এক কুৎসিত নাগ রাক্ষসী কর্তৃক নিহত হয়। এরপর প্রতি রাতেই একজন করে 'নির্বাচিত রাজা' নিহত হতে থাকে। এভাবে বেশ কিছু বছর কেটে গেল। অবশেষে একদিন চুণ্ডাদেবীর এক ভক্ত এক বাড়িতে এসে দেখে সে বাড়ির সবারই মন খুব খারাপ। কারণ, ঐদিন 'নির্বাচিত' রাজা হওয়ার ভার পড়েছে ঐ বাড়িরই এক ছেলের উপর। আগন্তুক ঐ ছেলের পরিবর্তে নিজে রাজা হতে রাজি হন। পরবর্তী সকালে তিনি রাজা 'নির্বাচিত' হন। সে রাত্রে নাগ রাক্ষুসী এলে তিনি চুণ্ডাদেবীর মহিমাযুক্ত লাঠির আঘাতে রাক্ষুসীকে মেরে ফেলেন। পরের দিন তাকে জীবিত দেখে সকলেই আশ্চর্য হয়। পরপর সাতদিন তিনি এভাবে রাজা 'নির্বাচিত' হন। অবশেষে তাঁর অদ ভুত যোগ্যতার জন্য জনগণ তাঁকে স্থায়ীভাবে রাজা রূপে 'নির্বাচিত' করে।

গোপালের পূর্ব জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। পাল বংশের পরিচয় ও আদি বাসস্থান সম্পর্কেও স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। গোপালের পিতার নাম বপ্যট। তিনি ছিলেন 'শত্রু ধ্বংসকারী'। পিতামহ ছিলেন দয়িতবিষ্ণু। তাদের নামের আগে কোন রাজকীয় উপাধি দেখা যায়নি। এতে মনে করা হয়, তারা সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। দয়িতবিষ্ণু 'সর্ববিদ্যা বিশুদ্ধ' ছিলেন। এ থেকে মনে হয়, গোপালও পিতার মতো সুনিপুণ যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। গোপালের সিংহাসনে আরোহণের মধ্য দিয়ে বাংলায় পাল রাজত্বের শুরু হয়। পাল বংশের রাজাগণ একটানা চারশত বছর এদেশ শাসন করে। এত দীর্ঘ সময় আর কোন রাজবংশ এদেশ শাসন করেনি। গোপাল সিংহাসনে আরোহণ করে রাজ্য বিস্তারে মনোযোগ দেন। তিনি বাংলার উত্তর এবং পূর্ব অংশের প্রায় সমগ্র অঞ্চলই রাজ্যভুক্ত করেন। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা গোপালের শাসনের বাইরে থেকে যায়। অনেকের মতে গোপাল ২৭ বৎসর শাসন করেছিলেন। কিন্তু, আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন, তিনি ৭৫৬ থেকে ৭৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশ শাসন করেন।

একক কাজ ঃ 'মাৎসন্যায়' কী? সমাজে এর প্রকাশ কীরূপ ছিল?

গোপালের মৃত্যুর পর ধর্মপাল (৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সিংহাসনে বসেন। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। বাংলা ও বিহারব্যাপী তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে এ সময়ে তিনটি রাজবংশের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছিল। একটি বাংলার পাল, অন্যটি রাজপুতনার গুর্জরপ্রতিহার ও তৃতীয়টি দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট। ইতিহাসে এ যুদ্ধ 'ত্রি-শক্তির সংঘর্ষ' বলে পরিচিত। অষ্টম শতকের শেষ দিকে এ যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম যুদ্ধ হয় ধর্মপাল ও প্রতিহার বংশের রাজা বৎসরাজার মধ্যে। এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। তবুও ধর্মপাল এ সময় বাংলার বাইরে বেশকিছু অঞ্চল জয় করেছিলেন। তিনি বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করে গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ত্রি-শক্তির সংঘর্ষের প্রথম দিকে ধর্মপাল পরাজিত হলেও তাঁর বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ, বিজয়ের পর রাষ্ট্রকূটরাজ দাক্ষিণাত্যে ফিরে যান। এ সুযোগে ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করেন। কিন্তু, অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট কনৌজ দখল করেন। ফলে, ধর্মপালের সাথে তাঁর যুদ্ধ বাঁধে। এ যুদ্ধে ধর্মপাল পরাজিত হন। এ পরাজয়েও ধর্মপালের কোনো ক্ষতি হয়নি। কারণ, পূর্বের মতো রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে আসেন এবং দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। প্রতিহার রাজের পরাজয়ের পর ধর্মপালও তৃতীয় গোবিন্দের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর রাষ্ট্রকূটরাজ তাঁর দেশে ফিরে গেলে ধর্মপাল পুনরায় উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করেন। কেউ কেউ মনে করেন, ধর্মপাল নেপালও জয় করেছিলেন। ধর্মপাল প্রায় ৪০ বছর (৭৮১-৮২১ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন।

সোমপুর বিহার, পাহাড়পুর, নওগাঁ

পিতার মতো ধর্মপাল ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। পাল রাজাদের মধ্যে তিনিই সর্বোচ্চ সার্বভৌম পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছিলেন। ভাগলপুরের ২৪ মাইল পূর্বে তিনি একটি বৌদ্ধ বিহার বা মঠ নির্মাণ করেন। বিক্রমশীল তাঁর দ্বিতীয় নাম বা উপাধি অনুসারে এটি 'বিক্রমশীল বিহার' নামে খ্যাত ছিল। নালন্দার মতো বিক্রমশীল বিহারও ভারতবর্ষের সর্বত্র ও ভারতবর্ষের বাইরে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। নবম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এটি সমগ্র ভারতবর্ষের একটি বিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। তিব্বতের অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে অধ্যয়ন করতে আসত এবং এখানকার অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য তিব্বতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিল। নাটোর জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানেও ধর্মপালএক বিশাল বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এটি সোমপুর বিহার নামে পরিচিত। এই স্থাপত্য কর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে (ওয়ার্ল্ড হ্যারিটেজ) স্বীকৃত হয়েছে। এর ন্যায় প্রকাণ্ড বিহার ভারতবর্ষের আর কোথাও এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। ওদন্তপুরেও (বিহার) তিনি সম্ভবত একটি বিহার নির্মাণ করেন। তারনাথের মতে, ধর্মপাল বৌদ্ধধর্ম শিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

রাজা হিসেবে সকল ধর্মাবলম্বী প্রজার প্রতি সমান পৃষ্ঠপোষকতা পাল যুগের একটি বৈশিষ্ট্য। তাই নিজে বৌদ্ধ হলেও অন্যান্য ধর্মের প্রতি ধর্মপালের কোনো বিদ্বেষ ছিল না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাজার ব্যক্তিগত ধর্মের সঙ্গে রাজ্য শাসনের কোনো সম্পর্ক নেই। তাই, তিনি শাস্ত্রের নিয়ম মেনে চলতেন এবং প্রতি ধর্মের লোক যেন নিজ নিজ ধর্ম পালন করতে পারে তার প্রতি খেয়াল রাখতেন। নারায়ণের একটি হিন্দু মন্দিরের জন্য তিনি করমুক্ত ভূমি দান করেছিলেন। তিনি যাদেরকে ভূমি দান করেছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ। ধর্মপালের প্রধানমন্ত্রী গর্গ ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তাঁর বংশধরগণ অনেকদিন ধরে পাল রাজাদের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে ধর্মপাল ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসকদের অন্যতম। অর্ধশতক পূর্বে যে দেশ অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল, তাঁর নেতৃত্বে সেদেশ সহসা প্রচণ্ড শক্তিশালী হয়ে উত্তর ভারতে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিল।

একক কাজ ঃ ধর্মপাল শ্রেষ্ঠ শাসকদের মধ্যে অন্যতম। এর পক্ষে ৩টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।

পাল সাম্রাজ্য

ধর্মপালের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দেবপাল (৮২১-৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। তিনি পিতার যোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন। পিতার ন্যায় তিনিও বাংলার রাজ্যসীমা বিস্তারে সফল হন। দেবপাল উত্তর ভারতে প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট রাজাদের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। উত্তর ভারতের বিশাল অঞ্চল তাঁর অধিকারে এসেছিল। উড়িষ্যা ও কামরূপের উপরও তিনি আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। মোট কথা, তাঁর সময়েই পাল সাম্রাজ্য সবচেয়ে বেশি বিস্তার লাভ করেছিল।

দেবপাল বৌদ্ধ ধর্মের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মগধের বৌদ্ধ মঠগুলোর তিনিই সংস্কার সাধন করেন। তিনি নালন্দায় কয়েকটি মঠ এবং বুদ্ধগয়ায় এক বিরাট মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মুঙ্গেরে তিনি নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। জাভা, সুমাত্রা ও মালয়ের শৈলেন্দ্র বংশের মহারাজ

বালপুত্রদেবকে নালন্দায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দান করেছিলেন। শুধু তাই নয়, এ মঠের ব্যয় নির্বাহের জন্য দেবপাল পাঁচটি গ্রামও প্রদান করেছিলেন। এ ঘটনা হতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সাথে বাংলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়।

দেবপাল বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ তাঁর রাজসভা অলংকৃত করতেন। দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তখন সমগ্র এশিয়ায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ শাস্ত্রে পারদর্শী ইন্দ্রগুপ্ত নামক ব্রাহ্মণকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করেই তাঁর শাসন আমলে উত্তর-ভারতে প্রায় হারিয়ে যাওয়া বৌদ্ধধর্ম পুনরায় সজীব হয়ে উঠে।

দেবপালের মৃত্যুর পর থেকে পাল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর কয়েকজন দুর্বলচেতা ও অকর্মণ্য উত্তরাধিকারী সিংহাসনে বসেন। তাঁরা পাল সাম্রাজ্যের গৌরব ও শক্তি অব্যাহত রাখতে পারেননি। ফলে পাল সাম্রাজ্য ক্রমেই পতনমুখী হয়। দেবপালের পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল থেকে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকাল ৮৬১ হতে ৯৮৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রথম বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপাল দীর্ঘকাল (৮৬৬-৯২০ খিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। তিনি একজন দুর্বল উদ্যমহীন শাসক ছিলেন। ফলে তাঁর রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের সীমা ছোট হতে থাকে। নারায়ণ পালের পর একে একে পাল সিংহাসনে বসেন রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল। এঁরা আনুমানিক ৯২০ হতে ৯৯৫ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময় পাল রাজাদের শাসন ক্ষমতা কেবল গৌড় ও তার আশপাশেই সীমাবদ্ধ ছিল। এসব দুর্বল রাজার সময়ে উত্তর ভারতের চন্দেল্ল ও কলচুরি বংশের রাজাদের আক্রমণে পাল সাম্রাজ্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ফলে এ সময়ে পাল সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে উত্তর-পশ্চিম বাংলার অংশ বিশেষে কম্বোজ রাজবংশের উত্থান ঘটে।

এভাবে পাল সাম্রাজ্য যখন ধ্বংসের মুখে, তখন আশার আলো নিয়ে এগিয়ে এলেন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সুযোগ্য পুত্র প্রথম মহীপাল (আনু. ৯৯৫-১০৪৩ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো কম্বোজ জাতির বিতাড়ন এবং পূর্ববঙ্গ অধিকার করে পাল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। এরপর তিনি রাজ্য বিজয়ে মনোযোগ দেন। তাঁর সাম্রাজ্য পূর্ব বঙ্গ হতে বারানসী এবং মিথিলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। সে সময়ে ভারতের দুই প্রবল রাজশক্তি তামিলরাজ রাজেন্দ্র চোল এবং চেদীরাজ গাঙ্গেয়দেবের আক্রমণ হতে তিনি রাজ্যের অধিকাংশ স্থানে স্বীয় আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

মহীপাল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের উদার পৃষ্ঠপোষক। পুরাতন কীর্তি রক্ষায় তিনি যত্নবান ছিলেন। তিনি নালন্দায় এক বিশাল বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন। বারানসীতেও তাঁর আমলে কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করা হয়।

মহীপাল জনকল্যাণকর কাজের প্রতিও মনোযোগী ছিলেন। বাংলার অনেক দীঘি ও নগরী এখনও তাঁর নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তিনি অসংখ্য শহর প্রতিষ্ঠা ও দীঘি খনন করেন। শহরগুলো হলো রংপুর জেলার মাহীগঞ্জ, বগুড়া জেলার মহীপুর, দিনাজপুর জেলার মাহীসন্তোষ ও মুর্শিদাবাদ জেলার মহীপাল নগরী। আর দীঘিগুলোর মধ্যে দিনাজপুরের মহীপাল দীঘি ও মুর্শিদাবাদের মহীপালের সাগর দীঘি বিখ্যাত। সম্ভবত জনহিতকর কাজের মাধ্যমেই মহীপাল এ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

মহীপালের পঞ্চাশ বছরের রাজত্বকালে পাল বংশের সৌভাগ্য রবি আবার উদিত হয়েছিল। এ জন্যই ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পাল সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনতির যুগে প্রথম মহীপালের আবির্ভাব না ঘটলে এ সাম্রাজ্যের রাজত্বকালের সময়কাল নিঃসন্দেহে আরও সঙ্কুচিত হতো।

দলীয় কাজ ঃ প্রথম মহীপালের প্রতিষ্ঠিত শহর ও দীঘিগুলোর নাম ও অবস্থান উল্লেখ করে একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

মহীপাল কোন যোগ্য উত্তরসূরি রেখে যেতে পারেননি। তাই তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্য ভেঙে যেতে শুরু করে। প্রথম মহীপালের পর তাঁর পুত্র ন্যায়পাল (আনু ১০৪৩-১০৫৮ খ্রিষ্টাব্দ) ও পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল (আনু ১০৫৮-১০৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) পাল সিংহাসনে বসেন। এ দুর্বল রাজাদের সময় কলচুরি রাজা, কর্ণাটের চালুক্যরাজ, উড়িষ্যা ও কামরুপের রাজা বাংলা আক্রমণ করেন। সুদীর্ঘকাল একের পর এক বিদেশি আক্রমণ মোকাবেলা করতে গিয়ে পাল সাম্রাজ্য যখন বিপর্যস্ত, তখন দেশের অভ্যন্তরেও বিরোধ ও অনৈক্য দেখা দেয়। এই সুযোগে বাংলার বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। বাংলার বাইরে বিহার পাল রাজাদের হাতছাড়া হতে থাকে। এভাবে তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে বাংলার পাল সাম্রাজ্য বহু স্বাধীন খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত হয়ে যায়।

এরপর পাল সিংহাসনে বসেন তৃতীয় বিগ্রহপালের পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল। তাঁর সময় পাল রাজত্বের দুর্যোগ আরও ঘনীভূত হয়। এ সময় উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র অঞ্চলের সামন্তবর্গ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ইতিহাসে এ বিদ্রোহ 'কৈবর্ত বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। এ বিদ্রোহের নেতা ছিলেন কৈবর্ত নায়ক দিব্যোক বা দিব্য। তিনি দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে বরেন্দ্র দখল করে নেন এবং নিজ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

বরেন্দ্র অঞ্চল যখন কৈবর্ত্যদের দখলে তখন পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন দ্বিতীয় মহীপালের ছোট ভাই দ্বিতীয় শূরপাল (আনু. ১০৮০-১০৮২ খ্রিষ্টাব্দ)। অতঃপর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল (১০৮২-১১২৪ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে বসেন। তিনিই ছিলেন পাল বংশের সর্বশেষ সফল শাসক। প্রাচীন বাংলার কবি সন্ধাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' হতে রামপালের জীবন কথা জানা যায়। রামপাল রাজ্যভার গ্রহণ করেই বরেন্দ্র উদ্ধার করতে সচেষ্ট হন। এ বিষয়ে রামপালকে সৈন্য, অস্ত্র আর অর্থ দিয়ে সাহায্যে এগিয়ে আসেন রাষ্ট্রকূট, মগধ, রাঢ় দেশসহ চৌদ্দটি অঞ্চলের রাজা। যুদ্ধে কৈবর্তরাজ ভীম পরাজিত ও নিহত হন। এরপর তিনি বর্তমান মালদহের কাছাকাছি 'রামাবতি' নামে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন। পরবর্তী পাল রাজাদের শাসনামলে রামাবতিই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। পিতৃভূমি বরেন্দ্রে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর সাম্রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি মগধ, উড়িষ্যা ও কামরূপের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

পাল বংশের দুর্ভাগ্য রামপালের পরবর্তী শাসকগণ ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল। ফলে, তাঁদের পক্ষে পালবংশের হাল শক্ত হাতে ধরা সম্ভব ছিল না। রামপালের পর কুমারপাল (আনু. ১১২৪-১১২৯খ্রিষ্টাব্দ), তৃতীয় গোপাল (১১২৯-১১৪৩ খ্রিষ্টাব্দ) ও মদনপাল (আনু. ১১৪৩-১১৬১ খ্রিষ্টাব্দ) একে একে পাল সিংহাসনে বসেন। এ সময় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকত। অবশেষে দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বিজয় সেন পাল সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে বাংলায় সেন বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

দলীয় কাজ ঃ পাল সাম্রাজ্যের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে রামপাল কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা চিহ্নিত কর।

দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার স্বাধীন রাজ্য

পাল যুগের অধিকাংশ সময়েই দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা স্বাধীন ছিল। তখন এ অঞ্চলটি ছিল বঙ্গ জনপদের অন্তর্ভুক্ত। অষ্টম শতকের মাঝামাঝি থেকে বেশ কিছু রাজবংশের রাজারা কখনো পাল রাজাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীনভাবে তাদের এলাকা শাসন করত, আবার কখনো পাল রাজাদের অধীনতা স্বীকার করে চলত।

খড়গ বংশ ঃ সপ্তম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মগধ ও গৌড়ে পরবর্তী গুপ্তবংশীয় রাজাগণ প্রভুত্ব স্থাপন করেন। এ সময় খড়গ বংশের রাজারা দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের রাজধানীর নাম ছিল কর্মান্ত বাসক। কুমিল্লা জেলার বড় কামতার প্রাচীন নামই সম্ভবত এ কর্মান্ত বাসক। খড়গদের অধিকার ত্রিপুরা ও নোয়াখালী অঞ্চলের উপর বিস্তৃত ছিল।

দেববংশ ঃ খড়গ বংশের শাসনের পর একই অঞ্চলে অষ্টম শতকের শুরুতে দেব বংশের উত্থান ঘটে। এ বংশের চারজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এঁরা হলেন শ্রীশান্তিদেব, শ্রীবীরদেব, শ্রীআনন্দদেব ও শ্রীভবদেব। দেব রাজারা নিজেদের খুব শক্তিধর মনে করতেন। তাই তাঁরা তাদের নামের সাথে যুক্ত করতেন বড় বড় উপাধি। যেমন– পরম সৌগত, পরম ভট্টারক, পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ ইত্যাদি। তাঁদের রাজধানী ছিল দেবপর্বতে। কুমিল্লার নিকট ময়নামতির কাছে ছিল এ দেবপর্বত। দেবদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল সমগ্র সমতট অঞ্চলে। আনুমানিক ৭৪০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৮০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত দেব রাজারা শাসন করেন।

কান্তিদেবের রাজ্য ঃ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার হরিকেল জনপদে নবম শতকে একটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব ঘটে। এ রাজ্যের রাজা ছিলেন কান্তিদেব। দেব রাজবংশের সঙ্গে কান্তিদেবের কোনো সম্পর্ক ছিল কি-না তা জানা যায় না। তাঁর পিতা ছিলেন ধনদত্ত ও পিতামহ ভদ্রদত্ত। বর্তমান সিলেট কান্তিদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁর রাজধানীর নাম ছিল বর্ধমানপুর। বর্তমানে এ নামে কোনো অঞ্চলের অস্তিত্ব নেই। এ সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় চন্দ্র বংশ বলে পরিচিত নতুন এক শক্তির উদয় হয়। কান্তিদেবের গড়া রাজ্যের পতন হয় এ চন্দ্র বংশের হাতে।

চন্দ্রবংশ ঃ দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী স্বাধীন রাজবংশ ছিল চন্দ্র বংশ। দশম শতকের শুরু হতে একাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দেড়শত বছর এ বংশের রাজারা শাসন করেন। চন্দ্রবংশের প্রথম নৃপতি পূর্ণচন্দ্র ও তার পুত্র সুবর্ণচন্দ্র রোহিতগিরির ভূ-স্বামী ছিলেন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্রই এ বংশের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর উপাধি ছিল 'মহারাজাধিরাজ'। ত্রৈলোক্যচন্দ্র হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল ও পার্শ্ববর্তী এলাকা), বঙ্গ ও সমতট-অর্থাৎ সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় নিজ বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। লালমাই পাহাড় ছিল চন্দ্র রাজাদের মূল কেন্দ্র। এ পাহাড় প্রাচীনকালে রোহিতগিরি নামে পরিচিত ছিল। আনুমানিক ত্রিশ বছরকাল (৯০০-৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ) তিনি রাজত্ব করেন।

ত্রৈলোক্যচন্দ্রের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁর পুত্র শ্রীচন্দ্র। তাঁর শাসনামলে চন্দ্র বংশের প্রতিপত্তি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছায়। নিঃসন্দেহে তিনি বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তিনি 'পরমেশ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করেছিলেন। তাঁর রাজ্য দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ছাড়াও উত্তর-পূর্ব কামরূপ ও উত্তরে গৌড় পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে তিনি তাঁর রাজধানী গড়ে তোলেন। শ্রীচন্দ্র প্রায় ৪৫ বছর (আনু. ৯৩০-৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ) শৌর্যবীর্যের সঙ্গে রাজত্ব করেন।

শ্রীচন্দ্রের পুত্র কল্যাণচন্দ্র (আনু. ৯৭৫-১০০০ খ্রিষ্টাব্দ) ও পৌত্র লডহচন্দ্র (আনু. ১০০০-১০২০ খ্রিষ্টাব্দ) চন্দ্র বংশের গৌরব অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। লডহচন্দ্রের পুত্র গোবিন্দচন্দ্র ছিলেন শেষ চন্দ্র রাজা। তাঁর রাজত্বকালে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোল ও কলচুরিরাজ কর্ণ বঙ্গ আক্রমণ করেন। এই দুই বৈদেশিক আক্রমণ চন্দ্র রাজার ক্ষমতা হ্রাস করে তাদের শাসনের পতন ঘটায়।

বর্ম রাজবংশ ঃ একাদশ শতকের শেষভাগে পাল রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় বর্ম উপাধিধারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। বঙ্গদেশে যিনি এ বংশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি হলেন বজ্রবর্মার পুত্র জাতবর্মা। কলচুরিরাজ কর্ণের সাথে বর্মরা এদেশে এসেছিল বলে ধারণা করা হয়। পিতার মতো প্রথম দিকে তিনিও ছিলেন কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব এবং কর্ণের সামন্তরাজ। কৈবর্ত্য বিদ্রোহের সময় তিনি শ্বশুর কলচুরিরাজ কর্ণের সাহায্য ও সমর্থনে দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বর্মদের রাজধানী ছিল বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর। জাতবর্মার পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হরিবর্মা একটানা ৪৬ বছর রাজত্ব করেন। পাল রাজাদের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন।

একক কাজ ঃ নিম্নের ছকের এলোমেলো তথ্যগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজাও।

সেন বংশ (১০৬১-১২০৪ খ্রিষ্টাব্দ)

পাল বংশের পতনের পর দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলাদেশে সেন রাজবংশের সূচনা হয়। ধারণা করা হয় তাঁরা এদেশে বহিরাগত। তাদের আদি নিবাস ছিল দক্ষিণাত্যের কর্ণাট। কেউ কেউ মনে করেন তারা ছিলেন 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়'। যে বংশের লোকেরা প্রথমে ব্রাহ্মণ থাকে এবং পরে পেশা পরিবর্তন করে ক্ষত্রিয় হয়, তাদেরকে বলা হয় 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়'। বাংলার সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সামন্ত সেন। তিনি যৌবনে কর্ণাটে বীরত্ব প্রদর্শন করে শেষ বয়সে বসতি স্থাপন করেন রাঢ় অঞ্চলে গঙ্গা নদীর তীরে। তিনি কোনো রাজ্য প্রতিষ্ঠা না করায় সেন বংশের প্রথম রাজার মর্যাদা দেওয়া হয় সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেনকে। ধারণা করা হয় পাল রাজা রামপালের অধীনে তিনি একজন সামন্ত রাজা ছিলেন।

হেমন্ত সেনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিজয় সেন (১০৯৮-১১৬০ খ্রিষ্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালেই সেন বংশের শাসন শক্তিশালী ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তিনিই সম্ভবত সামন্তরাজা হতে নিজেকে স্বাধীন রূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কৈবর্ত্য বিদ্রোহের সময় তিনি রামপালকে সাহায্য করেন। একাদশ শতকে দক্ষিণ রাঢ় শূর বংশের অধিকারে ছিল। এ বংশের রাজকন্যা বিলাসদেবীকে তিনি বিয়ে করেন। বরেন্দ্র উদ্ধারে রামপালকে সাহায্য করার বিনিময়ে বিজয় সেন স্বাধীনতার স্বীকৃতি পান। আবার দক্ষিণ রাঢ়ের শূর বংশের সঙ্গে বৈবাহিক আত্মীয়তার সূত্র ধরে রাঢ় বিজয় সেনের অধিকারে আসে। এরপর বিজয় সেন বর্মরাজাকে পরাজিত করে পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলা সেন অধিকারে নিয়ে আসেন। শেষ পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিজয় সেন মদনপালকে পরাজিত করে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা হতে পালদের বিতাড়িত করে নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। এরপর তিনি কামরূপ, কলিঙ্গ ও মিথিলা আক্রমণ করেন। হুগলী জেলার ত্রিবেণীতে অবস্থিত বিজয়পুর ছিল বিজয় সেনের প্রথম রাজধানী। দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করা হয় বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে। বিজয় সেন পরম মাহেশ্বর, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ, অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। সেন বংশের অধীনেই সর্বপ্রথম সমগ্র বাংলা দীর্ঘকালব্যাপী একক রাজার অধীনে ছিল। ধর্মের দিক হতে বিজয় সেন ছিলেন শৈব। কবি উমাপতিধর বিজয় সেন কর্তৃক অনুষ্ঠিত যাগ-যজ্ঞের কথা বলেছেন।

বিজয় সেনের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র বল্লাল সেন (১১৬০-১১৭৮ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর রাজত্বকালে তিনি শুধু পিতৃরাজ্য রক্ষাই করেননি, মগধ ও মিথিলাও সেন রাজ্যভুক্ত করে সেন শাসন শক্তিশালী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। চালুক্য রাজকন্যা রমাদেবীকে তিনি বিয়ে করেন। অন্যান্য উপাধির সাথে বল্লাল সেন নিজের নামের সাথে 'অরিরাজ নিঃশঙ্ক

শঙ্কর' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষণ সেনের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে বাণপ্রস্থ অবলম্বন করে শেষ জীবন অতিবাহিত করেন।

বল্লাল সেন অত্যন্ত সুপণ্ডিত ছিলেন। বিদ্যা ও বিদ্বানের প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি বেদ, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। তাঁর একটি বিরাট গ্রন্থালয় ছিল। কবি বা লেখক হিসেবে সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর দান অপরিসীম। তাঁর পূর্বে বাংলার কোনো প্রাচীন রাজা এরূপ লেখনি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেননি। তিনি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। অবশ্য 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থের অসমাপ্ত অংশ তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন সম্পূর্ণ করেছিলেন। গ্রন্থদ্বয় তাঁর আমলের ইতিহাসের অতীব মূল্যবান উপকরণ। তিনি রামপালে নতুন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। বল্লাল সেন তন্ত্র হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ফলে তাঁর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং বৌদ্ধ ধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। তিনি হিন্দু সমাজকে নতুন গঠন করার উদ্দেশ্যে 'কৌলিন্য প্রথা' প্রবর্তন করেছিলেন। এর ফলে সামাজিক আচার-ব্যবহার, বিবাহ অনুষ্ঠান প্রভৃতি বিষয়ে কুলীন শ্রেণির লোকদিগকে কতগুলো বিশেষ রীতিনীতি মেনে চলতে হতো।

একক কাজ ঃ হিন্দুধর্ম প্রচার ও প্রসারে রাজা বল্লাল সেন কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তা উল্লেখ কর।

বল্লাল সেনের পর তাঁর পুত্র লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০৫ খ্রিষ্টাব্দ) প্রায় ৬০ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতা ও পিতামহের ন্যায় লক্ষণ সেনও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। তিনি প্রাগ-জ্যোতিষ, গৌড়, কলিঙ্গ, কাশী, মগধ প্রভৃতি অঞ্চল সেন সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। কিন্তু, তাঁর শেষ জীবন খুব সুখের ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধবিগ্রহ পরিচালনা ও বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে তিনি শেষ পর্যন্ত শাসনের প্রতি অমনোযোগী হয়ে পড়েন এবং পিতার ন্যায় গঙ্গাতীরে দ্বিতীয় রাজধানী নবদ্বীপে বসবাস শুরু করেন। ফলে গৌড় ভয়াবহ ষড়যন্ত্র ও অন্তঃবিরোধের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়। এ সুযোগে ১১৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান সুন্দরবন অঞ্চলে ডোম্মন পাল বিদ্রোহী হয়ে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

লক্ষণ সেন নিজে সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থ 'অদ্ভুতসাগর' তিনিই সমাপ্ত করেছিলেন। লক্ষণ সেন রচিত কয়েকটি শ্লোকও পাওয়া গেছে। তাঁর রাজসভায় বহু পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল।

লক্ষণ সেন পিতা ও পিতামহের শৈব ধর্মের প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে ধারণা করা হয়। পিতা ও পিতামহের 'পরম মহেশ্বর' উপাধির পরিবর্তে তিনি 'পরম বৈষ্ণব' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি শাস্ত্র ও ধর্ম চর্চায় পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। ঐতিহাসিক মিনহাজ তাঁর দানশীলতা ও ঔদার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম সেনাপতি বখ্‌তিয়ার খল্‌জি নদীয়া আক্রমণ করেন। বৃদ্ধ লক্ষণ সেন কোন প্রতিরোধ না করে নদীপথে পূর্ববঙ্গের রাজধানী বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলা বখতিয়ার খলজি সহজেই অধিকার করে নেন। লক্ষণাবতীকে (গৌড়) কেন্দ্র করে বাংলায় মুসলিম সামাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় অবস্থান করে লক্ষণ সেন আরও ২/৩ বৎসর রাজত্ব করেন। খুব সম্ভব ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে (মতান্তরে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে) তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। লক্ষণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেন কিছুকাল (১২০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত) পূর্ব বাংলা শাসন করেন। এভাবে লক্ষণ সেনের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় সেন শাসনের অবসান ঘটে।

দলীয় কাজ ঃ প্রাচীন বাংলার শাসকগণ কেন বিভিন্ন উপাধি ধারন করতেন? উপাধিগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

প্রাচীন বাংলার শাসন-ব্যবস্থা

গুপ্ত শাসনের পূর্বে প্রাচীন বাংলার রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। এদেশে গুপ্ত শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে কৌম সমাজ ছিল সর্বেসর্বা। তখন রাজা ছিল না, রাজত্ব ছিল না। তবু শাসন-পদ্ধতি সামান্য মাত্রায় ছিল। তখন মানুষ একসাথে বসবাস করত। কৌমদের মধ্যে পঞ্চায়েতী প্রথায় পঞ্চায়েত দ্বারা নির্বাচিত দলনেতা স্থানীয় কৌম শাসনব্যবস্থায় নেতৃত্ব দিতেন। বাংলার এ কৌম ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বেই বাংলায় কৌমতন্ত্র ভেঙ্গে গিয়ে রাজতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল।

গুপ্তদের সময় বাংলার শাসন-পদ্ধতির পরিষ্কার বিবরণ পাওয়া যায়। আনুমানিক দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বাংলায় মৌর্য শাসনের কেন্দ্র ছিল পুণ্ড্রনগর–বর্তমান বগুড়ার পাঁচ মাইল দূরে মহাস্থানগড়ে। অনুমান করা হয় 'মহামাত্র' নামক একজন রাজ প্রতিনিধির মাধ্যমে তখন বাংলায় মৌর্য শাসনকার্য পরিচালিত হতো। বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হলেও সমগ্র বাংলা গুপ্ত সম্রাটদের সরাসরি শাসনে ছিল না। বাংলার যে অংশ গুপ্ত সম্রাটদের সরাসরি শাসনে ছিল না তা 'মহারাজা' উপাধিধারী মহাসামন্তগণ প্রায় স্বাধীন ও আলাদাভাবে শাসন করতেন। এ সকল সামন্ত রাজা সব সময় গুপ্ত সম্রাটের কর্তৃত্বকে মেনে চলতেন। ধীরে ধীরে বাংলার সর্বত্র গুপ্ত সম্রাটদের শাসন চালু হয়। এ মহাসামন্তদের অধীনে বহু কর্মচারী নিযুক্ত থাকতেন।

বাংলাদেশের যে অংশ সরাসরি গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে ছিল তা কয়েকটি প্রশাসনিক বিভাগে বিভক্ত ছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় বিভাগের নাম ছিল 'ভুক্তি'। প্রত্যেক 'ভুক্তি' আবার কয়েকটি বিষয়ে, প্রত্যেক বিষয় কয়েকটি মণ্ডলে, প্রত্যেক মণ্ডল কয়েকটি বীথিতে এবং প্রত্যেকটি বীথি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামই ছিল সবচেয়ে ছোট শাসন বিভাগ।

গুপ্ত সম্রাট নিজে ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। কোনো কোনো সময় রাজকুমার বা রাজপরিবার থেকেও ভুক্তির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হতো। ভুক্তিপতিকে বলা হত 'উপরিক'। পরবর্তী সময়ে শাসকগণ 'উপরিক মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করতেন। সাধারণত 'উপরিক মহারাজ'-ই তাঁর বিষয়গুলোর শাসনকর্তা নিযুক্ত করতেন। কিন্তু, কোনো কোনো সময়ে সম্রাট নিজে তাদের নিয়োগ করতেন। গুপ্তযুগের ভুক্তি ও বিষয়গুলোকে বর্তমান সময়ের ন্যায় বিভাগ ও জেলার সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ শতকে উত্তর-পশ্চিম বাংলায় গুপ্তবংশের শাসন শেষ হয়ে যায়। বঙ্গ স্বাধীন ও আলাদা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তখন বঙ্গে যে নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা মূলত গুপ্ত আমলের প্রাদেশিক শাসনের মতোই ছিল। গুপ্তদের সময়ে রাজতন্ত্র ছিল সামন্ত নির্ভর। এ আমলে তার পরিবর্তন হয়নি। বরং সামন্ততন্ত্রই আরও প্রসার লাভ করেছে। গুপ্তরাজাদের মতো বাংলার সামন্ত রাজাগণও 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করতেন। এরাও বিভিন্ন শ্রেণির বহুসংখ্যক রাজকর্মচারী নিয়োগ করতেন।

পাল বংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে নতুন যুগের শুরু হয়। পাল বংশের চার শতাব্দীর রাজত্বকালে বঙ্গে তাদের শাসন-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পূর্বের মতো পাল যুগেও শাসন-ব্যবস্থার মূল কথা হলো রাজতন্ত্র। কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ছিলেন রাজা স্বয়ং। পরাক্রান্ত পাল রাজারা প্রাচীন বাংলার 'মহারাজ' বা পরবর্তীকালের 'মহারাজাধিরাজ' পদবিতে সন্তুষ্ট থাকেননি। গুপ্ত সম্রাটগণের মতো তাঁরাও 'পরমেশ্বর', 'পরমভট্টারক', 'মহারাজাধিরাজ' প্রভৃতি গৌরবময় উপাধি গ্রহণ করেছিলেন। রাজার পুত্র রাজা হতেন। এ নিয়ম থাকা সত্ত্বেও ভ্রাতা ও রাজ পরিবারের অন্যান্য নিকট আত্মীয়দের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিরোধ ও সংঘর্ষ হতো। এ সময় হতে সর্বপ্রথম একজন প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান সচিবের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সর্বপ্রধান রাজ কর্মচারী।

রাজ্যের সকল প্রকার শাসনকার্যের জন্য কতগুলো নির্দিষ্ট শাসন-বিভাগ ছিল। এর প্রতিটি বিভাগের জন্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত থাকতেন। রাজা মন্ত্রী ও অমাত্যগণের সাহায্যে কেন্দ্রীয় শাসন পরিচালনা করতেন। পিতা জীবিত থাকলেও অনেক সময় যুবরাজ শাসনকার্য পরিচালনা করতেন।

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের বিভিন্ন উৎস ছিল। এর মধ্যে নানা প্রকার কর ছিল প্রধান। উৎপন্ন শস্যের উপর বিভিন্ন ধরনের কর ধার্য হতো। যেমন-ভাগ, ভোগ, হিরণ্য, উপরি কর ইত্যাদি। কতগুলো উৎপন্ন দ্রব্যের এক ষষ্ঠমাংশ রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। দস্যু ও তস্করের ভয় থেকে রক্ষার জন্য দেয় কর, ব্যবসা-বাণিজ্য শুল্ক, খেয়াঘাট হতে আদায়কৃত মাশুল ইত্যাদি ছিল সরকারের আয়ের কয়েকটি উৎস। বনজঙ্গল ছিল রাষ্ট্রের সম্পদ। সুতরাং এটিও রাষ্ট্রীয় আয়ের একটি অন্যতম উৎস ছিল।

বিভিন্ন রকমের রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। রাজস্ব আয়-ব্যয়ের হিসাব ও দলিল বিভাগ দেখাশুনা করার ব্যবস্থা ছিল। ভূমি রাজস্বের পরিমাণ ঠিক করার জন্য জমি জরিপের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হতো। মুদ্রা এবং শস্যের আকারে রাজস্ব আদায় হতো। পাল রাজাদের সময়ে শান্তি রক্ষার জন্য সুন্দর বিচার ও পুলিশ বিভাগ ছিল। এ সময়ে গোপন সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর বাহিনী ছিল। পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী ও রণতরী– এ চারটি বিভাগে সামরিক বাহিনী বিভক্ত ছিল।

গুপ্তদের মতো পালদের সময়েও সামন্ত রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের নানা উপাধি ছিল। কেন্দ্রীয় শাসনের শৌর্য ও বীর্য সামন্তদের অধীনতায় থাকতে বাধ্য করত। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগে এরা স্বাধীনতা ঘোষণা করত। পাল শাসকদের শক্তি অনেকাংশে এরূপ সামন্তরাজদের সাহায্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভর করত।

পাল রাজ্যে যে শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশ ও সেন রাজত্বকালে রাষ্ট্র শাসনের আদর্শ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। অবশ্য কোনো কোনো বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল। সেন বংশীয় রাজারা পাল রাজাদের রাজ-উপাধি ছাড়াও নানাবিধ উপাধি ধারণ করত। এ সময়ে রানিকে রাজকীয় মর্যাদা দেয়া হয়েছে। শাসনকার্যে যুবরাজদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ হত।

পূর্বের মতো সেনদের সময়েও অনেক সামন্ত শাসক ছিল। তাঁদের শক্তি ও প্রভাব খুব প্রবল ছিল। এ সকল সামন্তরা প্রকৃতপক্ষে নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীন রাজার মতোই চলত।

মোটামুটিভাবে এই ছিল প্রাচীন বাংলার শাসন–পদ্ধতি। এ শাসন ব্যবস্থায় বিদেশিদের প্রভাব কি পরিমাণ ছিল তা বলা যায় না। পণ্ডিতদের মতে, শাসন পদ্ধতির ব্যাপারে বাংলাদেশ সে সময়ে ভারতের অন্যান্য অংশের তুলনায় মোটেই পিছিয়ে ছিল না।

দলীয় কাজ ঃ প্রাচীন বাংলায় সরকারের আয়ের উৎসসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. কোন সময়ে ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ৩২০ খ্রিষ্টাব্দ খ. ৩২১ খ্রিষ্টাব্দ

গ. ৩২২ খ্রিষ্টাব্দ ঘ. ৩২৩ খ্রিষ্টাব্দ

২. শশাঙ্ক মালবরাজ দেবগুপ্তের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন-

i. পুষ্যভূতিদের দমন করতে

ii. মৌখরিদের দমন করতে

iii. রাজ্যশ্রীকে বন্দী করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

রায়গঞ্জ ইউনিয়নে সুদীর্ঘকাল শান্তিপূর্ণভাবে শাসন কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। কিন্তু, অদক্ষ ও দুর্বল চেয়ারম্যান সুমনের শাসনামলে বিভিন্ন কারণে স্থানীয় জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। একপর্যায়ে দুর্জয়ের নেতৃত্বে জনগণ বিদ্রোহ করে সুমনকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়।

৩. রায়গঞ্জের বিদ্রোহী নেতা দুর্জয়ের মধ্যে ইতিহাসের কোনো বিদ্রোহী নেতার আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে?

ক. ভীম খ. দিব্য

গ. দ্বিতীয় মহীপাল ঘ. বিগ্রহ পাল

৪. চেয়ারম্যান সুমনের মতো উক্ত নেতার ক্ষমতাচ্যুতির কারণ-

i. বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতা

ii. শাসক হিসেবে অদক্ষতা

iii. জনগণের সমস্যা সমাধানে অপারগতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১ অজয় তার পরিবারের পুরাতন নিবাস ত্যাগ করে নবীনগরে নতুনভাবে বসবাস শুরু করেন। কালক্রমে তিনি নবীনগরের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হন। এলাকার উন্নয়নের জন্য তিনি বহুবিধ কার্যসম্পাদন করেন। এছাড়া তার পরবর্তী বংশধরেরাও শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখেন। তাঁর এলাকায় বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মের লোকজন বৈষম্যের শিকার হতেন।

ক. খড়গ বংশের রাজধানী কোথায় ছিল?

খ. সেনদের 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' বলা হয় কেন?

গ. নবীনগরের শাসক অজয়ের কর্মকাণ্ডে কোন সেন শাসকের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত শাসকের বংশধরেরা শিক্ষা ও সাহিত্য বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২. রামনগর পৌরসভার চেয়ারম্যান সৌমেন বড়ুয়া তার এলাকায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেশ-বিদেশের শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। তার এলাকার বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্ম পালনের সুবিধার বিষয়ে তিনি মনোযোগী হন। তিনি তার পৌর সভায় শান্তিশৃঙ্খলা স্থাপনেও সমর্থ হন। ফলে তিনি দীর্ঘদিন পৌরশাসন করার সুযোগ লাভ করেন।

ক. পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে?

খ. 'মাৎস্যন্যায়' বলতে কী বুঝায়?

গ. আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রামনগর পৌরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে ধর্মপালের কোন কর্মকাণ্ডের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'সৌমেন বড়ুয়ার দীর্ঘদিন পৌরশাসন করার পিছনে কাজ করেছে ধর্মপালের আদর্শ ও অনুপ্রেরণা'- উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করাই তার স্বভাব। এভাবে বাস করতে হলে চাই একে অন্যের সাথে সহযোগিতা। এ কারণেই মানুষের প্রয়োজন পড়ে বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। জীবন বাঁচাতে প্রধান তিনটি জিনিসের প্রথম প্রয়োজন– খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থান। এরপরই মানুষ জীবনকে সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে মনোযোগ দেয় শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, আইন প্রভৃতির উন্নয়নে। সমাজ জীবন বিকাশে মানুষের এ সমস্ত কাজকর্মের একত্রিত রূপই হচ্ছে তার সংস্কৃতি। আর্যদের আগমনের পূর্বে বাংলার প্রাচিন মানুষ একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তুলেছিল। বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির এটাই সবচেয়ে প্রাচীন রূপ। পণ্ডিতদের মতে, এদের ভাষার নাম ছিল 'অষ্ট্রিক'। জাতি হিসেবে এদের বলা হতো নিষাদ। এরপর বাংলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাথে মিশে যায় 'আলপাইন' নামে এক জাতি। আর্যরা এদেশে আসার পূর্বে এরা মিলেমিশে বাংলার সংস্কৃতি গড়ে তোলে। বাঙালির জন প্রকৃতিতে বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ধারা এসে মিলিত হয়েছে। এটি তাদেরকে 'সংকর-জন' হিসেবে পরিচিত করেছে। বহু বছর বিচিত্র আদান-প্রদান ও মিশ্রণের ফলে বাঙালির একটি নিজস্ব দৈহিক বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়েছে। ফলে অধিকাংশ বাঙালির মাথা গোল আকৃতির, চুল কালো, চোখের মণি পাতলা হতে ঘন কালো, নাকের আকৃতি মোটামুটি মধ্যম, গায়ের রং সাধারণত শ্যামলা, মুখমণ্ডলের গঠন মধ্যম আকৃতির অর্থাৎ গোল বা লম্বা নয়। এ মধ্যম আকৃতির দেহ লক্ষণই বাঙালির বৈশিষ্ট্য।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার শিল্পকলা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার বর্ণনা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও রীতি-নীতিতে জনগণের প্রদর্শিত মূল্যবোধ ও বিশ্বাস ব্যাখ্যা করতে পারব;
- প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চর্চায় তৎকালীন গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশসমূহের অবদান সম্পর্কে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতে সক্ষম হব;
- ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হব।

প্রাচীন বাংলার সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি

প্রাচীন বাংলার সামাজিক জীবন

মৌর্য শাসনের পূর্বে বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে তেমন কোনো রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে ওঠেনি। এ সময়ে সমাজ বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। একে বলা হতো কৌম সমাজ। আর্যপূর্ব কিছু কিছু ধর্মচিন্তা বা দর্শন পরবর্তীতে এদেশের হিন্দু ধর্মে ছড়িয়ে পড়ে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–কর্মফল, জন্মান্তরবাদ, যোগ সাধনা ইত্যাদি। এ যুগের অনেক সামাজিক প্রথা ও আচার-আচরণের প্রভাব পরবর্তী সময়ে হিন্দু সমাজে লক্ষ করা যায়। যেমন- অতিথিদের পান-সুপারি খেতে দেওয়া, শিবের গীত গাওয়া, বিয়েতে গায়ে হলুদ দেয়া, ধুতি-শাড়ি পরা এবং মেয়েদের কপালে সিঁদুর দেয়া ইত্যাদি।

আর্য সমাজে জাতিভেদ প্রথা অত্যন্ত ব্যাপক ছিল। তারা দীর্ঘদিন এদেশে বসবাস করার ফলে বাংলায়ও এ ব্যবস্থা চালু হয়। তখন হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র এ চারটি বর্ণের বিভাজন ছিল। পরবর্তী সময়ে আরও নানা প্রকার সঙ্কর অর্থাৎ মিশ্র জাতির সৃষ্টি হয়। সমাজে প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট পেশা ছিল। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও পূজা পার্বণ করা– এগুলো ছিল ব্রাহ্মণদের নির্দিষ্ট কর্ম। তারা সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদা লাভ করত। ক্ষত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ করা। ব্যবসা-বাণিজ্য করা ছিল বৈশ্যদের কাজ। সবচেয়ে নিচু শ্রেণির শূদ্ররা সাধারণত কৃষিকাজ, মাছ শিকার ও অন্যান্য ছোটখাটো কাজ করত। ব্রাহ্মণ ছাড়া বাকি সব বর্ণের মানুষ একে অন্যের সাথে মেলামেশা করত। সাধারণত এক জাতির মধ্যেই বিবাহ হতো, তবে উচ্চ শ্রেণির বর ও নিম্ন শ্রেণির কন্যার মধ্যে বিবাহও চালু ছিল। কিন্তু, পরবর্তী সময়ে এসব ব্যাপারে কঠোর নিয়ম চালু হয়।

বাঙালি মেয়েদের গুণাবলির সুখ্যাতি ছিল। মেয়েরা লেখাপড়া শিখত। সে যুগে অবরোধ বা পর্দাপ্রথা ছিল না। তবে, বাংলার মেয়েদের কোনো প্রকার স্বাধীনতা ছিলনা। একটি বিবাহ ছিল সমাজের নিয়ম। তবে পুরুষেরা বহু স্ত্রী রাখতে পারত। বিধবাকে নিরামিষ আহার করে সব ধরনের বিলাসিতা ত্যাগ করতে হতো। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও মৃত স্বামীর চিতায় সহমরণে যেতে হতো। এ প্রথাকে বলা হয় 'সতীদাহ প্রথা'। ধন-সম্পত্তিতে নারীদের কোনো আইনগত অধিকার ছিলনা। বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে বাঙালির উন্নত চরিত্রের কথা জানা যায়। কিন্তু তাই বলে বাঙালির সামাজিক জীবনে কোনরূপ দুর্নীতি ও অশ্লীলতা ছিলনা, এমন কথা বলা যায় না।

বাঙালির প্রধান খাদ্য বর্তমান সময়ের মতো তখনও ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি। চাউল হতে প্রস্তুত নানা প্রকার পিঠাও জনপ্রিয় মুখরোচক খাবার ছিল। বাঙালি ব্রাহ্মণেরা আমিষ খেত। তখন সকল প্রকার মাছ পাওয়া যেত। পূর্ববঙ্গে ইলিশ ও শুঁটকি মাছ খুব প্রিয় খাবার ছিল। তরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিংগে, কাকরুল, কচু উৎপন্ন হতো। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, তাল, পেঁপে, নারকেল, ইক্ষু পাওয়া যেত। তবে ডালের কথা কোথাও বলা নেই। দুধ, নারকেলের পানি, ইক্ষুরস, তালরস সহ নানা প্রকার পানীয় খাবার প্রচলিত ছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষে মসলাযুক্ত পান খাওয়ার রীতি ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যাপারে রাজা-মহারাজা ও ধনীদের কথা বাদ দিলে বিশেষ কোনো আড়ম্বর তখন ছিল না। বাংলার নর-নারীরা যথাক্রমে ধুতি ও শাড়ি পরিধান করত। মাঝে মাঝে পুরুষেরা গায়ে চাদর, আর মেয়েরা পরত ওড়না। উৎসব-অনুষ্ঠানে বিশেষ পোশাকের ব্যবস্থা ছিল। পুরুষ-নারী উভয়ের মধ্যেই অলংকার ব্যবহারের রীতি প্রচলিত ছিল। তারা কানে কুণ্ডল, গলায় হার, আঙ্গুলে আংটি, হাতে বালা ও পায়ে মল পরিধান করত। মেয়েরাই কেবল হাতে শঙ্খের বালা পরত এবং অনেক চুড়ি পরতে ভালোবাসত। মণি-মুক্তা ও দামি সোনা-রূপার অলংকার ধনীরা ব্যবহার করত। মেয়েরা নানাপ্রকার খোপা বাঁধত। পুরুষদের বাবরি চুল কাঁধের উপর ঝুলে থাকত। কর্পুর, চন্দন প্রভৃতি প্রসাধন সামগ্রীর সঙ্গে বিভিন্ন সুগন্ধির ব্যবহারের প্রচলন ছিল। মেয়েদের সাজসজ্জায় আলতা, সিঁদুর ও কুমকুমের ব্যবহারও তখন প্রচলিত ছিল। পুরুষেরা মাঝে মধ্যে কাঠের খড়ম বা চামড়ার চটিজুতা ব্যবহার করত। তখন ছাতারও প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে নানা রকম খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল। পাশা ও দাবা খেলার প্রচলন ছিল। তবে নাচ-গান ও অভিনয়ের প্রচলন ছিল খুব বেশি। বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল ইত্যাদি তো ছিলই, এমনকি মাটির পাত্রকেও বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহার করা হতো। কুস্তি, শিকার, ব্যায়াম, নৌকাবাইচ ও বাজিকরের খেলা পুরুষদের খুব পছন্দ ছিল। নারীদের মধ্যে উদ্যান রচনা, জলক্রীড়া ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল।

অন্নপ্রাশন, বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সামাজিক আচার-আচরণ অনুষ্ঠান সে যুগেও প্রচলিত ছিল। বারো মাসে তেরো পার্বণ অনুষ্ঠিত হতো। এ উপলক্ষে নানা প্রকার আমোদ–উৎসবের ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীনকালে বাংলায় বর্তমানকালের ন্যায় ভ্রাতৃদ্বিতীয়া (ভাইফোঁটা), নবান্ন, রথযাত্রা, অষ্টমী স্নান, হোলি, জন্মাষ্টমী, দশহরা, অক্ষয় তৃতীয়া, গঙ্গাস্নান প্রভৃতি সুপরিচিত অনুষ্ঠান সেকালেও প্রচলিত ছিল। এসকল আমোদ-উৎসব ছাড়াও তখন হিন্দুধর্মে অনেক লৌকিক অনুষ্ঠানও দেখা যায়। শিশুর জন্মের পূর্বে তার মঙ্গলের জন্য গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হতো। জন্মের পর নামকরণ,

অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপাচার পালন করা হতো। প্রাচীনকালে বাংলার জনগণের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মশাস্ত্রের প্রবল প্রভাব ছিল। কোন তিথিতে কী খাদ্য নিষিদ্ধ, কোন তিথিতে উপবাস করতে হবে এবং বিবাহ, শিশু বয়সে পড়াশুনা শুরু করা, বিদেশ যাত্রা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির জন্য কোন কোন সময় শুভ বা অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে নিয়ম কঠোরভাবে পালিত হতো।

প্রচীন বাংলার মানুষের যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল গরুর গাড়ি ও নৌকা। খাল-বিলে চলাচলের জন্য ভেলা ও ডোঙ্গা ব্যবহার করা হত। মানুষ ছোট ছোট খাল পার হতো সাঁকো দিয়ে। ধনী লোকেরা হাতি, ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করত। তাদের স্ত্রী-পরিজনেরা নৌকা ও পালকিতে একস্থান হতে অন্য স্থানে আসা-যাওয়া করত। বিয়ের পর নববধূকে গরুর গাড়িতে বা পালকিতে করে শ্বশুর বাড়ি আনা হত। সর্বোপরি মনে হয় যে, আধুনিক কালের গ্রামীণ জীবনযাত্রা এবং সেকালের জীবনযাত্রার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য ছিল না।

কৃষিপ্রধান দেশ হিসেবে বাংলার অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করত। মানুষের জীবন মোটামুটি সুখের ছিল। তবে প্রাচীন বাংলার গরিব দুঃখী মানুষের কথাও জানা যায়। সমাজের উঁচু শ্রেণি অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের হাতে ছিল মূল ক্ষমতা। এ সময় শুধু ব্রাহ্মণরাই শাস্ত্রজ্ঞান চর্চা করতে পারত। ব্রাহ্মণদের অত্যাচার সাধারণ মানুষের জীবনকে অতিষ্ট করে তুলেছিল। এ উৎপাত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি অধিক হতো। শেষ দিকে সেন রাজাদের অত্যাচারে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে। সেন বংশের শাসনামলে বৌদ্ধ সমাজ ও সংস্কৃতিতে নেমে আসে দুর্দশা। ব্রাহ্মণদের প্রভাবে সেনদের সময়ে সাধারণ হিন্দু সমাজ দুর্বল হয়ে পড়ে। প্রাচীন বাংলার শেষ পর্যায়ে এ বিশৃঙ্খল অবস্থায় মুসলমান সমাজের ভিত গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা হয়। আর এ যুগে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির রূপও পাল্টে যায়।

একক কাজ ঃ প্রাচীন বাংলার মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার, বাদ্যযন্ত্র ও খেলাধুলার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা এবং শিল্পকলা ও স্থাপত্য-ভাস্কর্য

প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

বাংলা চিরকালই কৃষি প্রধান দেশ। প্রাচীনকালে অধিকাংশ মানুষই গ্রামে বাস করত আর গ্রামের আশপাশের ভূমি চাষ করে সংসার চালাতো। যারা চাষ করত বা অন্য কোন প্রকারে জমি ভোগ করত, বিনিময়ে তাদের নির্দিষ্ট কতগুলো কর দিতে হতো।

প্রধানত তিন প্রকারের ভূমি ছিল। ঘর-বাড়ি তৈরি করে থাকার জন্য উপযুক্ত জমিকে 'বাস্তু', চাষ করা যায় এমন উর্বর জমিকে 'ক্ষেত্র' এবং উর্বর অথচ পতিত জমিকে বলা হতো 'খিল'। এ তিন প্রকারের ভূমি ছাড়াও অন্যান্য প্রকারের ভূমি ছিল। সেগুলো হলো– চারণ ভূমি, হাট-বাজার, বনজঙ্গল এবং যানবাহন চলাচলের পথ। মনে করা হয় এ সময় ভূমির মালিক ছিলেন রাজা নিজে। তখনকার দিনে 'নল' দিলে জমি মাপা হতো। বিভিন্ন এলাকায় নলের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রকম ছিল।

প্রাচীনকাল হতেই বঙ্গদেশ কৃষির জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তাই এদেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে কৃষির উপর নির্ভর করে। ধান ছিল বাংলার প্রধান ফসল। এছাড়া, পাট, ইক্ষু, তুলা, নীল, সরিষা ও পান চাষের জন্য বাংলার খ্যাতি ছিল। ফলবান বৃক্ষের মধ্যে ছিল আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, ডালিম, কলা, লেবু, ডুমুর, খেজুর ইত্যাদি। এলাচি, লবঙ্গ প্রভৃতি মসলাও বঙ্গে উৎপন্ন হতো। গৃহপালিত পশুর মধ্যে গরু, ছাগল, মেষ, হাঁস-মুরগি, কুকুর ইত্যাদি ছিল প্রধান। লবণ ও শুটকি দেশের কোনো কোনো অংশে উৎপন্ন হতো।

কুটির শিল্পে প্রাচীন বাংলা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। গ্রামের লোকদের দরকারি সব কিছু গ্রামেই তৈরি হতো। মাটির তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল কলস, ঘটি-বাটি, হাঁড়ি-পাতিল, বাসনপত্র ইত্যাদি। লোহার তৈরি জিনিসপত্রের মধ্যে ছিল দা,

কুড়াল, কোদাল, খন্তা, খুরপি, লাঙ্গল ইত্যাদি। এছাড়া জলের পাত্র, তীর, বর্শা, তলোয়ার প্রভৃতি যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হতো। বিলাসিতার নানা রকম জিনিসের জন্য স্বর্ণ-শিল্প ও মণি-মাণিক্য শিল্প অনেক উন্নতি লাভ করেছিল। কাঠের শিল্পও সে সময়ে অত্যন্ত উন্নত ছিল। সংসারের আসবাবপত্র, ঘর-বাড়ি, মন্দির, পাল্কি, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, রথ প্রভৃতি কাঠের দ্বারাই তৈরি হতো। এছাড়া নদীপথে চলাচলের জন্য নানা প্রকার নৌকা ও সমুদ্রে চলাচলের জন্য কাঠের বড় বড় নৌকা বা জাহাজ তৈরি হতো।

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান হলেও অতি প্রাচীনকাল হতে এখানে নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য তৈরি হতো। বস্ত্র শিল্পের জন্য বাংলা প্রাচীনকালেই বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। বিশ্বখ্যাত মসলিন কাপড় প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় তৈরি হতো। এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে, ২০ গজ মসলিন একটি নস্যের কৌটায় ভরা যেত। কার্পাস তুলা ও রেশমের তৈরি উন্নতমানের সূক্ষ্ম বস্ত্রের জন্যও বঙ্গ প্রসিদ্ধ ছিল। শনের তৈরি মোটা কাপড়ও তখন প্রস্তুত হতো। জানা যায় যে, বঙ্গদেশে সে সময় টিন পাওয়া যেত।

বঙ্গে কৃষি ও শিল্প দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। আবার এগুলোর খুব চাহিদাও ছিল ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। তাই বঙ্গের সঙ্গে প্রাচীনকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বঙ্গের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সূতি ও রেশমি কাপড়, চিনি, গুড়, লবণ, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলা, চাউল, নারকেল, সুপারি, ঔষধ তৈরির গাছপালা, নানা প্রকার হিরা, মুক্তা, পান্না ইত্যাদি।

শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যও যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছিল। স্থল ও জল উভয় পথেই বাণিজ্যের আদান-প্রদান চলত। দেশের ভেতরে বাণিজ্য ছাড়াও সে সময়ে বাংলা বৈদেশিক বাণিজ্যে বিশেষ উন্নত ছিল। স্থল ও জলপথে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাংলার পণ্য বিনিময় চলত। এ কারণে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বড় বড় নগর ও বাণিজ্য বন্দর গড়ে উঠেছিল। এগুলো হলো– নব্যাবশিকা, কোটীবর্ষ, পুণ্ড্র বর্ধন, তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ, সপ্তগ্রাম ইত্যাদি। অবশ্য শহর ছাড়া গ্রামের হাটবাজারেও কিছু কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এসব গ্রামের হাটে গ্রামে উৎপন্ন ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বেচা-কেনা হতো। সমুদ্র পথে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, চম্পা, কম্বোজ, যবদ্বীপ, মালয়, শ্যাম, সুমাত্রা, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাংলার পণ্য বিনিময় চলত। স্থলপথে চীন, নেপাল, ভুটান, তিব্বত ও মধ্য এশিয়া প্রভৃতি দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত।

শিল্পের উন্নতি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলার ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রাচীনকালে হয়ত ক্রয়-বিক্রয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য 'বিনিময় প্রথা' প্রচলিত ছিল। সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পূর্বে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়। বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা চালু থাকলেও এখানে কড়ি সবচেয়ে কম মান হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

একক কাজ ঃ প্রাচীন বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার তালিকা তৈরি কর।

দলীয় কাজ ঃ প্রাচীন বাংলায় সমুদ্র ও স্থলপথে কোন কোন দেশের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল ছকে দেখাও।

শিল্পকলা ও স্থাপত্য-ভাস্কর্য

বাংলাদেশের নানাস্থানে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্পের বহু নির্দশন পাওয়া গেছে। নানা কারণে এসব শিল্পকলা ধ্বংস হয়ে গেছে। তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায়, প্রাচীন যুগে বাংলার শিল্পকলা খুবই উন্নত ছিল।

স্থাপত্য : প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন অতি সামান্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। চীন দেশের ভ্রমণকারী ফা-হিয়েন ও হিউয়েন-সাং-এর বিবরণী এবং শিলালিপি থেকে প্রাচীন যুগে বাংলার কারুকার্যময় বহুহর্ম্য, (চূড়া, শিখা) মন্দির, স্তূপ ও বিহারের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

শালবন বিহার, ময়নামতি, কুমিল্লা

ভারত উপ-মহাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন স্থাপত্যের নির্দশন হলো স্তূপ। বৈদিক যুগে দেহাবশেষ পুঁতে রাখার জন্য শ্মশানের উপর মাটির স্তূপ রক্ষা করার জন্য এ স্থাপত্য পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। বৌদ্ধধর্ম যেখানেই প্রসার লাভ করেছে, সেখানেই ছোট-বড় অসংখ্য স্তূপ নির্মিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলায় কিছু বৌদ্ধ ও জৈন স্তূপ নির্মিত হয়েছিল। ঢাকা জেলার আশরাফপুর গ্রামে রাজা দেব খড়গের ব্রোঞ্জ বা অষ্টধাতু নির্মিত একটি স্তূপ পাওয়া গেছে। এটিই সম্ভবত বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন স্তূপের নির্দশন। রাজশাহীর পাহাড়পুর এবং চট্টগ্রামের ঝেওয়ারিতে আরও দুটি ব্রোঞ্জের তৈরি স্তূপ পাওয়া গেছে। এছাড়া রাজশাহীর পাহাড়পুর এবং বাঁকুড়ার বহুলাড়ায় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটের তৈরি স্তূপ পাওয়া গেছে।

অতি প্রাচীনকাল হতে বাংলায় বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুরা বিহার ও সংঘরাম তৈরি করে স্ব স্ব ধর্ম প্রচার করতেন। কিন্তু, একে স্থাপত্য কর্ম বলা চলে না। কারণ, ইট-পাথরের কাঠামোর উপর বাঁশ ও কাঠ দিয়ে এগুলো তৈরি হতো। কালক্রমে বৌদ্ধ ও জৈন সংঘে যখন প্রচারকের সংখ্যা বাড়তে লাগল তখন হতেই ইটের তৈরি বিহার প্রস্তুত শুরু হলো। পাল যুগে এসেই বিহারের রূপের পরিবর্তন হলো। এসব বিহারের কোনো কোনটি বেশ বড় এবং কারুকার্যময় ছিল। স্তূপের মতো এগুলোও ধ্বংস হয়ে গেছে। রাজশাহীর পাহাড়পুরে যে বিশাল বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এ পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে যত বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে তারমধ্যে এ বিহারটি সবচেয়ে বড়। জানা যায়, অষ্টম শতকে ধর্মপাল এখানে প্রকাণ্ড বিহারটি নির্মাণ করেন। 'সোমপুর বিহার' নামে এটি সমগ্র ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষের বাইরে খ্যাতি অর্জন করে। সোমপুর বিহার ব্যতীত ধর্মপাল বিক্রমশীল বিহার ও ওদন্তপুর বিহার নামে আরও দুটি বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এছাড়া পাল আমলে তৈরি ছোট-বড় আরও কয়েকটি বিহারের নাম পাওয়া যায়। যেমন–মালদহের 'জগদ্দল বিহার', 'দেবীকোট বিহার', চট্টগ্রামের 'পণ্ডিত বিহার', ত্রিপুরার 'কনকস্তূপ বিহার' প্রভৃতি। কয়েক বছর পূর্বে কুমিল্লার ময়নামতিতে কয়েকটি বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এটি 'শালবল বিহার' নামে পরিচিত। কেউ কেউ মনে করেন যে, পাহাড়পুরের বিহার ও মন্দির অপেক্ষাও বড় মন্দির ও বিহার এখানে ছিল।

ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে প্রাচীন বাংলার মন্দির এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কারণ প্রাচীনকালে অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। এ সকল মন্দির আজ সকলই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কেবল অষ্টম শতক হতে কয়েকটি ভাঙ্গা ও অর্ধ-ভাঙ্গা মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায়। এ সকল বৌদ্ধ মন্দির পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, রাঢ়, বরেন্দ্র প্রভৃতি অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। বর্ধমান জেলার বরাকরের মন্দিরটি প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির বলে ধারণা করা হয়। পাহাড়পুরের মন্দির এক অনন্য সৃষ্টি। কেননা উপমহাদেশের অবশিষ্ট অঞ্চলের স্থাপত্য শিল্পকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। দিনাজপুর জেলার বাণগড়ে প্রস্তর নির্মিত এবং চট্টগ্রামের কেওয়ারিতে ব্রোঞ্জের তৈরি মন্দিরের সন্ধান পাওয়া গেছে।

উয়ারী-বটেশ্বরে আবিষ্কৃত ধ্বংসাবশেষ

অতি সম্প্রতি উয়ারী-বটেশ্বর গ্রামে প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন এক নগর সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। নরসিংদী জেলার বেলাব, শিবপুর ও রায়পুরা উপজেলার ৫০টি স্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের পাথর ও প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম-কাঠের হাতিয়ার, তাম্র-প্রস্তর সংস্কৃতির প্রত্নবস্তু। উয়ারী-বটেশ্বর ছিল বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগরী। এখান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে মাটির দুর্গ-প্রাচীর, পরিখা, পাকা রাস্তা, পার্শ্ব-রাস্তাসহ ইটনির্মিত স্থাপত্য কীর্তি। পুরাতন

ব্রহ্মপুত্র নদ অববাহিকায় অবস্থিত উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একটি নদীবন্দর ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যকেন্দ্র। ভারতীয় উপমহাদেশের আদি-ঐতিহাসিককালের অনেক নগর এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল উয়ারী-বটেশ্বরের। উয়ারী-বটেশ্বরে বিকশিত হয়েছিল স্বল্প-মূল্যবান পাথরের নয়নাভিরাম পুঁতি তৈরির কারখানা। এখানে আবিষ্কৃত উপমহাদেশের প্রাচীনতম ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা ও মুদ্রাভাণ্ডার, অনন্য স্থাপত্যকীর্তি, হরেক রকমের পুঁতি, সুদর্শন লকেট ও মন্ত্রপূত কবচ, বাটখারা, পোড়ামাটির ও ধাতব শিল্পবস্তু, মৃৎপাত্র, চিত্রশিল্প ইত্যাদি শিল্পীর দক্ষতা, উন্নত শিল্পবোধ ও দর্শনের পরিচয় বহন করে।

বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি বৌদ্ধধর্ম প্রচারক ও পণ্ডিত অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞানর জন্মস্থান বিক্রমপুরের প্রাচীন বজ্রযোগিনী গ্রামে সম্প্রতি একটি বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মনে করছেন এটি অষ্টম বা নবম শতকে নির্মিত বিক্রমপুরী বৌদ্ধ বিহার। বিক্রমপুর থেকে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন, দারু ও পাথর নির্মিত ভাস্কর্য, স্মৃতিস্তম্ভ প্রভৃতি প্রত্নবস্তু প্রাক-মধ্যযুগের সমৃদ্ধ সভ্যতার পরিচয় বহন করে। বিক্রমপুর (বর্তমান মুন্সিগঞ্জ ও শরিয়তপুর জেলা) ছিল প্রাক-মধ্যযুগে সমতট ও বঙ্গের রাজধানী। বিক্রমপুরের পাল, চন্দ্র, বর্ম ও সেন আমলের নানা প্রত্ননিদর্শন, সুলতানি আমলের সুফি সাধক বাবা আদম শহিদের মাজার ও মসজিদ এবং মুগল আমলের ইদ্রাকপুর দুর্গ ও সেতু এখনো টিকে আছে। ব্রিটিশ শাসনামলে নির্মিত অসংখ্য দৃষ্টিনন্দন মন্দির ও মসজিদ বিক্রমপুরের ঐতিহ্য।

ভাস্কর্য ঃ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে অথবা এর পূর্ব বর্ষ হতে বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি ভাস্কর্য শিল্পের চর্চাও হতো। প্রাচীন বাংলায় বহু মন্দির ছিল। তাই, ভাস্কর্য শিল্পকলাও যে উন্নত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। অনেক স্থানে মন্দির ধ্বংস হলেও তার মধ্যের দেবমূর্তি রক্ষিত হয়েছে। কেবল পুষ্করণ, তমলুক, মহাস্থান প্রভৃতি অঞ্চলে গুপ্ত-পূর্ব যুগের কয়েকটি পোড়ামাটির মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে খোদিত পোড়ামাটির ফলক

পাহাড়পুরের মন্দির গাত্রে খোদিত পাথর ও পোড়ামাটির ফলক থেকে বাংলার নিজস্ব ভাস্কর্য শিল্পের বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ভাস্কর্যে রামায়ণ-মহাভারতের অনেক কাহিনি এবং কৃষ্ণলীলার অনেক কথা খোদিত আছে। এছাড়া সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কথাও এ ভাস্কর্যে রূপ দেয়া হয়েছে। খোদিত ভাস্কর্য ছাড়াও প্রাচীন বাংলায় পোড়ামাটির শিল্প খুবই উন্নত ছিল। কুমিল্লার ময়নামতি ও লালমাই পাহাড়ে বেশ কিছু পোড়ামাটির ফলক ও মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীন কোটিবর্ষ নগরীর ধ্বংসস্তূপেও অনেক পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। পণ্ডিতগণ এগুলোকে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত ও পাল যুগের বলে অনুমান করেছেন। গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের ধ্বংসাবশেষেও কিছু পোড়ামাটির মূর্তি পাওয়া গছে।

চিত্রশিল্প ঃ পাল যুগের পূর্বেকার কোনো চিত্র আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কিন্তু প্রাচীনকালেই যে বাংলায় চিত্র অঙ্কনের চর্চা ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সাধারণতঃ বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরের দেয়াল সৌন্দর্যময় করার জন্য চিত্রাঙ্কন করার রীতি প্রচলিত ছিল।

তখনকার দিনে বৌদ্ধ লেখকেরা তালপাতা অথবা কাগজে তাদের পুস্তকের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতেন। এ সকল পুঁথি চিত্রায়িত করার জন্য লেখক ও শিল্পীরা ছোট ছোট ছবি আঁকতেন।

রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কনেও প্রাচীন বাংলার শিল্পীরা যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন। রাজা রামপালের রাজত্বকালে রচিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুঁথি বাংলার চিত্র শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। রেখার সাহায্যে চিত্রাঙ্কনের আর একটি দৃষ্টান্ত হলো সুন্দরবনে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের তাম্রশাসনের অপর পিঠে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর রেখাচিত্র।

প্রাচীন বাংলার শিল্পকলার ক্ষেত্রে পাল যুগ স্মরণীয়। নবম থেকে দ্বাদশ -এ চার শতক পর্যন্ত এ যুগের শিল্পকে সাধারণত; পাল যুগের শিল্পকলা বলে আখ্যায়িত করা হয়। কারণ এ যুগের শিল্পনীতিই পরবর্তী সেন যুগেও অব্যাহত ছিল। প্রস্তর

ও ধাতু নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি এ যুগের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে বিবেচিত হয়। এতে ধর্মভাবের প্রভাবই ছিল বেশি। শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে দেব-দেবীর মূর্তিগুলো নির্মিত হয়েছিল। তথাপি শিল্পীর শিল্পকৌশল ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় এতে লক্ষ্য করা যায়। মূর্তি নির্মাণে সাধারণত অষ্টধাতু ও কালো কষ্টিপাথর ব্যবহার করা হতো। এ ছাড়া, সোনা ও রূপার ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঃ উদ্ভব ও বিকাশ

প্রাচীন ভারতে আর্যদের আগমনের পূর্বে এখানে নানা জাতি ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোক বসবাস করত। তারা আর্যভাষী হিন্দু ছিল না। কিন্তু তারা যে কোন ভাষায় কথা বলত তা সঠিকভাবে আজও নির্ণয় করা যায়নি। এতে অনুমান করা যায় যে, প্রাচীন ভারতে নানা ভাষা-ভাষী লোক ছিল।

বাংলার প্রাচীন অধিবাসীরা সম্ভবত ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অস্ট্রো-এশিয়াটিক জাতির মানুষ। তারা ব্রহ্মদেশ (মায়ানমার) ও শ্যামদেশের (থাইল্যান্ড) মোন এবং কম্বোজের ক্ষের শাখার মানুষের আত্মীয়। সম্ভবত এ জাতীয় মানুষকেই বলা হতো 'নিষাদ' কিংবা 'নাগ'; আর পরবর্তীকালে 'কোল্ল', 'ভিল্ল' ইত্যাদি। সুতরাং তাদের ভাষাও ছিল অস্ট্রিক গোষ্ঠীর মোন, ক্ষের শাখার ভাষার মতোই। অস্ট্রিক গোষ্ঠী ছাড়াও বাংলায় বাস করত দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার লোক। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ও দ্রাবিড় ভাষার লোক ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর বাংলায় বহু পূর্বকাল হতে নানা সময়ে এসেছিল মঙ্গোলীয় বা ভোট চীনা গোষ্ঠীর নানা জাতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোক। এরা হলো গারো, বরো, কোচ, মেছ, কাছাড়ি, টিপরাই, চাকমা প্রভৃতি। সম্ভবত এদেরই বলা হতো কিরাত জাতি। এরা ভোটচীনা গোষ্ঠীর নানা ভাষা-উপভাষায় কথা বলত। এসব ভাষা-উপভাষার কোনো কোনো শব্দ ও রচনা পদ্ধতি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃত ভাষায় লুকিয়ে আছে এবং এর কিছু কিছু নিদর্শন ভাষা বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করতে পেরেছেন।

অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ও ভোটচীনা ভাষাগোষ্ঠীর পর যে নতুন একটি ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ বাংলায় প্রবেশ করে তারা হলো আর্য। আর্যদের ভাষার নাম প্রাচীন বৈদিক ভাষা। পরবর্তীকালে এ ভাষাকে সংস্কার করা হয়। পুরানো ভাষাকে সংস্কার করা হয় বলে এ ভাষার নাম হয় সংস্কৃত ভাষা। সম্ভবত বৈদিক যুগের শেষ দিকে তারা বাংলায় আগমন শুরু করে। আর খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যে তারা এদেশে বসতি স্থাপন শেষ করেছিল। ভারত উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো দীর্ঘদিন ধরে তারা বাংলার ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সঙ্গে পাশাপাশি বসবাস করতো। ফলে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অধিবাসীরা নিজেদের ভাষা ত্যাগ করে আর্য ভাষা গ্রহণ করে। তাই প্রাচীন যুগে আর্যগণ যে ভাষা ব্যবহার করত এবং যে ভাষায় বৈদিক গ্রন্থ রচিত হয়েছিল স্থানভেদে এবং সময়ের পরিবর্তনে এর অনেক পরিবর্তন ঘটে। সংস্কৃত হতে প্রাকৃত এবং প্রাকৃত হতে অপভ্রংশ ভাষার উৎপত্তি হয়। অপভ্রংশ ভাষা হতে অষ্টম বা নবম শতকে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়। যেমন- কৃষ্ণ>কাহ্ন>কানু>কানাই।

চর্যাপদ

নবম ও দশম শতকের আগে বাংলা ভাষার রূপ কি ছিল তা জানা যায় না। তবে এ শতকগুলোতে বাংলায় সংস্কৃত ছাড়াও দুইটি ভাষা প্রচলিত ছিল– এর একটি হলো শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং অন্যটি মাগধী অপভ্রংশের স্থানীয় গৌড়-বঙ্গীয় রূপ– যাকে বলা যায় প্রাচীনতম বাংলা ভাষা। একই লেখক এ দুই ভাষাতেই পদ, দোহা, ও গীত রচনা করতেন। বাংলা ভাষার এরূপ প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক নেপাল হতে সংগৃহীত চর্যাপদে। এ চর্যাপদগুলোর মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়। পরবর্তী যুগে বাংলায় সহজিয়া গান, বাউল গান ও বৈষ্ণব পদাবলীর উৎপত্তি হয়। সুতরাং, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদগুলোর মূল্য অপরিসীম। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, অষ্টম শতক হতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এ পাঁচশত বছরই হলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগ।

প্রাচীন বাংলার সাংস্কৃতিক জীবন, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস

প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় অবস্থা

প্রাচীন বাংলায় বৈদিক ধর্ম প্রতিষ্ঠার পূর্বে অন্য কোন ধর্মমত প্রচলিত ছিল কি না, সে সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে সে সময় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা পূজা-অর্চনা, ভয়-ভক্তি ও সংস্কারে বিশ্বাসী ছিল। তখন দেশব্যাপী ধর্মের প্রকৃতি একই রকম ছিল না। বরং বর্ণ, শ্রেণি, কৌম, জনপদ ইত্যাদির বিভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম-কর্মেও বিভিন্নতা দেখা দিয়েছিল। তদুপরি, তাদের প্রাচীন ধর্মমত, সংস্কার, পূজা-পদ্ধতি প্রভৃতি রূপান্তরিত হয়ে বৈদিক ধর্মের সঙ্গে মিলে গিয়েছে। এখনও বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে নারী জাতির মধ্যে প্রচলিত বৃক্ষ পূজা, পূজা-পার্বণে আম্র পল্লব, ধান ছড়া, দূর্বা, কলা, পান-সুপারি, নারকেল, ঘট, সিঁদুর প্রভৃতির ব্যবহার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকদের দান। একইভাবে মনসা পূজা, শ্মশান কালীর পূজা, বনদুর্গাপূজা, ষষ্ঠীপূজা প্রভৃতি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর লোকদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরই পরিচয় বহন করে। খাসি, মুন্ডা, সাঁওতাল, রাজবংশী, বুনো, শবর প্রভৃতি কৌমের লোকেরা তাদের আদিম পুরুষদের মতো আজও দেবতার আসনে বসিয়ে গাছ, পাথর, পাহাড়, পশু-পাখি ও ফল-মূলের পূজা করে থাকে। প্রাচীন ভারতের মতো তখনকার দিনে এদেশে নানা রকমের ধ্বজ পূজাও প্রচলিত ছিল। ধ্বজ পূজা ছিল কৌমের লোকদের নিকট ঐক্যের প্রতীক।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হতেই উপমহাদেশের তিনটি বৃহৎ বৈদিক, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় গুপ্ত যুগের পূর্বে অবৈদিক আর্য ধর্মের কিছুটা বিস্তার ঘটলেও খ্রিষ্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক পর্যন্ত এখানে আর্য-বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার লাভ করে নি। গুপ্ত আমলের তাম্রশাসন হতে জানা যায় যে, মধ্যদেশ হতে এসে ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশের নানা জায়গায় বসতি স্থাপন করেছিল। তারা বৈদিক যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করত এবং বেদ আলোচনা করত। তাদের ধর্ম-কর্ম পরিচালনা ও মন্দির নির্মাণের জন্য ভূমিদান করে রাজা-মহারাজারা পূণ্য অর্জনের চেষ্টা করত। এভাবে ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ বাংলার পূর্ব সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেছিল।

পাল শাসনের আমলেও বৈদিক ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তি অটুট ছিল। বর্ম ও সেন রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে একাদশ ও দ্বাদশ শতকে বৈদিক ধর্ম আরও প্রসার লাভ করে। এ দুই বংশের রাজা-মহারাজারা প্রায় সকলেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তখন বৌদ্ধ ধর্ম অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বৈদিক যাগ-যজ্ঞে পৌরাণিক দেব-দেবী ও বিশেষ বিশেষ তিথি নক্ষত্রে স্নান-দান-ধ্যান-ক্রিয়াকর্মের প্রচলন শুরু হয়। জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়ান্তকরণ, উপনয়ন, সমাবর্তন, বিবাহ, গৃহ প্রবেশ ইত্যাদি সংস্কার এভাবে বাঙালি ব্রাহ্মণ্য সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। এসব সংস্কার দেশের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণরা সরাসরি রাষ্ট্রের সহায়তা লাভ করেছিল।

বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বাংলার বুকে খুব দ্রুত প্রসার লাভ করলেও কালক্রমে এর মধ্যে বিবর্তন দেখা দেয়। গুপ্ত আমলে এদেশে একটি নতুন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আবির্ভাব ঘটে। বৈদিক যুগের দেব-দেবীর পরিচয় প্রায় বিলীন হয়ে যায়। তার পরিবর্তে নতুন নতুন দেব-দেবীর পূজা শুরু হয়। এ সকল দেবতাদের নামের সঙ্গে বৈদিক দেবতার নামের মিল ছিল। কিন্তু বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে তাদের কোনো মিল ছিল না। এ নতুন দেব-দেবীরা ছিলেন মূলত পুরাণ ও মহাকাব্যে বর্ণিত দেব-দেবী। তাই এ ধর্মকে 'পৌরাণিক ধর্ম' বলা হয়। স্থানীয় ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাবের ফলে আর্য ধর্মে এরূপ বিবর্তন দেখা দেয়। পুরোহিতরা ধর্ম-কর্ম পরিচালনা করার সার্বিক দায়িত্ব লাভ করে। ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডের জটিলতা বেড়ে যায়। দেবতার বেদিতে দুধ ও ঘৃত উৎসর্গের পরিবর্তে পশুবলি প্রথা বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন প্রকার কুসংস্কার ধর্মের অঙ্গ হিসেবে দেখা দেয়।

পৌরাণিক পূজা পার্বণের রীতি-নীতি ও ক্রিয়াকলাপ হতে যে সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় তাদের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন লিপিমালায় পাল-চন্দ্র-কম্বোজ যুগে বৈষ্ণব ধর্মের উন্নতির প্রমাণ পাওয়া যায়। পাল রাজাদের অনেকে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠাপোষক হলেও অন্য ধর্মের ন্যায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল ছিল। কিন্তু সেন রাজাদের ধর্মমত ভিন্ন। পূর্বপুরুষেরা সদাশিবের পূজা করলেও রাজা লক্ষণ সেন ছিলেন 'পরমবৈষ্ণব'। তাঁর সময় হতেই রাজকীয় অনুষ্ঠানের শুরুতে শিবের পরিবর্তে বিষ্ণুর স্তবের প্রচলন হয়।

গুপ্তযুগে শৈব ধর্মও প্রচলিত ছিল। ষষ্ঠ শতকের গোড়ায় মহারাজ বৈন্যগুপ্তের সহায়তায় পূর্ব বাংলায় শৈবধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। সপ্তম শতকে গৌড়রাজ শশাংক ও কামরূপ রাজা ভাস্করবর্মা - দুজনেই ছিলেন পরম শৈব। লক্ষণ সেন ও তাঁর বংশধরগণ বৈষ্ণব মতাবলম্বী হলেও কুলদেবতা সদাশিবকে কখনও পরিত্যাগ করেননি। আর্যাবর্তে পাশুপত ধর্মাবলম্বীরা সবচেয়ে প্রাচীন শৈব সম্প্রদায়। পাল আমলে পাশুপত সম্প্রদায়ও খুব শক্তিশালী ছিল।

এসকল দেব-দেবীর পুজা ব্যতীত আরও অনেক পৌরাণিক দেব-দেবীর পুজা বাংলায় প্রচলিত ছিল। এদের মধ্যে সূর্য ও শক্তি পুজাই ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য।

বর্ধমান মহাবীর

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈন ধর্মের প্রবর্তক বর্ধমান মহাবীর রাঢ় দেশে আগমন করেছিলেন। কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁর ধর্মকে গ্রহণ করেনি। বরং তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেছিল। তাই বলে জৈন ধর্মের অগ্রগতি রোধ করা যায়নি। প্রাচীনকাল হতে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা 'নিগ্রহন্ত' নামে পরিচিত হতো। গুপ্তযুগ পর্যন্ত এ নাম প্রচলিত ছিল। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে উত্তর বঙ্গে জৈন সম্প্রদায় বিদ্যমান ছিল। খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকে নাটোরের পাহাড়পুড়ে একটি জৈন বিহার ছিল।

সপ্তম শতকে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে 'নিগ্রহন্ত' জৈনদের প্রভাব ছিল সবচেয়ে বেশি। সমতট ও পুণ্ড্রবর্ধনে তারাই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ত্রয়োদশ শতকেও বাংলায় জৈন বা 'নিগ্রহন্ত' সংঘের রীতিমতো অস্তিত্ব ছিল। তবে পাল যুগ শুরু হওয়ার পর হতে জৈন ধর্মের প্রভাব কমে এসেছিল।

গৌতম বুদ্ধ

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পরও বাংলার কোথাও কোথাও বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার লাভ করেছিল। অশোকের রাজত্বকালেই বৌদ্ধ ধর্ম বাংলায় বেশি প্রসার লাভ করে। গুপ্ত ও গুপ্ত পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ না করলেও এর খুব তোড়জোড় ছিল। ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার পূর্বতম প্রান্ত ত্রিপুরায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কুমিল্লা অঞ্চলে তখন অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ছিল। পাল বংশের আগমনের ফলে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। অষ্টম শতক হতে একাদশ শতক পর্যন্ত বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মেরই জয়জয়কার ছিল। সুদীর্ঘ চারশত বছরের রাজত্বকালে তাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা-বিহার ছাড়িয়ে এ ধর্ম আন্তর্জাতিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তারা অনেক বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণ করেছিল।

এর মধ্যে ধর্মপালের বিক্রমশীল মহাবিহার, সোমপুর বিহার ও ওদন্তপুর বিহার উল্লেখযোগ্য। এ সকল বিহারে তিব্বত ও অন্যান্য অঞ্চল হতে অনেকে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য আসত। সোমপুর বিহারে বাস করতেন মহাপণ্ডিতাচার্য বোধিভদ্র। আচার্য অতীশ দীপঙ্করও কিছুকাল এ বিহারে বাস করেছিলেন। বাংলা ছাড়াও রাঢ় অঞ্চল, বরেন্দ্র, দিনাজপুর, ত্রিপুরা, কুমিল্লা ও চট্টগ্রামেও ছোট-বড় অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার ছিল। কয়েক বছর পূর্বে কুমিল্লার ময়নামতিতে কিছু সংখ্যক বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে অত্যন্ত বিশাল আকৃতির বিহারটি 'শালবন বিহার' নামে পরিচিত। শ্রীভবদেব এটি নির্মাণ করেছিলেন। পাল যুগের পর বাংলায় বৌদ্ধধর্ম সহজিয়া ধর্মরূপে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সমাজের নিম্ন স্তরে সহজিয়া ধর্মের ব্যাপক প্রভাব ছিল।

সেন যুগেই বিষ্ণু, শিব, পার্বতী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা শুরু হয় এবং বহু হিন্দু মন্দির নির্মিত হয়। ফলে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের পতন শুরু হয়। তারপর শেষ আঘাত আসে তুর্কি মুসলমানদের নিকট হতে। দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে তুর্কি আক্রমণের ফলে যখন প্রথমে মগধ ও পরে উত্তর বাংলার বৌদ্ধ বিহার ও মন্দিরগুলো ধ্বংস হয়, তখনই বৌদ্ধসংঘ ভারত হতে বিতাড়িত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য নেপাল ও তিব্বতে গমন করে। বৌদ্ধসংঘই ছিল বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র। কাজেই বৌদ্ধ সংঘের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মও বাংলা তথা ভারতবর্ষ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

প্রাচীন বাংলায় বহু ধর্ম-সম্প্রদায়ের সহঅবস্থান ধর্ম থাকলেও এদের মধ্যে কলহ ও হিংসা-দ্বেষ ছিল না। তারা পরস্পর মিলেমিশে পাশাপাশি বাস করত। বিশেষ করে পালরাজগণ বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হয়েও অন্যান্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। চীনা এবং তিব্বতীয় তথ্য হতে জানা যায় যে, প্রাচীন যুগে বাংলার ধর্ম জীবন খুব উন্নত ছিল এবং পরধর্ম সহিষ্ণুতা বাঙালি চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

একক কাজ ঃ প্রাচীন বাংলার ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর নাম উল্লেখ কর।

প্রাচীন বাংলার আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব ও রীতি-নীতি

প্রাচীন বাংলায় পূজা-পার্বন ও আমোদ প্রমোদের প্রচুর ব্যবস্থা ছিল। উমা অর্থাৎ দুর্গার অর্চনা উপলক্ষে বরেন্দ্রে বিপুল উৎসব হতো। বিজয়া দশমীর দিন 'শাবোরৎসব' নামে একপ্রকার নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হতো।

চৈত্র মাসে বাদ্য সহকারে এক ধরনের অশ্লীল গানের রীতি প্রচলিত ছিল। হোলাকা বা বর্তমান কালের 'হোলি' ছিল তখন অন্যতম প্রধান উৎসব। স্ত্রী-পুরুষ সকলে এতে যোগদান করতো। আত্মীয়-স্বজন মিলে চিড়া ও নারকেলের তৈরি নানাবিধ খাদ্য গ্রহণ এসময়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দ্যুত-পতিপদ নামে একটি বিশেষ উৎসব কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদে অনুষ্ঠিত হতো। এ মাসেই সুখরাত্রিব্রত পালিত হতো। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, আকাশপ্রদীপ, জন্মাষ্টমী, অক্ষয় তৃতীয়া, দশহরা, গঙ্গাস্নান, মহাঅষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নান ইত্যাদি বর্তমানের সুপরিচিত অনুষ্ঠানগুলো সেকালেও প্রচলিত ছিল।

এসব পূজা-পার্বণ আমোদ-উৎসব ব্যতীত হিন্দুধর্মের অনেক লৌকিক অনুষ্ঠানও প্রাচীনকালের সামাজিক জীবনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। শিশুর জন্মের পূর্বে তার মঙ্গলের জন্য গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ও শোষ্যন্তীহোম অনুষ্ঠিত হতো। জন্মের পর জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, পৌষ্টিককর্ম, অন্নপ্রাশনসহ অনেক উপাচার পালন করা হতো।

বাংলার হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মশাস্ত্রের ব্যাপক প্রভাব ছিল। কোন তিথিতে কি কি খাদ্য ও কর্ম নিষিদ্ধ, কোন তিথিতে উপবাস করতে হবে এবং বিবাহ, অধ্যয়ন, বিদেশ যাত্রা, তীর্থ গমন প্রভৃতির জন্য কোন কোন কাল শুভ বা অশুভ সে বিষয়ে শাস্ত্রের অনুশাসন কঠোরভাবে পালিত হতো।

তখনকার দিনে বাঙালি পুরুষদের কোনো সুনাম ছিল না। বরং তারা বিবাদপ্রিয় ও উদ্ধত বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু, বাঙালি মেয়েদের সুখ্যাতি ছিল। মেয়েরা লেখাপড়াও শিখত। শিক্ষিত সমাজে মাতা ও পত্নীর সম্মান ও মর্যাদা বেশ উচ্চ ছিল। সে যুগে অবরোধ বা পর্দা প্রথা ছিল না। বাংলার মেয়েদের কোনো স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা ছিল না। একজন স্ত্রী গ্রহণই ছিল সাধারণ নিয়ম। তবে, পুরুষের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক স্ত্রীকেই সপত্নীর সঙ্গে একত্রে জীবন যাপন করতে হত। বিধবা নারী জীবনের চরম অভিশাপ বলে বিবেচিত হত। মুছে যেত কপালের সিঁদুর এবং সেই সঙ্গে তার সমস্ত প্রসাধন ও অলঙ্কার। বিধবাকে নিরামিষ আহার করে সব ধরনের বিলাস বর্জন ও কৃচ্ছ্র সাধন করতে হতো। সহমরণ প্রথা সেকালেও প্রচলিত ছিল। প্রাচীন বাংলায় ধন-সম্পত্তিতে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। তবে, স্বামীর অবর্তমানে অপুত্রক বিধবা স্ত্রী স্বামীর সমস্ত সম্পত্তির অধিকার দাবি করতে পারত।

বাংলার প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে নৈতিক জীবনের খুব উচ্চ আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে সত্য, শৌচ, দয়া, দান প্রভৃতি সর্ববিধ গুণের মহিমা কীর্তন করা হয়েছে। অপরদিকে, ব্রহ্ম হত্যা, সুরা পান, চুরি করা, পরদার গমন (পরস্ত্রীর নিকট গমন) প্রভৃতি মহাপাতক বলে গণ্য করে তার জন্য কঠোর শাস্তি ও গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে এ আদর্শ কি পরিমাণে অনুসরণ করা হতো তা বলা কঠিন। তবে, সমাজ জীবনে কিছু কিছু দুর্নীতি ও অশ্লীলতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বখ্যাত কোন কাপড় বাংলায় তৈরি হতো?

ক. রেয়ন খ. রেশমি

গ. মসলিন ঘ. পশমি

২. প্রাচীন বাংলার অর্থনীতিকে কৃষি নির্ভর বলা হয়, কেননা এ সময়ে -

i. বাংলার প্রধান ফসল ছিল ধান;

ii. ইক্ষু, তুলা ও পান চাষের জন্য বাংলার খ্যাতি ছিল;

iii. প্রধান অর্থকরী ফসল ছিল পাট;

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i ও ii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

কবিতা গ্রীষ্মের ছুটিতে মা-বাবার সাথে কুমিল্লার ময়নামতিতে শালবন বিহার পরিদর্শনে যায়। সেখানে গিয়ে লক্ষ করে যে বিহারের মাঝখানে উঁচু ঢিবির উপর কেন্দ্রীয় মন্দির, চারপাশে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য অসংখ্য কক্ষ, দেওয়ালে টেরাকাটা অংকন। সবকিছু মিলিয়ে অপূর্ব প্রাচীন নিদর্শন।

৩. কবিতার দেখা প্রাচীন নিদর্শনের বৈশিষ্ট্যের সাথে প্রাচীন বাংলার কোন নিদর্শনের মিল খুঁজে পাওয়া যায়?

ক. ঢাকার আশরাফপুরের খ. চট্টগ্রামের ঝেওয়ারির

গ. নওগাঁর পাহাড়পুরের ঘ. বাঁকুড়ার বহুলাড়ার

৪. উক্ত প্রাচীন নিদর্শনে যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, তা হলো-

i. বৌদ্ধদের নির্মিত

ii. জ্ঞান সাধনার স্থান

iii. দেশে বিদেশে যথেষ্ট খ্যাতি রয়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১. টিনা তার বান্ধবীর বড় বোন নীলার বিয়েতে গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। নীলার পিতা গ্রামের সম্পদশালী ব্যবসায়ী। তিনি বিদেশে সুতিবস্ত্র, সিল্ক, ঔষধ মিহি চাউল রপ্তানি করেন। গ্রামে অনেক কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। দরকারি অনেক জিনিস গ্রামেই তৈরি হয়। গ্রামের লোকেরা এখনও মাটির তৈরি কলস, হাঁড়ি-পাতিল ব্যবহার করে। গ্রামে এখনও যথেষ্ট কৃষি জমি, চারণভূমি, হাট বাজার, বন্দর যানবাহন চলাচলের পথ রয়েছে। এমন একটি গ্রামে বিবাহ অনুষ্ঠানে এসে টিনা মুগ্ধ। বিয়ের দিন টিনা খুব সুন্দর করে সুতির শাড়ি, পায়ে আলতা, কপালে কুমকুম ও মাথায় ওড়না পরে সুন্দর করে চুলের খোপা বেঁধেছে। বিয়ে বাড়িতে ভাত, মাছ, মাংস, সবজি, দধি ও ক্ষীর পরিবেশন করা হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া শেষে মসলাযুক্ত পান দেয়া হয়। বিবাহ ও খাবারের শেষে একটি ছোট গানের জলসার আয়োজন ছিল।

ক. আর্যদের ভাষার নাম কী?

খ. কীভাবে বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত খাদ্য ও পোশাক পরিচ্ছদের সাথে বাংলার কোনো আমলের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'নীলাদের গ্রামের আর্থিক কাঠামো তৎকালীন বাংলার প্রতিচ্ছবি' তুমি কি উক্তিটির সঙ্গে একমত? যুক্তি দাও।

২. সৌরভ ব্যানার্জী ও প্রদীপ বণিক দুই বন্ধু এবং একই শহরে বসবাস করে। সৌরভের বাবা কাপড়ের ব্যবসা করেন। তার দোকানে টাঙ্গাইলের তাঁত, রাজশাহীর সিল্ক ও জামদানি শাড়ি বিক্রি হয়। বর্তমানে তিনি সুতি কাপড় ও সিল্ক শাড়ি বিদেশে রপ্তানি করছেন। প্রদীপের বাবা চাউল, চিনি, লবণ, মসলা ইত্যাদির ব্যবসা করেন। তিনি চিনি ও মসলা আমদানি করেন। একদিন প্রদীপ সৌরভদের বাড়িতে যায় এবং তার বোনকে দেখে নিজ বড় ভাইয়ের সাথে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। প্রদীপরা সৌরভদের সম গোত্রীয় নয় বিধায় উক্ত প্রস্তাব বাতিল করে দেন সৌরভের মা- বাবা।

ক. কখন থেকে বাংলায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হয়?

খ. প্রাচীন বাংলার মানুষের অবস্থা কেমন ছিল?

গ. সৌরভের বোনের বিয়ের ব্যাপারে তার মা-বাবার মনোভাবে তৎকালীন বাংলার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর, প্রদীপের বড় ভাইয়ের বিয়ের ব্যাপারে যে বাঁধার সৃষ্টি হয়েছে তা তৎকালীন বাংলার সমাজের অগ্রগতির অন্তরায়? যুক্তি দাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাস

(১২০৪-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)

মুসলমান শাসনের সূচনাকালকে বাংলায় মধ্যযুগের শুরু বলা হয়। ইতিহাসে এক যুগ থেকে অন্য যুগে প্রবেশ করতে হলে বিশেষ কতগুলো যুগান্তকারী পরিবর্তন দরকার। মুসলমানদের বঙ্গ বিজয়ের ফলে বঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই শুধু পরিবর্তন আসেনি। এর ফলে বঙ্গের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য, শিল্পকলাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈপ্লিবিক পরিবর্তন আসে।

এ অধ্যায় শেষে আমরা–

- মধ্যযুগের বাংলার মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠা পর্বের উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ বর্ণনা করতে পারব;
- মধ্যযুগে সুলতানি আমলে বাংলার বংশানুক্রমিক শাসন এবং তাঁদের রাজনৈতিক কৃতিত্বসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলায় আফগান শাসনামল ও শাসকগণের কৃতিত্ব বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলায় বার ভূঁইয়াদের ইতিহাস ও পরিচয় বর্ণনা করতে পারব;
- মুঘল শাসনামলে বাংলায় সুবেদার ও নবাবদের শাসনকালের রাজনৈতিক দিকসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ধারাবাহিকভাবে মধ্যযুগে বাংলার মুসলমান শাসকগণের রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে পারব।

বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা

ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজি

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে তুর্কি বীর ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খলজি বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। তিনি আফগানিস্তানের গরমশির বা আধুনিক দশত-ই-মার্গের অধিবাসী ছিলেন। ইতিহাসে তিনি বখতিয়ার খলজি নামেই বেশি পরিচিত। তাঁর বংশ পরিচয় সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা যায় না। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কি, বংশে খলজি এবং বৃত্তিতে ভাগ্যান্বেষী সৈনিক।

বখতিয়ার খলজি স্বীয় কর্মশক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন। ১১৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নিজ জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে জীবিকার অন্বেষণে গজনিতে আসেন। এখানে তিনি শিহাবউদ্দিন ঘোরির সৈন্য বিভাগে চাকরিপ্রার্থী হয়ে ব্যর্থ হন। খাটো, লম্বা হাত ও কুৎসিত চেহারার জন্য নিশ্চয়ই বখতিয়ার সেনাধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হন। এরূপ শারীরিক বৈশিষ্ট্য তুর্কিদের নিকট অমঙ্গল বলে বিবেচিত হতো। গজনিতে ব্যর্থ হয়ে বখতিয়ার দিল্লিতে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের দরবারে উপস্থিত হন। এবারও তিনি চাকরি পেতে ব্যর্থ হন। এরপর তিনি বদাউনে যান। সেখানকার শাসনকর্তা মালিক হিজবরউদ্দিন তাকে মাসিক বেতনে সৈন্য বিভাগে নিযুক্ত করেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষী বখতিয়ার এ ধরনের সামান্য বেতনভোগী সৈনিকের পদে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। অল্পকাল পর তিনি বদাউন ত্যাগ করে অযোধ্যা যান। সেখানকার শাসনকর্তা হুসামউদ্দিনের অধীনে তিনি পর্যবেক্ষকের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। বখতিয়ারের সাহস ও বুদ্ধিমত্তায় সন্তুষ্ট হয়ে হুসামউদ্দিন তাকে বর্তমান মির্জাপুর জেলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ভাগবত ও ভিউলি নামক দুটি পরগনার জায়গির দান করেন। এখানে বখতিয়ার তাঁর ভবিষ্যৎ উন্নতির উৎস খুঁজে পান। ভাগবত ও ভিউলি তার শক্তিকেন্দ্র হয়ে উঠে।

বখতিয়ার অল্পসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে শুরু করেন। এ সময়ে তার বীরত্বের কথা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক ভাগ্যান্বেষী মুসলমান তার সৈন্যদলে যোগদান করে। ফলে,

বখতিয়ারের সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এভাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আক্রমণ চালিয়ে তিনি দক্ষিণ বিহারে এক প্রাচীর ঘেরা দুর্গের মতো স্থানে আসেন এবং আক্রমণ করেন। প্রতিপক্ষ কোনো বাঁধাই দিল না। দুর্গ জয়ের পর তিনি দেখলেন যে দুর্গের অধিবাসীরা সকলেই মুণ্ডিত মস্তক এবং দুর্গটি বইপত্রে ভরা। জিজ্ঞাসা করে তিনি জানতে পারলেন যে, তিনি এক বৌদ্ধ বিহার জয় করেছেন। এটি ছিল ওদন্দ বিহার বা ওদন্তপুরী বিহার। এ সময় হতেই মুসলমানেরা এ স্থানের নাম দিল বিহার। আজ পর্যন্ত তা বিহার নামে পরিচিত।

বিহার বিজয়ের পর বখতিয়ার অনেক ধনরত্নসহ দিল্লির সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুলতান কর্তৃক সম্মানিত হয়ে তিনি বিহার ফিরে আসেন। অধিক সৈন্য সংগ্রহ করে তিনি পরের বছর নবদ্বীপ বা নদীয়া আক্রমণ করেন। এ সময় বাংলার রাজা লক্ষণ সেন নদীয়ায় অবস্থান করছিলেন। গৌড় ছিল তাঁর রাজধানী, আর নদীয়া ছিল তাঁর দ্বিতীয় রাজধানী। বখতিয়ার কর্তৃক বিহার জয়ের পর সেন সাম্রাজ্যে গভীর ভীতি বিদ্যমান ছিল। দৈবজ্ঞ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ রাজা লক্ষণ সেনকে রাজধানী ত্যাগ করতে পরামর্শ দেন। তাদের শাস্ত্রে তুর্কি সেনা কর্তৃক বঙ্গ জয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। এছাড়া বিজয়ীর যে বর্ণনা শাস্ত্রে আছে তার সঙ্গে বখতিয়ারের দেহের বর্ণনা একেবারে মিলে যায়। কিন্তু তবুও রাজা লক্ষণ সেন নদীয়া ত্যাগ করেননি।

বিহার হতে বাংলায় প্রবেশ করতে হলে তেলিয়াগড় ও শিকড়িগড় -এই দুই গিরিপথ দিয়ে আসতে হত। এ গিরিপথ দুটো ছিল সুরক্ষিত। তিনি প্রচলিত পথে অগ্রসর হলেন না। কিন্তু অরণ্যময় অঞ্চলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হওয়াতে বখতিয়ারের সৈন্যদল খণ্ড খণ্ডভাবে অগ্রসর হয়। শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে বখতিয়ার খলজি যখন নদীয়ার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিল মাত্র ১৭ কিংবা ১৮ জন অশ্বারোহী সৈনিক। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে বখতিয়ার খলজির পক্ষে বঙ্গ বিজয় কী করে সম্ভব হলো? কথিত আছে, তিনি এত ক্ষিপ্র গতিতে পথ অতিক্রম করেছিলেন যে, মাত্র ১৭/১৮ জন সৈনিক তাঁকে অনুসরণ করতে পেরেছিল। আর মূল সেনাবাহিনীর বাকি অংশ তাঁর পশ্চাতেই ছিল ।

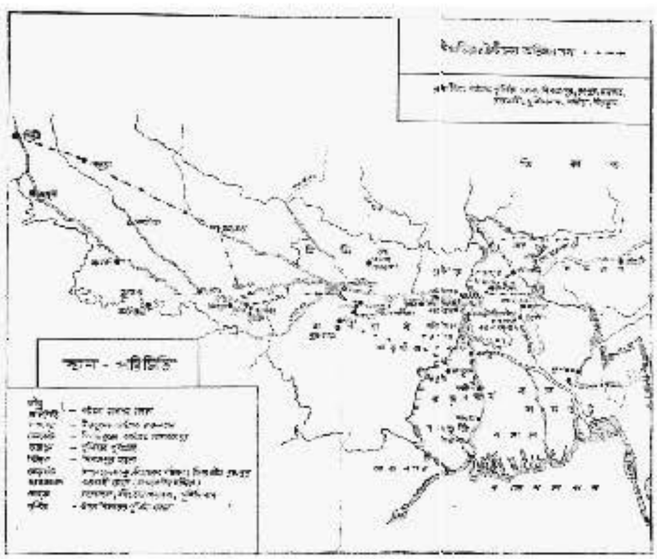

মানচিত্র : বখতিয়ার খলজির বঙ্গবিজয়ের পথ

তখন দুপুর। রাজা লক্ষণ সেন মধ্যাহ্নভোজে ব্যস্ত; প্রাসাদ-রক্ষীরা তখন আরাম আয়েস করছে; নাগরিকগণও নিজেদের প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত। বখতিয়ার খলজি বণিকের ছদ্মবেশে নগরীর দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছান। রাজা লক্ষণ সেন তাদেরকে অশ্ব ব্যবসায়ী মনে করে নগরীর অভ্যন্তরে প্রবেশের অনুমতি দেন। কিন্তু এ ক্ষুদ্রদল রাজপ্রাসাদের সম্মুখে এসে হঠাৎ তরবারি উন্মুক্ত করে প্রাসাদ রক্ষীদের হত্যা করে। অকস্মাৎ এ আক্রমণে চারদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। প্রাসাদ অরক্ষিত রেখে সকলে প্রাণভয়ে পালিয়ে যায়। ইতোমধ্যে বখতিয়ারের দ্বিতীয় দল নগরের মধ্যে এবং তৃতীয় দল তোরণ-দ্বারে এসে উপস্থিত হয়। সমস্ত নগরী তখন প্রায় অবরুদ্ধ। নাগরিকগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত। এ অবস্থায় রাজা লক্ষণ সেন হতাশ হয়ে পড়েন। শত্রুর আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় নাই দেখে তিনি পিছনের দরজা দিয়ে সপরিবারে খালি পায়ে গোপনে নৌকাযোগে পূর্ববঙ্গে মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অল্পসময়ের মধ্যে বখতিয়ার খলজির পশ্চাৎগামী অবশিষ্ট সৈন্যদলও এসে উপস্থিত হলো। বিনা বাধায় নদীয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল মুসলমানদের অধিকারে আসে। বখতিয়ার খলজির নদীয়া জয়ের সঠিক তারিখ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে বর্তমানে ১২০৪ খ্রিষ্টাব্দই নদীয়া জয়ের সময় হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

অতঃপর বখতিয়ার নদীয়া ত্যাগ করে লক্ষণাবর্তীর (গৌড়) দিকে অগ্রসর হন। তিনি লক্ষণাবর্তী অধিকার করে সেখানেই রাজধানী স্থাপন করেন। লক্ষণাবর্তীই মুসলমান আমলে লখনৌতি নামে পরিচিত হয়। গৌড় জয়ের পর বখতিয়ার আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে বরেন্দ্র বা উত্তর বাংলায় নিজ অধিকার বিস্তার করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, বখতিয়ার খলজি নদীয়া ও গৌড় বিজয়ের পর একটি স্বাধীন রাজ্যের অধিপতি হলেও তিনি সমগ্র বাংলায় আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন নি। পূর্ববঙ্গে লক্ষণ সেনের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা আরও কিছুদিন পূর্ববঙ্গ শাসন করেছিল।

গৌড় বা লখনৌতি বিজয়ের দুই বছর পর বখতিয়ার খলজি তিব্বত অভিযানে বের হন। এ তিব্বত অভিযানই ছিল তাঁর জীবনের শেষ সমর অভিযান। কিন্তু তাঁর এ অভিযান ব্যর্থ হলে তিনি দেবকোটে ফিরে আসেন। এখানে অসুস্থ হয়ে পড়লে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনুমান করা হয় আলি মর্দান নামে একজন আমির তাকে হত্যা করেছিল।

বাংলায় মুসলমান শাসনের ইতিহাসে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বিন-বখতিয়ার খলজির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই এদেশে প্রথম মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ শাসন প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের অধিক স্থায়ী হয়েছিল (১২০৪-১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দ)। রাজ্য জয় করেই বখতিয়ার খলজি ক্ষান্ত ছিলেন না। বিজিত অঞ্চলে তাঁর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যও তিনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সংস্কৃতি বিকাশের জন্য তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁর শাসনকালে বহু মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

বাংলায় তুর্কি শাসনের ইতিহাস

বাংলায় মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা করেন বখতিয়ার খলজি। এ পর্বের প্রথম পর্যায় ছিল ১২০৪ থেকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ যুগের শাসনকর্তাদের পুরোপুরি স্বাধীন বলা যাবে না। এদের কেউ ছিলেন বখতিয়ারের সহযোদ্ধা খলজি মালিক। আবার কেউ কেউ তুর্কি বংশের শাসক। শাসকদের সকলেই দিল্লির সুলতানদের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা হয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে অনেক শাসনকর্তাই দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হতে চেয়েছেন। তবে, এদের বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। দিল্লির আক্রমণের মুখে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। মুসলিম শাসনের এযুগ ছিল বিদ্রোহ-বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ। তাই ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বারানী বাংলাদেশের নাম দিয়েছিলেন 'বুলগাকপুর'। এর অর্থ 'বিদ্রোহের নগরী'।

বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর তাঁর সহযোদ্ধাদের মধ্যে শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। তাঁর সহযোদ্ধা তিনজন খলজি মালিকের নাম জানা যায়। এরা হচ্ছেন– মুহম্মদ শিরান খলজি, আলি মর্দান খলজি এবং হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি। অনেকেরই ধারণা ছিল আলী মর্দান খলজি বখতিয়ার খলজির হত্যাকারী। এ কারণে খলজি আমির ও সৈন্যরা তাঁদের নেতা নির্বাচিত করেন মুহম্মদ শিরান খলজিকে। তিনি কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। আলি মদার্ন খলজিকে বন্দী করা হয়। পরে আলি মদার্ন পালিয়ে যান এবং দিল্লির সুলতান কুবুতউদ্দিনের সহযোগিতা লাভ করেন। শিরান খলজির শাসনকাল মাত্র একবছর স্থায়ী ছিল। এরপর ১২০৮ খ্রিষ্টাব্দে দেবকোটের শাসনকর্তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন হুসামউদ্দিন ইওয়াজ খলজি। দিল্লির সহযোগিতায় দুই বছর পর ফিরে আসেন আলি মর্দান খলজি। ইওয়াজ খলজি স্বেচ্ছায় তাঁর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেন। আলি মর্দান খলজি ১২১০ খ্রিষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজের নাম নেন আলাউদ্দিন আলি মদার্ন খলজি। খুব কঠোর শাসক ছিলেন তিনি। তাই তাঁর বিরুদ্ধে ক্রমে বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। খলজি মালিকরা এক জোট হয়ে বিদ্রোহ করে। এদের হাতে নিহত হন আলি মর্দান খলজি। ইওয়াজ খলজি দ্বিতীয় বার ক্ষমতায় আসেন। তিনি এ পর্যায়ে গিয়াসউদ্দিন ইওয়াজ খলজি নাম নিয়ে স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলা শাসন করেন। ১২১২ থেকে ১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৫ বছর তিনি বাংলার সুলতান ছিলেন।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি

সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি নিঃসন্দেহে খলজি মালিকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। বখতিয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাংলার মুসলমান রাজ্যকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করতে তিনি সচেষ্ট হয়েছিলেন। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তিনি রাজধানী দেবকোট হতে গৌড় বা লখনৌতিতে স্থানান্তর করেন। রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য বসনকোট নামক

স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণ করা হয়। লখনৌতি নদী তীরে অবস্থিত হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা ছিল। তাছাড়া ইওজ খলজি বুঝতে পেরেছিলেন যে শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছাড়া শুধু অশ্বারোহী বাহিনীর পক্ষে নদীমাতৃক বাংলায় রাজ্য সম্প্রসারণ সম্ভব হবে না। বাংলার শাসন বজায় রাখতে হলেও নৌ-বাহিনীর প্রয়োজন ছিল। তাই বলা যায় যে, বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে ইওজ খলজিই নৌ-বাহিনীর গোড়াপত্তন করেছিলেন। রাজধানীর নিরাপত্তার জন্য এর তিন পাশে গভীর ও প্রশস্ত পরিখা নির্মাণ করা হয়। বার্ষিক বন্যার হাত হতে লখনৌতি ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে রক্ষা করার জন্য তিনি বহু খাল খনন ও সেতু নির্মাণ করেন। তিনি রাস্তা নির্মাণ করে সৈন্য ও পণ্য চলাচলের সুবন্দোবস্ত করেন। এ রাজপথ নির্মাণের ফলে রাজ্য শাসন ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরই শুধু সুবিধা হয়নি, বরং দেশের লোকের নিকট আশীর্বাদস্বরূপও ছিল। কারণ, তা বার্ষিক বন্যার কবল হতে তাদের গৃহ ও শস্যক্ষেত্র রক্ষা করত।

উপর্যুক্ত কার্যাবলি গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজিকে একজন সুশাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনি রাজ্য বিস্তারের দিকেও মনোনিবেশ করেন। পার্শ্ববর্তী হিন্দু, যেমন কামরূপ, উড়িষ্যা, বঙ্গ (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা) এবং ত্রিহুতের রাজারা তাঁর নিকট কর পাঠাতে বাধ্য হয়। লখনৌতির দক্ষিণ সীমান্তের লাখনোর শহর শত্রুর কবলে পড়লেও পরে তিনি তা পুনরুদ্ধারে সক্ষম হন। আব্বাসীয় খলিফা আল-নাসিরের নিকট হতে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজি স্বীকৃতিপত্র লাভ করেছিলেন। তখন কোনো মুসলিম শাসক খলিফার স্বীকৃতিপত্র বা ফরমান না পেলে ইসলামে তাকে বৈধ শাসক বলে স্বীকার করা হতো না।

দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশ গিয়াসউদ্দিন ইওজ খলজির অধীনে লখনৌতির (বাংলা) মুসলমান রাজ্যের প্রতিপত্তি বিস্তার কখনও ভালো চোখে দেখেন নি। কিন্তু রাজত্বের প্রারম্ভে আশু বিপদ ও সমস্যার সমাধান করার পূর্বে বাংলার দিকে নজর দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। ১২২৪ খ্রিষ্টাব্দে বিপদসমূহ দূর হলে সুলতান ইলতুৎমিশ বাংলার দিকে দৃষ্টি দেন। ১২২৫ খ্রিষ্টাব্দে মুঙ্গের কিংবা শকরিগলি গিরিপর্বতের নিকট উভয় দলের সৈন্য মুখোমুখি হলে ইওজ খলজি সন্ধির প্রস্তাব করেন। উভয়পক্ষে সন্ধি হয়। ইলতুৎমিশ খুশি হয়ে মালিক আলাউদ্দিন জানিকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং ইওজ খলজিকে বঙ্গের শাসক পদে বহাল রেখে দিল্লিতে ফিরে যান। কিন্তু সুলতান দিল্লিতে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইওজ খলজি পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিহার আক্রমণ করে সেখানকার শাসনকর্তা আলাউদ্দিন জানিকে বিতাড়ন করা হয়।

ইওজ খলজি লখনৌতি ফিরে এসেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ইলতুৎমিশ আবার বাংলা আক্রমণ করবেন। তিনি প্রায় এক বছরকাল প্রস্তুতি নিয়ে রাজধানীতে অবস্থান করেন এবং পাল্টা আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করেন। এ সময় দিল্লির রাজকীয় বাহিনী অযোধ্যার বিদ্রোহ দমনে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইওজ খলজি মনে করলেন এ অবস্থায় দিল্লি বাহিনীর পক্ষে বাংলা আক্রমণ করা সম্ভব হবে না। তাই তিনি এ অবসরে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করার মনস্থ করেন। রাজধানী লক্ষনৌতি একপ্রকার অরক্ষিত অবস্থায় ছিল। এদিকে, সুলতান ইলতুৎমিশ পুত্র নাসিরউদ্দিন মাহমুদকে লখনৌতি আক্রমণের নির্দেশ দেন। ইওজ খলজির অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ বঙ্গের রাজধানী লখনৌতি আক্রমণ করেন। এ সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে ইওজ খলজি অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে রাজধানীতে তাড়াতাড়ি ফিরে আসেন। শত্রুবাহিনী পূর্বেই তাঁর বসনকোট দুর্গ অধিকার করেছিল। যুদ্ধে ইওজ খলজি পরাজিত ও বন্দী হন। পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। ইওজ খলজির পরাজয় ও পতনের ফলে বঙ্গদেশ পুরোপুরিভাবে দিল্লির সুলতানের অধিকারে আসে। নাসিরউদ্দিন মাহমুদ বঙ্গদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

ইওজ খলজি শিল্প ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় গৌড়ের জুমা মসজিদ এবং আরও কয়েকটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। তাঁর আমলে মধ্য এশিয়া হতে বহু মুসলিম সুফি ও সৈয়দ তাঁর দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করে। এ সমস্ত সুফি ও সুধিগণ বঙ্গদেশে ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করেন। তাঁদের আগমন ও ইওজ খলজির পৃষ্ঠপোষকতায় লখনৌতি মুসলিম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইওজ খলজির মৃত্যুর পর থেকে ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ষাট বছর বাংলা দিল্লির মুসলমান শাসকদের একটি প্রদেশে পরিগণিত হয়। এ সময় পনের জন শাসনকর্তা বাংলা শাসন করেন। এদের দশ জন ছিলেন দাস। দাসদের 'মামলুক' বলা হয়। এ কারণে ষাট বছরের বাংলার শাসনকে অনেকে দাস শাসন বা মামলুক শাসন বলে অভিহিত করে। কিন্তু,

এ যুগের পনের জন শাসকের সকলেই তুর্কি বংশের ছিলেন। তুর্কি শাসকদের সময়ে দিল্লিতে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ চলছিল। সুতরাং, বাংলার মতো দূরবর্তী প্রদেশের দিকে সুলতানদের মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ ছিল না। পরিণামে বাংলার তুর্কি শাসকরা অনেকটা স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনা করতেন। বাংলার অর্থাৎ লখনৌতির প্রথম তুর্কি শাসনকর্তা ছিলেন নাসিরউদ্দিন মাহমুদ। তিনি ছিলেন দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের পুত্র। ১২৩৬ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান ইলতুৎমিশের মৃত্যু হলে দিল্লিতে গোলযোগ দেখা যায়। এ সুযোগে আওর খান আইবক লখনৌতির ক্ষমতা দখল করে নেন। কিন্তু, অল্পকাল পরেই বিহারের শাসনকর্তা তুঘরল তুঘান খানের হাতে তাঁর পরাজয় ঘটে। তুঘান খান ১২৪৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ৯ বছর বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন।

১২৪৭ থেকে ১২৫১ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা শাসন করেন জালালউদ্দিন মাসুদ জানি। তিনি লখনৌতিতে শান্তি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হন। পরবর্তী শাসক ছিলেন অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক ইখতিয়ার উদ্দিন ইউজবক। যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করার পর মাসুদ জানি ১২৫৫ খিষ্টাব্দে 'মুঘিসউদ্দিন' উপাধি ধারণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি ১২৫৭ খ্রিষ্টাব্দে নিহত হন। পরবর্তী দুই বছর লখনৌতি স্বাধীনভাবে শাসন করেন মালিক উজ্জউদ্দিন ইউজবক। পরে ১২৬৯ খ্রিষ্টাব্দে কারা প্রদেশের শাসনকর্তা তাজউদ্দিন আরসালান খান লখনৌতির সিংহাসনে বসেন। আরসালান খানের পর বাংলার শাসনকর্তা হন তাতার খান। তিনি দিল্লির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেও কয়েক বছরের মধ্যে দিল্লির সাথে বাংলার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাতার খানের পর অল্পদিনের জন্য বাংলার ক্ষমতার বসেছিলেন শের খান।

পরবর্তী শাসনকর্তা তুঘরিল ছিলেন মামলুক তুর্কিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। উত্তর এবং পশ্চিম বাংলা ছাড়াও ঢাকা এবং ফরিদপুরের বেশ কিছু অঞ্চল তিনি অধিকারে আনেন। সোনারগাঁওয়ের নিকট তিনি নারকিল্লা নামে এক দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের কাছে দুর্গটি তুঘরিলের কিল্লা নামে পরিচিত ছিল। তুঘরিল 'মুঘিসউদ্দিন' উপাধি নিয়ে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ফলে, দিল্লির সুলতান বলবন এ বিদ্রোহের শাস্তি দিতে বাংলা আক্রমণ করেন। ১২৮১ খ্রিষ্টাব্দে বলবনের হাতে পরাজিত ও নিহত হন তুঘরিল। বাংলার শাসনকর্তারা বিদ্রোহ করে এ কারণে বলবন তাঁর ছেলে বুঘরা খানকে বাংলার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন। পরবর্তী ছয় বছর বাংলা দিল্লির অধীনে ছিল। ১২৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বলবনের মৃত্যুর পর বুঘরা খান 'নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ' নাম নিয়ে স্বাধীন সুলতান হিসেবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। এ সময় দিল্লির সুলতান ছিলেন বুঘরা খানের ছেলে কায়কোবাদ।

কায়কোবাদের মৃত্যু সংবাদে বুঘরা খানের মন ভেঙ্গে যায়। তিনি তাঁর অন্য পুত্র রুকনউদ্দিন কায়কাউসকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে নিজে সরে যান। কায়কাউস (১২৯১-১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ) দশ বছর বাংলার শাসক ছিলেন। তাঁর কোনো ছেলে না থাকায় পরবর্তী শাসনকর্তা হন মালিক ফিরুজ ইতগিন। তিনি সুলতান হিসেবে নতুন নাম ধারণ করেন 'সুলতান শামসুদ্দিন ফিরুজ শাহ'। ফিরুজ শাহের মৃত্যু হলে পুত্র গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। অল্পকাল পরেই দিল্লির সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের হাতে তিনি পরাজিত ও বন্দী হন। এরপর থেকে ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দিল্লির অধীনে ছিল।

বাংলায় স্বাধীন সুলতানি শাসনের ইতিহাস

দিল্লির সুলতানগণ ১৩৩৮ থেকে ১৫৩৮ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত দুইশত বছর বাংলাকে তাঁদের অধিকারে রাখতে পারেনি। প্রথমদিকে দিল্লির সুলতানের সেনাবাহিনী আক্রমণ চালিয়েছে। চেষ্টা করেছে বাংলাকে নিজের অধিকারে আনার জন্য। অবশেষে সফল হতে না পেরে হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাই, এ সময়ে বাংলার সুলতানগণ স্বাধীনভাবে এবং নিশ্চিন্তে এদেশ শাসন করতে পেরেছে। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের মাধ্যমে স্বাধীনতার সূচনা হলেও ইলিয়াস শাহি বংশের সুলতানদের হাতে বাংলা প্রথম স্থিতিশীলতা লাভ করে।

স্বাধীন সুলতানি আমল (১৩৩৮ - ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ)

১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা বাহরাম খানের মৃত্যু হয়। বাহরাম খানের বর্মরক্ষক ছিলেন 'ফখরা' নামের একজন রাজকর্মচারী। প্রভুর মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং 'ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ' নাম নিয়ে

সোনারগাঁওয়ের সিংহাসনে বসেন। এভাবেই সূচনা হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের। দিল্লির মুহম্মদ-বিন-তুঘলকের এ সময় বাংলার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার সুযোগ ছিল না। তাই, সোনারগাঁওয়ে স্বাধীনতার সূচনা হলেও ধীরে ধীরে স্বাধীন অঞ্চলের সীমা বিস্তৃত হতে থাকে। পরবর্তী দুইশত বছর এ স্বাধীনতা কেউ কেড়ে নিতে পারেনি।

দিল্লির শাসনকর্তাগণ সোনারগাঁওয়ের ফখরুদ্দিনের স্বাধীনতা ঘোষণাকে সুনজরে দেখেনি। তাই, দিল্লির প্রতিনিধি লখনৌতির শাসনকর্তা কদর খান ও সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা ইজ্জউদ্দিন মিলিতভাবে সোনারগাঁও আক্রমণ করে। কিন্তু তাঁরা সফল হতে পারেনি। কদর খান ফখরুদ্দিনের সৈন্যদের হাতে পরাজিত ও নিহত হন।

একজন স্বাধীন সুলতান হিসেবে ফখরুদ্দিন নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। তাঁর মুদ্রায় খোদিত তারিখ দেখে ধারণা করা যায়, তিনি ১৩৩৮ থেকে ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সোনারগাঁওয়ে রাজত্ব করেন। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ তাঁর রাজসীমা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিছুটা বৃদ্ধি করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জয় করেন। তিনি চাঁদপুর থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত একটি রাজপথ তৈরি করিয়েছিলেন বলে জানা যায়। ১৩৪৯ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁও টাকশাল থেকে ইখতিয়ার উদ্দিন গাজি শাহ নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করা হয়। গাজি শাহের নামাঙ্কিত মুদ্রায় ১৩৫২ খিষ্টাব্দ পর্যন্ত তারিখ পাওয়া যায়। সুতরাং, বোঝা যায়, ফখরুদ্দিন পুত্র গাজি শাহ পিতার মৃত্যুর পর সোনারগাঁওয়ের স্বাধীন সুলতান হিসেবে সিংহাসনে বসেন এবং ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছর রাজত্ব করেন।

একক কাজ ঃ

১. গিয়াস উদ্দিন ইওজ খলজির সঙ্গে দিল্লির সুলতান ইলতুৎমিশের বিরোধের কারণ চিহ্নিত কর।

২. কে, কখন এবং কীভাবে বাংলার স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠা করেন?

ইলিয়াস শাহি বংশ

সোনারগাঁওয়ে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ যখন স্বাধীন সুলতান তখন লখনৌতির সিংহাসন দখন করেছিলেন সেখানকার সেনাপতি আলি মুবারক। সিংহাসনে বসে তিনি 'আলাউদ্দিন আলি শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। লখনৌতিতে তিনিও স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলেন। পরে রাজধানী স্থানান্তর করেন পাণ্ডুয়ায় (ফিরোজাবাদ)। আলি শাহ ক্ষমতায় ছিলেন ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর দুধভাই ছিলেন হাজি ইলিয়াস। তিনি আলি শাহকে পরাজিত ও নিহত করে 'শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ' নাম নিয়ে বাংলায় একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই রাজবংশের নাম ইলিয়াস শাহি বংশ। এরপর ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ অনেক দিন বাংলা শাসন করে। মাঝখানে কিছুদিনের জন্য হিন্দু রাজত্বের উত্থান ঘটেছিল।

১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজাবাদের সিংহাসন অধিকারের মাধ্যমে ইলিয়াস শাহ উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম বাংলার অধিপতি হন। সোনারগাঁও ও সাতগাঁও তখনও তাঁর শাসনের বাইরে ছিল। ইলিয়াস শাহের স্বপ্ন ছিল সমগ্র বাংলার অধিপতি হওয়া। তিনি প্রথম দৃষ্টি দেন পশ্চিম বাংলার দিকে। ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সাতগাঁও তাঁর অধিকারে আসে। ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দে নেপাল আক্রমণ করে বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন। এ সময় তিনি ত্রিহুত বা উত্তর বিহারের কিছু অংশ জয় করে বহু ধনরত্ন হস্তগত করেন। উড়িষ্যাও তাঁর অধিকারে আসে। তবে ইলিয়াস শাহের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ছিল পূর্ব বাংলা অধিকার।

ইখতিয়ার উদ্দিন গাজি শাহ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে সোনারগাঁও-এ ইলিয়াস শাহের হাতে পরাজিত হন। সোনারগাঁও দখলের মাধ্যমে সমগ্র বাংলার অধিকার সম্পন্ন হয়। তাই বলা হয়, ১৩৩৮ খিষ্টাব্দে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ বাংলার স্বাধীনতার সূচনা করলেও প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন ইলিয়াস শাহ ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলার বাইরেও বিহারের কিছু অংশ– চম্পারণ, গোরক্ষপুর এবং কাশী ইলিয়াস শাহ জয় করেছিলেন। কামরূপের কিছু অংশও তিনি জয় করেন। মোটকথা, তাঁর রাজ্যসীমা আসাম হতে বারানসি পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ইলিয়াস শাহ দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজ নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা জারি করায় সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

প্রথম দিকে দিল্লির সুলতান বাংলার এ স্বাধীনতা মেনে নেয়নি। সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলক ১৩৫৩ থেকে ১৩৫৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইলিয়াস শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তাঁর চেষ্টা ছিল বাংলাকে দিল্লির অধিকারে নিয়ে আসা। কিন্তু, তিনি সফল

হননি। ইলিয়াস শাহ দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে বর্ষা এলে জয়ের কোনো সম্ভাবনা নেই, তাই ফিরোজ শাহ সন্ধির মাধ্যমে বাংলার স্বাধীনতাকে মেনে নিয়ে ইলিয়াস শাহের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে দিল্লি ফিরে যান।

শাসক হিসেবে ইলিয়াস শাহ ছিলেন বিচক্ষণ ও জনপ্রিয়। তাঁর শাসনামলে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। হাজিপুর নামক একটি শহর তিনি নির্মাণ করেছিলেন। ফিরুজাবাদের বিরাট হাম্বামখানা তিনিই নির্মাণ করেন। এ আমলে স্থাপত্য শিল্প ও সংস্কৃতি যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। তিনি একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তিনি ফকির-দরবেশদের খুব শ্রদ্ধা করতেন।

ইলিয়াস শাহ লখনৌতির শাসক হিসেবে বঙ্গ অধিকার করলেও দুই ভূখণ্ডকে একত্রিত করে বৃহত্তর বাংলার সৃষ্টি করেছিলেন। এ সময় হতেই বাংলার সকল অঞ্চলের অধিবাসী 'বাঙালি' বলে পরিচিত হয়। ইলিয়াস শাহ 'শাহ-ই বাঙ্গালা' ও 'শাহ-ই-বাঙালিয়ান' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

একক কাজ ঃ সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্রষ্টা হিসেবে মূল্যায়ন কর।

শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ (১৩৫৮-১৩৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সিংহাসনে বসেন। পিতার মতো তিনিও দক্ষ এবং শক্তিশালী শাসক ছিলেন। দিল্লির সুলতান ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫৮ থেকে ১৩৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন। কিন্তু, এবারও ফিরোজ শাহ তুঘলককে ব্যর্থ হতে হয়। পিতার মতো সিকান্দার শাহও একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধির মাধ্যমে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। সন্ধির শর্ত অনুযায়ী জাফর খানকে সোনারগাঁওয়ের শাসন ক্ষমতা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু, জাফর খান এ পদ গ্রহণে রাজি হলেন না। ফিরোজ শাহ তুঘলকের সঙ্গে তিনিও দিল্লিতে ফিরে গেলেন। সোনারগাঁও এবং লখনৌতিতে আবার আগের মতোই সিকান্দার শাহের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ন রইল। ইলিয়াস শাহ যে স্বাধীন সুলতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সিকান্দার শাহ সেভাবেই একে আরও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করতে সক্ষম হন।

সুলতান সিকান্দার শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন 'আজম শাহ' (১৩৯৩-১৪১১ খ্রিষ্টাব্দ) উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন। ইলিয়াস শাহ ও সিকান্দার শাহ যুদ্ধ বিগ্রহ ও স্বাধীনতা রক্ষায় নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের কৃতিত্ব ছিল অন্যত্র। তিনি তাঁর প্রজারঞ্জক ব্যক্তিত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করেছেন। তিনি তাঁর রাজত্বকালে আসামে বিফল অভিযান প্রেরণ করেন। জৌনপুরের রাজা খান জাহানের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। চীনা সম্রাট ইয়াংলো তাঁর দরবারে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। তিনিও শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসেবে চীনা সম্রাটের নিকট মূল্যবান উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মোটকথা, আযম শাহ কোনো যুদ্ধে না জড়ালেও পিতা এবং পিতামহের গড়া বিশাল রাজত্বকে অটুট রাখতে পেরেছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ একজন ন্যায়বিচারক ছিলেন। রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থে তাঁর ন্যায় বিচারের এক অতি উজ্জ্বল কাহিনির বর্ণনা আছে।

সুপন্ডিত হিসেবে সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের যথেষ্ট সুখ্যাতি ছিল। কবি-সাহিত্যিকগণকে তিনি সমাদর ও শ্রদ্ধা করতেন। তিনি কাব্য রসিক ছিলেন এবং নিজেও ফার্সি ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। পারস্যের প্রখ্যাত কবি হাফিজের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হতো।

মুসলমান শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ বঙ্গের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তাঁর রাজত্বাকালেই প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি শাহ্ মুহম্মদ সগীর 'ইউছুফ-জুলেখা' কাব্য রচনা করেন। আযম শাহের রাজত্বকালেই বিখ্যাত সুফি সাধক নূর কুতুব-উল-আলম পাণ্ডুয়ায় আস্তানা গড়ে তোলেন। এ স্থান থেকেই তিনি বাংলার বিভিন্ন জায়গায় ইসলাম ধর্মের প্রচার করে বেড়াতেন। ফলে, পাণ্ডুয়া ইসলাম শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। ধর্মনিষ্ঠ সুলতানের নিকট হতে তিনি সর্বপ্রকার সাহায্য লাভ করেছিলেন। সুলতান মক্কাও মদিনাতেও মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ ছিলেন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সুলতানদের অন্যতম এবং ইলিয়াস শাহি বংশের শেষ সুলতান। তাঁর মৃত্যুর পর হতেই এ বংশের পতন শুরু হয়।

রাজা গণেশ ও হাবসি শাসন

সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে, বাংলার ইতিহাসের দুইশত বছর (১৩৩৮-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) মুসলমান সুলতানদের স্বাধীন রাজত্বের যুগ। তথাপি, এ দুইশ বছরের মাঝামাঝি অল্প সময়ের জন্য কিছুটা বিরতি ছিল। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাইফুদ্দিন হামজা শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু এ সময় অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতা দখল নিয়ে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। তিনি এক বছর শাসন করার পর ১৪১২ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ক্রীতদাস শিহাব উদ্দিনের হাতে নিহত হন।

শিহাব উদ্দিন সুলতান হয়ে নিজের নাম নেন 'শিহাব উদ্দিন বায়াজিদ শাহ'। কিন্তু দুই বছরের মাথায় ১৪১৪-১৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনিও ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে নিহত হন। এ সুযোগে হিন্দু অভিজাত রাজা গণেশ বাংলার ক্ষমতা দখল করেন।

বাংলার সুলতানরা অনেক উচ্চপদেই হিন্দুদের নিয়োগ করতেন। আজম শাহের একজন উচ্চপদস্থ অমাত্য ছিলেন রাজা গণেশ। জানা যায়, গণেশ প্রথমে দিনাজপুরের ভাতুলিয়া অঞ্চলের একজন রাজা ছিলেন। তিনি সুলতানের দরবারে চাকরি নেন। চাকরি নিয়েই তিনি গোপনে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল মুসলমানদের হটিয়ে পুনরায় হিন্দু শক্তির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা। এ লক্ষ্যেই তিনি ইলিয়াস শাহি বংশ উচ্ছেদ করে নিজে ক্ষমতায় বসেন। গণেশ অনেক সুফি সাধককে হত্যা করেন। মুসলমানদের রক্ষা করার জন্য দরবেশদের নেতা নূর কুতুব-উল-আলম জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম শর্কির নিকট আবেদন জানান। ইব্রাহিম শর্কি সসৈন্যে বাংলায় উপস্থিত হলে গণেশ ভয় পেয়ে যান। অবশেষে, তিনি আপোস করেন দরবেশ নূর কুতুব-উল-আলমের সাথে। শর্ত অনুযায়ী গণেশ তাঁর ছেলে যদুকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন এবং ছেলের হাতে বাংলার সিংহাসন ছেড়ে দেন। মুসলমান হওয়ার পর যদুর নাম হয় জালালউদ্দিন মাহমুদ। সুলতান ইব্রাহিম শর্কি জালালউদ্দিনকে সিংহাসনে বসিয়ে ফিরে যান নিজ দেশ জৌনপুরে।

গণেশ দুইবার সিংহাসনে বসেছিলেন। প্রথমবার কয়েক মাস মাত্র ক্ষমতায় ছিলেন। ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দের মাঝামাঝি ইব্রাহিম শর্কি জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহকে সিংহাসনে বসান। ইব্রাহিম শর্কি ফিরে গেলে নিজেকে নিরাপদ মনে করেন গণেশ। তখন জালালউদ্দিনকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দিয়ে পুনরায় নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। অনেক আচার-অনুষ্ঠান করিয়ে ছেলেকে আবার হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে আনেন। গণেশ ১৪১৮ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। রাজা গণেশের মৃত্যুর পর হিন্দু আমাত্যগণ গণেশের পুত্র মহেন্দ্রদেবকে বঙ্গে সিংহাসনে বসান। কিন্তু অতি অল্পকালের মধ্যেই মহেন্দ্রদেবকে অপসারিত করে জালালউদ্দিন দ্বিতীয়বার বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ পর্যায়ে তিনি একটানা ১৪৩১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। এ সুযোগ্য শাসকের সময় বাংলার রাজ্যসীমা অনেক বৃদ্ধি পায়। প্রায় সমগ্র বাংলা এবং আরাকান ব্যতীত ত্রিপুরা ও দক্ষিণ বিহারেরও কিছু অংশ অন্তত সাময়িকভাবে তাঁর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন টাকশাল হতে তাঁর নামে মুদ্রা প্রকাশিত হয়েছিল। পাণ্ডুয়া হতে তিনি গৌড়ে তাঁর রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন।

জালালউদ্দিন মাহমুদ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শামসুদ্দিন আহমদ শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। ১৪৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আহমদ শাহ অমাত্যবর্গের ষড়যন্ত্রে সাদি খান ও নাসির খান নামক ক্রীতদাসের হাতে নিহত হন। এভাবে রাজা গণেশ ও তাঁর বংশধরদের প্রায় ত্রিশ বছরের রাজত্বের অবসান ঘটে।

একক কাজ ঃ

১. সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ শিক্ষা-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন প্রমাণ কর।

২. রাজা গণেশের উত্থানের কারণ বিশ্লেষণ কর।

পরবর্তী ইলিয়াস শাহি বংশের শাসন

শামসুদ্দিন আহমদ শাহের মৃত্যুর পর তার হত্যাকারী ক্রীতদাস নাসির খান বাংলার সিংহাসনে বসেন। কিন্তু, আহমদ শাহকে হত্যা করার ব্যাপারে যে সকল অভিজাতবর্গ ইন্ধন দেয় তারা নাসির খানের সিংহাসনে আরোহণকে খুশি মনে গ্রহণ করতে পারে নি। সম্ভবত ক্রীতদাসের আধিপত্যকে তারা অপমানজনক মনে করেছিল। তাই, তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাসির খানকে হত্যা করে।

নাসির খান নিহত হওয়ার পর গৌড়ের সিংহাসন কিছু সময়ের জন্য শূন্য অবস্থায় পড়ে রইল। আহমদ শাহের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। অতপর অভিজাতবর্গ মাহমুদ নামে ইলিয়াস শাহের এক বংশধরকে ১৪৫২ খিষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসনে বসায়। ইতিহাসে তিনি নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ নামে পরিচিত। ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ এভাবে পুনরায় স্বাধীন রাজত্ব শুরু করে। তাই, এ যুগকে বলা হয় 'পরবর্তী ইলিয়াস শাহি যুগ'। নাসিরউদ্দিন একজন দক্ষ সেনাপতি ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। যশোর ও খুলনা অঞ্চল নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে মুসলমান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছিল। পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও বিহারের কতকাংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি নিজ নামে মুদ্রাও প্রচলন করেছিলেন।

১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহ মৃত্যুবরণ করেন। এরপর তাঁর পুত্র রুকনউদ্দিন বরবক শাহ বাংলার সিংহাসনে বসেন। পিতার রাজত্বকাল থেকেই বরবক শাহ শাসক হিসেবে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তখন তিনি ছিলেন সাতগাঁওয়ের শাসনকর্তা। তাঁর রাজত্বকালে বাংলার রাজ্যসীমা অনেক বৃদ্ধি পায়। গঙ্গা নদীর উত্তরাংশ তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ভাগলপুর তাঁর শাসনকালে মুসলমান সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব নিয়ে গোলযোগ ছিল। বরবক শাহের রাজত্বকালের প্রথম দিকে এটি আরাকান সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। কিন্তু শেষ দিকে বরবক শাহ তা পুনরুদ্ধার করেন। যশোহর ও খুলনা তাঁর অধিকারে ছিল। তিনি দক্ষিণ দিকেও তাঁর রাজ্য বিস্তৃত করেছিলেন।

বরবক শাহই প্রথম অসংখ্য আবিসিনীয় ক্রীতদাস (হাবসি ক্রীতদাস) সংগ্রহ করে সেনাবাহিনী ও রাজপ্রাসাদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। নিয়োগকৃত এ হাবসি ক্রীতাদাসের সংখ্যা ছিল আট হাজার। তিনি সম্ভবত রাজ্যে একটি নিজস্ব দল গঠনের উদ্দেশ্যে এ সকল হাবসিদের নিয়ে বাহিনী গঠন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এ ব্যবস্থা ভবিষ্যতে সাম্রাজ্যের জন্য বিপদ ডেকে নিয়ে আসে।

সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহ একজন মহাপণ্ডিত ছিলেন। বিভিন্ন শিলালিপিতে তাঁর নামের পাশে নিজ নামে এবং বিভিন্ন রাজকীয় 'আল-ফাজিল' ও 'আল-কামিল' এ দুইটি উপাধির উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। এ হতে প্রমাণিত হয় যে, বরবক শাহ শিক্ষা ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উপাধি লাভ করেছিলেন। তিনি শুধু পণ্ডিতই ছিলেন না, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। বৃহস্পতি মিশ্র ছিলেন গীতগোবিন্দটীকা, কুমারসম্ভবটীকা, রঘুবংশটীকা প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' নামক বিখ্যাত বাংলা কাব্যের রচয়িতা মালাধর বসু এ সময়ের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। বাংলা রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস বরবক শাহের অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। এ সময়ের মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে ইব্রাহিম কাইয়ুম ফারুকি, আমির জয়েনউদ্দিন হারাভি, আমির শিহাবউদ্দিন কিরমানি ও মনসুর সিরাজির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে একজন উদার ও অসাম্প্রদায়িক মনের নরপতি ছিলেন তা হিন্দু কবি-পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা ও বহু হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ হতে বুঝা যায়। এদিক দিয়ে বরবক শাহের ন্যায় উদার মনোভাবাপন্ন শাসক শুধু বাংলার ইতিহাসে নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাসেও দুর্লভ।

বরবক শাহ একজন প্রকৃত সৌন্দর্যরসিক ছিলেন। গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা' নামে পরিচিত বিরাট ও সুন্দর তোরণটি বরবক শাহ্ই নির্মাণ করিয়েছিলেন। এ আমলে চট্টগ্রামে এবং পটুয়াখালী জেলার মির্জাগঞ্জে দুইটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ সমস্ত কার্যাক্রম বিবেচনা করলে বঙ্গের সুলতানদের মধ্যে বরবক শাহ্কে অন্যতম বলা যায়।

১৪৭৪ খ্রিষ্টাব্দে বরবক শাহ পরলোক গমন করেন। পরে তাঁর পুত্র সামসুদ্দিন আবু মুজাফফর ইউসুফ শাহ (১৪৭৪-১৪৮১ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সুলতান হন। পিতা ও পিতামহের গড়া বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর সময় অক্ষুণ্ন ছিল। তাঁর রাজ্য পশ্চিমে উড়িষ্যা এবং পূর্বে সিলেট পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

ইউসুফ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সিকান্দার শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে অপসারণ করা হয়। বরবক শাহের ছোট ভাই হুসাইন 'জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ' উপাধি ধারণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৪৮১-১৪৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। কিন্তু, এ সময় রাজদরবারে দুর্যোগ দেখা দেয়। হাবসি ক্রীতদাসরা এ সময় খুব ক্ষমতাশালী হয়ে উঠে। এদের প্রতাপ কমানোর জন্য জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ চেষ্টা করেন।

এতে সমস্ত হাবসি ক্রীতদাস একজোট হয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। সুলতান শাহজাদা ছিলেন প্রাসাদ রক্ষীদলের প্রধান। ক্রীতদাসগণ প্রলোভন দ্বারা সুলতান শাহজাদা ও তার অধীনস্থ পাইকদের নিজ দলভুক্ত করে। শাহজাদা রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে ফতেহ শাহ্‌কে হত্যা করে। ফতেহ শাহ নিহত হলে বাংলার সিংহাসনে ইলিয়াস শাহি বংশের শাসনকালের পরিসমাপ্তি ঘটে। বাংলায় হাবসিদের রাজত্বের সূচনা হয়।

একক কাজ ঃ সুলতান রুকনউদ্দিন বরবক শাহের কোন পদক্ষেপ রাজ্যের জন্য হিতকর ছিল তা অনুসন্ধান কর।

হাবসি শাসন

বাংলার হাবসি শাসন মাত্র ছয় বছর (১৪৮৭-১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ) স্থায়ী ছিল। এ সময় এদেশের ইতিহাস ছিল অন্যায়, অবিচার, বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র আর হতাশায় পরিপূর্ণ। এ সময়ে চারজন হাবসি সুলতানের মধ্যে তিনজনকেই হত্যা করা হয়।

হাবসি নেতা সুলতান শাহজাদা 'বরবক শাহ' উপাধি নিয়ে প্রথম বাংলার ক্ষমতায় বসেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি হাবসি সেনাপতি মালিক আন্দিলের হাতে নিহত হন। মালিক আন্দিল 'সাইফুদ্দিন ফিরুজ শাহ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। একমাত্র তাঁর তিন বছরের রাজত্বকালের (১৪৮৭-১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দ) ইতিহাসই কিছুটা গৌরবময় ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতায় আসেন দ্বিতীয় নাসিরউদ্দিন শাহমুদ শাহ। কিন্তু কিছুকাল (১৪৯০-১৪৯১ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করার পরই তিনি নিহত হন। এক হাবসি সর্দার তাঁকে হত্যা করে 'শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ' নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন (১৪৯১-১৪৯৩ খ্রিষ্টাব্দ)। অত্যাচারী ও হত্যাকারী হিসেবে তার কুখ্যাতি ছিল। ফলে গৌড়ের সম্ভ্রান্ত লোকেরা মুজাফফর শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেন মুজাফফর শাহের উজির সৈয়দ হোসেন। অবশেষে মুজাফফর শাহ নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায় হাবসি শাসনের অবসান ঘটে।

হোসেন শাহি বংশ

হাবসি শাসন উচ্ছেদ করে বাংলার সিংহাসনে বসেন সৈয়দ হোসেন। সুলতান হয়ে তিনি 'আলাউদ্দিন হুসেন শাহ' উপাধি গ্রহণ করেন। এভাবেই বাংলায় 'হুসেন শাহি বংশ' নামে এক নতুন বংশের শাসনপর্ব শুরু হয়। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের মধ্যে হুসেনশাহি আমল (১৪৯৩-১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দ) ছিল সবচেয়ে গৌরবময়।

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ছিলেন হুসেন শাহি যুগের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তিনি আরব দেশীয় সৈয়দ বংশের লোক ছিলেন। পিতা সৈয়দ আশরাফ-আল-হুসাইনি ও ভাই ইউসুফের সাথে তিনি মক্কা হতে বাংলায় আসেন এবং রাঢ়ের চাঁদপাড়া গ্রামে প্রথমে বসবাস শুরু করেন। হুসেন শাহ পরে রাজধানী গৌড়ে যান এবং মুজাফফর শাহের অধীনে চাকরি লাভ করেন। পরে তিনি উজির হন। এভাবেই তিনি বাংলার ক্ষমতায় আসেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব হতে সাম্রাজ্যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। রাজ্যের দায়িত্বভার গ্রহণের পর তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন। হাবসি গোষ্ঠীর দুঃশাসনের ফলে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল। প্রতিটি সুলতানের হত্যার পেছনে তারা প্রধান ভূমিকা পালন করত। সিংহাসন লাভের পর হুসেন শাহ হাবসিদের এরূপ কার্যকলাপ বন্ধ করতে নির্দেশ দেন। কিন্তু তারা তাঁর আদেশ অমান্য করলে তিনি তাদের হত্যার আদেশ দেন। হুসেন শাহের এ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে প্রায় বার হাজার হাবসি প্রাণ হারায়। বাকি হাবসিরা রাজ্য হতে বিতাড়িত হয়।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের পরবর্তী পদক্ষেপ ছিল দেহরক্ষী পাইক বাহিনীর ক্ষমতার বিনাশ। এ পাইক বাহিনী রাজপ্রাসাদের সকল ষড়যন্ত্রের মূলে কাজ করত। হুসেন শাহ পাইকদের দল ভেঙ্গে দেন। তাদের জায়গায় সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমানদের নিয়ে একটি নতুন রক্ষীদল গঠন করেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ রাজ্যের কল্যাণের লক্ষ্যে বঙ্গের রাজনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে হাবসিদের প্রভাবমুক্ত করতে যেমন সচেষ্ট ছিলেন, তেমিন রাজধানী পরিবর্তন করে শাসন ব্যবস্থা দৃঢ় করেন। গৌড় রাজ্যের নিকটবর্তী এক জায়গায় তিনি রাজধানী স্থানান্তর করেছিলেন। বঙ্গের সুলতানদের মধ্যে একমাত্র তিনিই পাণ্ডুয়া বা গৌড় ব্যতীত অন্যত্র রাজধানী স্থাপন

করেন। হাবসি শাসনকালে গোলযোগ সৃষ্টিকারী আমির-ওমরাহদের কঠোর শাস্তির বিধান করা হয়। নিচ বংশজাত অত্যাচারী সকল কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়। তার পরিবর্তে তিনি শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও উচ্চ পদে সৈয়দ, মোঙ্গল, আফগান, হিন্দুদেরকে নিযুক্ত করেন। এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সময় বাংলার রাজ্যসীমা সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায়। তিনি কামরূপ ও কামতা জয় করেন। উড়িষ্যা ও ত্রিপুরা রাজ্যের কিছু অংশও তাঁর করায়ত্ত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারের কিছু অংশও তাঁর অধিকারে আসে।

তিনি আরাকানিদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়ন করেন। এ সময়ে দিল্লির সুলতান সিকান্দার লোদি বাংলা আক্রমণ করলে তিনি তা প্রতিহত করেন। একমাত্র আসাম অভিযানে তিনি সফল হতে পারেন নি। বিশাল রাজ্যে সব রকম নিরাপত্তা বিধানে হুসেন শাহ সফল হয়েছিলেন। তিনি দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে) রাজত্ব করেন। এ সুদীর্ঘ সময় সাফল্যের সাথে রাজ্য পরিচালনা করে এ মহান সুলতান ১৫১৯ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

শ্রীচৈতন্য

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ সুশাসক ও দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ছিলেন। শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং জনকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে তিনি যথেষ্ট উদ্যম, নিষ্ঠা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। রাজার জন্য রাজ্য জয়ই শেষ কথা নয় যুগোপযোগী ও ন্যায়ভিত্তিক শাসনব্যবস্থাও যে অপরিহার্য, তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। শাসনকার্য পরিচালনায় ও প্রজাপালনের ক্ষেত্রে তিনি জাতি ও ধর্মের কোনো পার্থক্য সৃষ্টি করেন নি। হিন্দু ও মুসলমান-উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের দ্বারা একটি সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণমুখী শাসনব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর লক্ষ্য। এজন্য একজন গোঁড়া সুন্নি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিভিন্ন ধর্মের মানুষকে যোগ্যতা অনুসারে শাসনকার্যে নিয়োগ করেছিলেন। হিন্দুদিগকে উৎসাহিত করার জন্য তিনি তাদেরকে বিভিন্ন উপাধিও প্রদান করতেন। হিন্দুদের প্রতি হুসাইন শাহের এ উদারতা সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য নির্বাহের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং বাঙালিদের নিজস্ব ঐতিহ্য সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। এটি তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় বহন করে। হুসেন শাহের এ ধর্মীয় উদারতা তাঁর উত্তরাধিকারীদেরও উৎসাহিত করেছিল। তাঁর শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করত।

হুসেন শাহের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা তৎকালীন সমাজ-জীবনকেও প্রভাবিত করেছিল। তাঁর শাসনকালেই আবির্ভাব ঘটে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীচৈতন্যের। হুসেন শাহ তাঁর প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করতেন এবং তাঁকে ধর্ম প্রচারে সব রকমের সহায়তা করার জন্য কর্মচারীদের প্রতি নির্দেশ দেন। সত্যপীরের আরাধনা হুসেন শাহের শাসনকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সত্যপীরের আরাধনা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি উজ্জ্বল প্রচেষ্টা।

বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হুসেন শাহের শাসনকালকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। হুসেন শাহ যোগ্য কবি ও সাহিত্যিকগণকে উৎসাহিত করার জন্য পুরস্কার প্রদান করতেন। এ যুগের প্রখ্যাত কবি ও লেখকদের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস, পরাগল খান ও যশোরাজ খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন। হুসেন শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁদের নিরলস সাহিত্য-কীর্তি বাংলার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে। এ সময়ে মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভাগবৎ'

ও 'পুরাণ' এবং পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ আরবি ও ফার্সি ভাষারও উদার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

হুসেন শাহ্ একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। নিজ ধর্ম ও সুফি সাধকদের প্রতি তাঁর অপরিসীম নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল। তাঁর রাজত্বকালে দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ সমস্ত মসজিদের মধ্যে গৌড়ের 'ছোট সোনা মসজিদ' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। রাজ্যে ইসলামি সংস্কৃতির বিকাশের জন্য অনেক খানকাহ্ ও মাদ্রাসা নির্মিত হয়েছিল। পাণ্ডুয়ার মুসলমান সাধক কুতুব-উল-আলমের সমাধি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য হুসেন শাহ্ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছিলেন। তিনি গৌড়ে একটি দুর্গ ও তোরণ, মালদহে একটি বিদ্যালয় ও একটি সেতু নির্মাণ করেছিলেন। এ সকল মসজিদ, মাদ্রাসা, দুর্গ, তোরণ হুসেন শাহের স্থাপত্য প্রীতির পরিচয় বহন করে। তাঁর ২৬ বছরের শাসনকালে বঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলার অভাবিত উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এজন্য তাঁর শাসনকালকে বঙ্গের মুসলমান শাসনের ইতিহাসে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

আলাউদ্দিন হুসেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নুসরত শাহ 'নাসিরউদ্দিন আবুল মুজাফফর নুরসত শাহ' (১৫১৯-১৫৩২ খ্রিষ্টাব্দ) উপাধি নিয়ে বাংলার সিংহাসনে বসেন। তাঁর দক্ষতা দেখে হুসেন শাহ্ তাঁর রাজত্বকালেই শাসনকার্যের কিছু কিছু ক্ষমতা নুসরত শাহকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সিংহাসনে বসেও তিনি পিতার মতো দক্ষতা দেখাতে পেরেছিলেন। এ সময় সমগ্র বিহার তাঁর অধীনে আসে। তাঁর সময়ে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর বাংলা অভিযানের জন্য সৈন্য পাঠান। নুসরত শাহ্ প্রথমে বাবরের সাথে মিত্রতা স্থাপন করেন। পরে যুদ্ধ শুরু হলে সন্ধি করে বাংলার সিংহাসনকে নিরাপদ রাখেন। ১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দে নুসরত শাহ্ আততায়ির হাতে নিহত হন।

সুলতান নুসরত শাহ্ তাঁর সময়ের একজন উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন। জনগণের প্রতি তিনি ছিলেন সহনশীল এবং সহৃদয়। প্রজাদের পানিকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি রাজ্যের বহু স্থানে কূপ ও পুকুর খনন করেছিলেন। বাগেরহাটের 'মিঠা পুকুর' আজও তাঁর কীর্তি বহন করছে। নুসরত শাহের মানবিক গুণাবলি তাঁকে প্রজাদের নিকট জনপ্রিয় করে তুলেছিল। হিন্দুরাও তাঁর রাজ্যে সুবিচার লাভ করত। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি এ সময়ের বৈশিষ্ট্য ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পিতার কৃতিত্বকে অম্লান রেখেছিলেন।

নুসরত শাহের শাসনকালের বহু স্থাপত্য-কীর্তি শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় বহন করে। গৌড়ের বিখ্যাত 'কদম রসুল' ভবনের প্রকোষ্ঠে তিনি একটি মঞ্চ নির্মাণ করেন। তাঁর উপর হযরত মুহম্মদের (দঃ) পদচিহ্ন সম্বলিত একটি কালো কারুকার্য খচিত মর্মর বেদি বসানো হয়। গৌড়ের সুবিখ্যাত 'বড় সোনা মসজিদ' বা 'বারদুয়ারি মসজিদ' তাঁর আমলের কীর্তি। বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোট নগর এবং রাজশাহী জেলার বাঘা নামক স্থানে তিনি দুইটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর কার্যসমূহের আর একটি নিদর্শন হলো সাদুল্লাপুরে মহান আউলিয়া মখদুম আখি সিরাজউদ্দিনের গৌরবময় মাজারের ভিত্তি।

নুসরত শাহের আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের কিয়দংশ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর শাসনকালেই শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অশ্বমেধপর্বের বঙ্গানুবাদ করেন। শ্রীধরও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারের জন্য নুসরত শাহ্ দেশের বিভিন্ন স্থানে লাইব্রেরিও স্থাপন করেছিলেন।

বাংলার পরবর্তী সুলতান ছিলেন নুসরত শাহের পুত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ। তিনি প্রায় এক বছর ক্ষমতায় ছিলেন। নুসরত শাহের সময় থেকেই অহোম রাজ্যের সাথে বাংলার সংঘর্ষ চলছিল। ফিরোজ শাহের সময়ও তা অব্যাহত থাকে। নুসরত শাহের সময়কাল থেকেই শুরু হয় বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের পতন পর্ব। নুসরত শাহের উত্তরাধিগণ ছিলেন দুর্বল। তাঁর ছোট ভাই গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ ১৫৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ফিরোজ শাহকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু, তাতে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় নি। বরং নুসরত শাহের শাসনকালে রাজ্যে যে ভাঙনের সূচনা হয়েছিল, মাহমুদ শাহের শাসনকালে তা সম্পূর্ণ হয়। তাঁর পাঁচ বছরের রাজত্বকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা আফগান নেতা শের শাহ্ শূরের সাথে সংঘর্ষ। অবশেষে ১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে শের শাহ্ গৌড় দখল করলে বাংলার দুইশত বছরের স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান ঘটে।

একক কাজ ঃ শাসন-নীতির ক্ষেত্রে আলাউদ্দিন হুসেন শাহের উদারতা দেশের জন্য মঙ্গল বয়ে এনেছিল এ কথার যথার্থতা নিরুপণ কর।

দলীয় কাজ ঃ সুলতান নসরৎ শাহের রাজত্বকালের জনহিতকর কার্যাবলি ও স্থাপত্য কীর্তিসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

আফগান শাসন ও বারভূঁইয়া (১৫৩৮ - ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দ)

১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান হলে একে একে বিদেশি শক্তিসমূহ গ্রাস করতে থাকে বাংলাকে। মুঘল সম্রাট হুমায়ুন অল্প কিছুকাল বাংলার রাজধানীর ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে আফগান নেতা শের শাহের কাছে পরাজয় মানতে হয়। বাংলা ও বিহার সরাসরি চলে আসে আফগানদের হাতে। আফগানদের দুই শাখা-শূর আফগান ও কররানি আফগানরা বেশ কিছুকাল বাংলা শাসন করে। শেষ পর্যন্ত মুঘল সম্রাট আকবর আফগানদের হাত থেকে বাংলার ক্ষমতা কেড়ে নেন। রাজধানী দখল করলেও মুঘলরা বাংলার অভ্যন্তরে অনেক দিন পর্যন্ত প্রকৃত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। এ সময় বাংলায় অনেক বড় বড় স্বাধীন জমিদার ছিল। 'বার ভূঁইয়া' নামে পরিচিত এ সকল জমিদার মুঘলদের অধিকার মেনে নেননি। সম্রাট আকবরের সময় মুঘল সুবাদারগণ 'বার ভূঁইয়াদের' দমন করার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেন নি। 'বার ভূঁইয়াদের' দমন করা হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে।

আফগান শাসন

মুঘল সম্রাট বাবর ও তাঁর পুত্র হুমায়ুন হুসেনশাহি যুগের শেষদিক থেকেই চেষ্টা করেছিলেন বাংলাকে মুঘল অধিকারে নিয়ে আসতে। কিন্তু, আফগানদের কারণে মুঘলদের এ উদ্দেশ্য প্রথম দিকে সফল হয়নি। আফগান নেতা শের খান শূরের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন সম্রাট হুমায়ুন। শের খানের পিতা হাসান খান শূর বিহারে অবস্থিত সাসারাম অঞ্চলের জায়গিরদার ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি জায়গিরদার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। এ সময় বিহারের জায়গিরদার জালাল খান নাবালক বলে তাঁর অভিভাবকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন শের খান।

সমগ্র ভারতের অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন ছিল শের খানের। তাই গোপনে তিনি নিজের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। এ লক্ষ্যে অল্প সময়ের মধ্যে শের খান শক্তিশালী চুনার দুর্গ ও বিহার অধিকার করেন। তিনি ১৫৩৭ খিষ্টাব্দে দুইবার বাংলার রাজধানী গৌড় আক্রমণ করেন। এবার সতর্ক হন দিল্লির মুঘল সম্রাট হুমায়ুন। তিনি শের খানের পিছু ধাওয়া করে বাংলার রাজধানী গৌড় অধিকার করে নেন। গৌড়ের চমৎকার প্রাসাদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে হুমায়ুন এর নামকরণ করেন 'জান্নাতবাদ'। সম্রাট গৌড়ে ৬ মাস আমোদ ফূর্তিতে গা ভাসিয়ে দেন। এ সুযোগে নিজের শক্তি বাড়াতে থাকেন শের খান। দিল্লি থেকে খবর আসে হুমায়ুনের সৎভাই হিন্দাল সিংহাসন দখল করার ষড়যন্ত্র করছেন। এ খবর পেয়ে হুমায়ুন দিল্লির দিকে যাত্রা করেন। এ সুযোগ কাজে লাগান শের খান। তিনি ওঁত পেতে থাকেন বক্সারের নিকট চৌসা নাম স্থানে। গঙ্গা নদীর তীরে এ স্থানে হুমায়ুন পৌঁছালে শের খান তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। অপ্রস্তুত হুমায়ুন পরাজিত হন (১৫৩৯ খ্রিষ্টাব্দ)।

মুঘল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে শের খান 'শের শাহ' উপাধি নেন। তিনি নিজেকে বিহারের স্বাধীন সুলতান হিসেবে ঘোষণা করেন। এবার বাংলার দিকে দৃষ্টি দেন তিনি। ১৫৪০ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল শাসনকর্তা আলী কুলিকে পরাজিত করে তিনি বাংলা দখল করেন। এ বছরই তিনি হুমায়ুনকে কনৌজের নিকট বিলগ্রামের যুদ্ধে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন অধিকার করেন। এভাবে দীর্ঘদিন পর বাংলা আবার দিল্লির শাসনে চলে আসে। চট্টগ্রাম ও সিলেট পর্যন্ত সমগ্র বাংলাদেশ শের শাহের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। শের শাহ শূর -বংশের বলে এ সময়ের বাংলার শাসন ছিল শূর আফগান বংশের শাসন।

শের শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জালাল খান 'ইসলাম খান' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি আট বছর (১৫৪৫-১৫৫৩ খ্রিষ্টাব্দ) রাজত্ব করেন। কিন্তু, ইসলাম খানের মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র ফিরোজ খানের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে সূর বংশের মধ্যে দলাদলি শুরু হয়। শের খানের ভাগ্নে মুবারিজ খান ফিরোজ খানকে হত্যা করে 'মুহম্মদ আদিল' নাম ধারণ করে দিল্লির সিংহাসনে বসেন।

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাবলি হতে এ সময় বাংলা বিচ্ছিন্ন ছিল না। তাই ইসলাম খানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার আফগান শাসক মুহম্মদ খান সূর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। উপাধি ধারণ করেন 'মুহম্মদ শাহ শূর'। এ সময় হতে পরবর্তী বিশ বছর পর্যন্ত বাংলা স্বাধীন ছিল। মুহম্মদ শাহ সূর উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে মুহম্মদ আদিল শাহ সূরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। তিনি জৌনপুর জয় করে আগ্রার দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি পরাজিত ও নিহত হন।

মুহম্মদ শাহ সূর নিহত হলে দিল্লির বাদশাহ আদিল শাহ শাহবাজ খানকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুহম্মদ শাহের পুত্র খিজির খান তখন এলাহাবাদে অবস্থান করছিলেন। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ' উপাধি গ্রহণ করে নিজেকে বাংলার স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করেন। কিছুদিন পর তিনি শাহবাজ খানকে পরাজিত করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন।

এ সময় দিল্লির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে হয়ে উঠে। শের শাহের বংশধরদের দুর্বলতার সুযোগে মুঘল বাদশাহ হুমায়ুন স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু, দিল্লিতে তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলায় মুঘল আধিপত্য বিস্তার করার সুযোগ পেলেন না। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র আকবর দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করে শূর বংশীয় আফগান নেতৃবৃন্দকে একে একে দমন করার জন্য অগ্রসর হলেন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) আদিল শাহের সেনাপতি হিমু মুঘল সৈন্যদের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। এতে আদিল শাহ অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন। অতঃপর তিনি বাংলার দিকে পলায়ন করলেন। পথিমধ্যে সুরজগড়ের নিকটবর্তী ফতেহপুরে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ কর্তৃক এক যুদ্ধে ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দে আদিল শাহ পরাজিত ও নিহত হন।

বাংলা বিজয়ী আফগান সুলতান গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহ জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হলে মুঘল সেনাপতি খান-ই-জামান তাঁর গতিরোধ করেন। কূটকুশলী বাহাদুর শাহ খান-ই-জামানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে বাংলায় প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর তিনি বাংলার বাইরে আর কোনো অভিযান প্রেরণ করেন নি। ১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

গিয়াসউদ্দিন বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা জালালউদ্দিন শূর 'দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন' উপাধি গ্রহণ করে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও তাঁর ভ্রাতার ন্যায় মুঘলদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতেন। ১৫৬৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তাঁর একমাত্র পুত্র বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর নাম জানা যায় নি। মাত্র সাত মাস রাজত্ব করার পর তৃতীয় গিয়াসউদ্দিন নামে জনৈক আফগান দলনেতা তাঁকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিনিও বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেন নি। কররানি বংশের রাজা তাজ খান কররানি গিয়াসউদ্দিনকে হত্যা করে বাংলার সিংহাসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

তাজ খান কররানি ও সুলায়মান খান কররানি শের শাহের সেনাপতি ছিলেন। কনৌজের যুদ্ধে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য শের শাহ তাদেরকে দক্ষিণ বিহারে জায়গির প্রদান করেন। ইসলাম শাহের রাজত্বকালে তাজ খান কররানি সেনাপতি ও কূটনৈতিক পরামর্শদাতা হিসেবে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইসলাম শাহের বালকপুত্র ও উত্তরাধিকারী ফিরোজের সময় তাজ খান উজির নিযুক্ত হন। ফিরোজকে হত্যা করে তাঁর মামা মুহম্মদ আদিল সূর সিংহাসনে বসেন। এ সময় তাজ খান কররানি পালিয়ে গিয়ে ভ্রাতাদের সহায়তায় দক্ষিণ বিহারে প্রাধান্য স্থাপন করেন। ১৫৫৭ খ্রিষ্টাব্দে তাজ খান কররানি নামমাত্র বাংলার সুলতান বাহাদুর শাহ শূরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিছুদিন পর তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে পড়েন।

বাংলার সিংহাসনের প্রতিও তাঁর দৃষ্টি ছিল। তিনি সুযোগের অন্বেষণে ছিলেন। অজ্ঞাতনামা গিয়াসউদ্দিন যখন শূর বংশের সিংহাসন দখল করেন তখন সুযোগ বুঝে তাজ খান ও তাঁর ভ্রাতারা গিয়াসউদ্দিনকে পরাজিত ও নিহত করে গৌড় দখল করেন। এভাবে তাজ খান কররানি বাংলায় কররানি বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

তাজ খান কররানির মৃত্যুর পর ১৫৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ভাই সুলায়মান খান কররানি বাংলার সুলতান হন। এ দক্ষ শাসক আফগান নেতাদের তাঁর দলভুক্ত করেন। এভাবে বাংলা ও বিহারের অধিকাংশ এলাকা তাঁর অধিভুক্ত হয়। উড়িষ্যাতেও

তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সোলায়মান কররানির বিজ্ঞ উজির লোদি খানের পরামর্শে তিনি মুঘল সম্রাট আকবরের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলছিলেন। তিনি সর্বপ্রথম গৌড় হতে মালদহের ১৫ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তাণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তর করেন। ১৫৭২ খিষ্টাব্দে সোলায়মান কররানির মৃত্যু হলে পুত্র বায়জিদ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই এ অত্যাচারী সুলতানকে হত্যা করেন আফগান সর্দাররা। এবার সিংহাসনে বসেন সোলায়মান কররানির দ্বিতীয় পুত্র দাউদ কররানি। তিনিই ছিলেন বাংলায় শেষ আফগান শাসক। দাউদ কররানি খুব অদূরদর্শী শাসক ছিলেন। বিশাল রাজ্য ও ধন ঐশ্বর্য দেখে তিনি নিজেকে সম্রাট আকবরের সমকক্ষ ভাবতে থাকেন। এতদিন বাংলা ও বিহারের আফগান শাসকগণ প্রকাশ্যে মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতেন। কিন্তু দাউদ স্বাধীন সম্রাটের মতো 'বাদশাহ' উপাধি গ্রহণ করেন এবং নিজ নামে খুৎবা পাঠ করেন ও মুদ্রা প্রচলন করেন।

আফগানরা এমনিতেই মুঘলদের শত্রু ছিল। তার ওপর বাংলা-বিহার মুঘলদের অধিকারে না থাকায় সম্রাট আকবরের স্বস্তি ছিল না। দাউদ কররানির স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে আকবর ক্ষুব্ধ হন। প্রথমে আকবর জৌনপুরের শাসনকর্তা মুনিম খানকে নির্দেশ দেন কররানি রাজ্য আক্রমণ করতে। প্রথমদিকে সরাসরি আক্রমণ করেন নি মুনিম খান। উজির লোদি খানের সাথে মুনিম খানের বন্ধুত্ব ছিল। দাউদ খান কররানি তাঁর উজির লোদির পরামর্শে মুনিম খানের সাথে ধনরত্ন দিয়ে আপোষ করেন। কিন্তু অচিরেই এ অবস্থার পরিবর্তন হয়। দাউদ খান কিছু ষড়যন্ত্রকারীর পরামর্শে ভুল বোঝেন উজির লোদিকে। দাউদ খানের নির্দেশে হত্যা করা হয় তাঁকে। লোদির বুদ্ধি আর বন্ধুত্বের গুণেই এতদিন মুঘল আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল বাংলা ও বিহার। তাঁর অনুপস্থিতিতে মুনিম খানের বাংলা ও বিহার আক্রমণে আর বাঁধা রইল না। মুনিম খান তার বন্ধু লোদির মৃত্যুর পর ১৫৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বিহার থেকে আফগানদের হটিয়ে দেন। আফগানরা ইতোমধ্যে নিজেদের ভেতর বিবাদ করে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। এ সুযোগে মুনিম খান বাংলার দিকে অগ্রসর হন। কররানিদের বাংলার রাজধানী ছিল তাণ্ডায়। আফগানরা বাংলার রাজধানী তাণ্ডা ছেড়ে পিছু হটে। আশ্রয় নেয় হুগলি জেলার সপ্তগ্রামে। মুনিম খানের নেতৃত্বে রাজধানী অধিকার করে মুঘল সৈন্যরাও অগ্রসর হয় সপ্তগ্রামে। দাউদ খান পালিয়ে যান উড়িষ্যায়। মুনিম খান তাণ্ডায় বাংলার মুঘল রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় তাণ্ডায় প্লেগ রোগ দেখা দিলে মুনিম খানসহ অনেক মুঘল সৈন্য এ রোগে মারা যান। ফলে বাংলায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ অবস্থার সুযোগে দাউদ কররানি পশ্চিম ও উত্তর বাংলা পুনরায় অধিকার করে নেন। অন্যদিকে ভাটি অঞ্চলের জমিদার ঈসা খান পূর্ব বাংলা থেকে মুঘল সৈন্যদের হটিয়ে দেন। মুঘল সৈন্যরা এবার বাংলা ছেড়ে বিহারে আশ্রয় নেয়।

মুনিম খানের মৃত্যু সংবাদ আগ্রায় পৌঁছালে সম্রাট আকবর বাংলার শাসনকর্তা করে পাঠান খান জাহান হুসেন কুলি খানকে। তাঁর সহকারী নিযুক্ত হন রাজা টোডরমল। বাংলায় প্রবেশ পথে রাজমহলে মুঘল সৈন্যদের বাঁধা দেন দাউদ কররানি। মুঘলদের সাহায্যে এগিয়ে আসেন বিহারের শাসনকর্তা মুজাফফর খান তুরবাতি। ১৫৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজমহলের নিকট মুঘল ও আফগানদের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ কররানির চূড়ান্ত পরাজয় ঘটে। পরে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এভাবে বাংলায় কররাণি (আফগান) শাসনের অবসান ঘটিয়ে মুঘল শাসনের সূত্রপাত হয়। অবশ্য 'বার ভূঁইয়াদের' বাঁধার মুখে মুঘল শাসন বেশি দূর বিস্তৃত হতে পারেনি।

একক কাজ ঃ বাংলায় আফগান শাসন কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর।

বার ভূঁইয়াদের ইতিহাস

সম্রাট আকবর সমগ্র বাংলার উপর তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। বাংলার বড় বড় জমিদার মুঘলদের অধীনতা মেনে নেননি। জমিদারগণ তাঁদের নিজ নিজ জমিদারিতে স্বাধীন ছিলেন। এদের শক্তিশালী সৈন্য ও নৌ-বহর ছিল। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এঁরা একজোট হয়ে মুঘল সেনাপতির বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বাংলার ইতিহাসে এ জমিদারগণ 'বার ভূঁইয়া' নামে পরিচিত। এ 'বার' বলতে বারজনের সংখ্যা বুঝায় না। ধারণা করা হয় অনির্দিষ্ট সংখ্যক জমিদারদের বোঝাতেই 'বার' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলার ইতিহাসে বার ভূঁইয়াদের আবির্ভাব ষোল শতকের মাঝামাঝি হতে সতের শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। আলোচ্য সময়ে মুঘলদের বিরুদ্ধে যাঁরা নিজেদের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তাঁরাই 'বার ভূঁইয়া'।

এছাড়াও, বঙ্গদেশে আরও অনেক ছোটখাট জমিদার ছিলেন। তাঁরাও মুঘলদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ান। কিন্তু পরে এঁরা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেন। বার ভূঁইয়াদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

বার ভূঁইয়াদের নাম	এলাকার নাম
ঈসা খান, মুসা খান	ঢাকা জেলার অর্ধাংশ, প্রায় সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং পাবনা, বগুড়া ও রংপুর জেলার কিছু অংশ।
চাঁদ রায় ও কেদার রায়	শ্রীপুর (বিক্রমপুর, মুন্সীগঞ্জ)
বাহাদুর গাজি	ভাওয়াল
সোনা গাজি	সরাইল (ত্রিপুরার উত্তর সীমায়)
ওসমান খান	বোকাইনগর (সিলেট)
বীর হামির	বিষ্ণুপুর (বাকুড়া)
লক্ষণ মাণিক্য	ভুলুয়া (নোয়াখালী)
পরমানন্দ রায়	চন্দ্রদ্বীপ (বরিশাল)
বিনোদ রায়, মধু রায়	চান্দপ্রতাপ (মানিকগঞ্জ)
মুকুন্দরাম, সত্যজিৎ	ভূষণা (ফরিদপুর)
রাজা কন্দর্পনারায়ণ, রামচন্দ্র	বরিশাল জেলার অংশ বিশেষ

প্রথম দিকে বার ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন ঈসা খান। হুসেন শাহি বংশের অবসান হলে ঈসা খানের পিতা সোলায়মান খান সোনারগাঁও অঞ্চলে জমিদারি প্রতিষ্ঠা করেন। খিজিরপুর দুর্গ ছিল তাঁর শক্তির প্রধান কেন্দ্র। সোনারগাঁও ও খিজিরপুরের নিকটবর্তী কাত্রাবু তাঁর রাজধানী ছিল। দাউদ কররানির পতনের পর তিনি সোনারগাঁও-এ রাজধানী স্থাপন করেন।

বার ভূঁইয়াদের দমন করার জন্য সম্রাট আকবর বিশেষ মনোযোগ দেন। এজন্য তিনি ১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে শাহবাজ খান, ১৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সাদিক খান, ১৫৮৬ খ্রিষ্টাব্দে উজির খান ও ১৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজা মানসিংহকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। তাঁরা ঈসা খাঁন ও অন্যান্য জমিদারের সাথে বহুবার যুদ্ধ করেন। কিন্তু বার ভূঁইয়াদের নেতা ঈসা খানকে সম্পূর্ণ পরাজিত করা সম্ভব হয়নি। তিনি সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকারের বিনিময়ে নিজের আধিপত্য বজায় রাখেন। অন্যদিকে তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে 'মসনদ-ই-আলা' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

১৫৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ঈশা খানের মৃত্যু হলে বার ভূঁইয়াদের নেতা হন তাঁর পুত্র মুসা খান। এদিকে ১৬০১ খিষ্টাব্দে মানসিংহকে দ্বিতীয়বারের মতো বাংলায় পাঠানো হয়। এবার মানসিংহ কিছুটা সফল হন। ১৬০৩ খ্রিষ্টাব্দে মুসা খান এক নৌ-যুদ্ধে মানসিংহের হাতে পরাজিত হন। কিন্তু, চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করার আগে সম্রাট আকবরের অসুস্থতার খবর আসে। সম্রাটের ডাকে মানসিংহ আগ্রায় ফিরে যান।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সেলিম 'জাহাঙ্গীর' নাম ধারণ করে ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মানসিংহকে আবার বাংলায় প্রেরণ করেন। এক বছর পর ১৬০৬ খ্রিষ্টাব্দে কুতুব উদ্দিন কোকাকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করা হয়। কুতুব উদ্দিন শের আফকুনের হাতে প্রাণ হারান। তাঁর পরবর্তী সুবাদার জাহাঙ্গীর কুলি খান এক বছর পর মারা যান। এর পর ইসলাম খান ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গের সুবাদার নিযুক্ত হন।

বাংলার বার ভূঁইয়াদের দমন করে এদেশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের কৃতিত্বপূর্ণ কাজ। আর এ কৃতিত্বের দাবিদার সুবাদর ইসলাম খান (১৬০৮-১৬১৩ খ্রি:)। শাসনভার গ্রহণ করেই তিনি বুঝতে পারেন যে, বার ভূঁইয়াদের নেতা মুসা খানকে দমন করতে পারলেই তাঁর পক্ষে অন্যান্য জমিদারদেরকে বশীভূত করা সহজ হবে। সেজন্য

তিনি রাজমহল হতে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কারণ মুসা খানের ঘাঁটি সোনারগাঁও ঢাকার অদূরে ছিল। বাংলার রাজধানী রাজমহল থেকে ঢাকায় আসার পথে ইসলাম খান কয়েকজন জমিদারের আনুগত্য লাভ করেছিলেন।

বার ভূঁইয়াদের মোকাবেলা করার জন্য ইসলাম খান শক্তিশালী নৌ-বহর গড়ে তোলেন। মুসা খানের সাথে প্রথম সংঘর্ষ বাঁধে ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দে করতোয়া নদীর পূর্বতীরে যাত্রাপুরে। এখানে মুসা খানের দুর্গ ছিল। যুদ্ধে মুসা খান ও অন্যান্য জমিদার শেষ পর্যন্ত পিছু হটেন। ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় প্রবেশ করেন। এ সময় থেকে ঢাকা হয় বাংলার রাজধানী। সম্রাটের নাম অনুসারে ঢাকার নাম রাখা হয় 'জাহাঙ্গীর নগর'।

এরপর পুনরায় মুসা খানের নেতৃত্বে মুঘলদের বাঁধা দেওয়ার জন্য জমিদারদের নৌ-বহর একত্রিত হয় শীতলক্ষ্যা নদীতে। ইসলাম খান এর পশ্চিম তীরের বিভিন্ন স্থানে সৈন্য ও নৌ-বহর প্রেরণ করেন। ১৬১১ খ্রিষ্টাব্দে ইসলাম খানের সঙ্গে জমিদারদের যুদ্ধ শুরু হয়। নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত মুসা খানের কদম রসুল দুর্গসহ অন্যান্য দুর্গ মুঘলদের অধিকারে আসে। অবস্থার বিপর্যয়ে মুসা খান সোনারগাঁও চলে আসেন। রাজধানী নিরাপদ নয় মনে করে তিনি মেঘনা নদীতে অবস্থিত ইব্রাহিমপুর দ্বীপে আশ্রয় নেন। মুঘল সৈন্যরা সোনারগাঁও অধিকার করে নেন। এর ফলে জমিদারগণ বাধ্য হন আত্মসমর্পণ করতে। কোন উপায় না দেখে মুসা খানও শেষ পর্যন্ত মুঘলদের নিকট আত্মসমর্পণে বাধ্য হন। ইসলাম খান মুসা খানকে অন্যান্য জমিদারদের মতো মুঘলদের অধীনস্থ জায়গিরের দায়িত্ব দিলেন। এরপর মুসা খান সম্রাটের অনুগত জায়গিরদার হিসেবে বাকি জীবন অতিবাহিত করেন। মুসা খানের আত্মসমর্পণে অন্যান্য জামিদারগণ নিরাশ হয়ে মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। এভাবে, বাংলার বার ভূঁইয়াদের শাসনের অবসান ঘটে।

জোড়ায় কাজ ঃ ১. নিম্নে উল্লেখিত ছকে 'বার ভূঁইয়াদের' নাম ও সঠিক অঞ্চল মিল কর (৫টি) :

২. ঢাকার নাম কীভাবে 'জাহাঙ্গীর নগর' হয়েছিল-অনুসন্ধান কর।

৩. রাজমহল থেকে সুবাদার ইসলাম খানের ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তরের কারণ অনুসন্ধান কর।

ক্রমিক নং	বার ভূঁইয়াদের নাম	অঞ্চল
১		

মুঘল শাসন (১৫৭৬-১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)

সুবাদারি ও নবাবি– এ দুই পর্বে বাংলায় মুঘল শাসন অতিবাহিত হয়। বার ভূঁইয়াদের দমনের পর সমগ্র বাংলায় সুবাদারি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুঘল প্রদেশগুলো 'সুবা' নামে পরিচিত ছিল। বাংলা ছিল মুঘলদের অন্যতম সুবা। সতের শতকের প্রথম দিক থেকে আঠার শতকের শুরু পর্যন্ত ছিল সুবাদারি শাসনের স্বর্ণযুগ। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর দিল্লির দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়ে মুঘল শাসন শক্তিহীন হয়ে পড়ে। এ সুযোগে বাংলার সুবাদারগণ প্রায় স্বাধীনভাবে বাংলা শাসন করতে থাকেন। মুঘল আমলের এই যুগ 'নবাবি আমল' নামে পরিচিত।

সুবেদারি ও নবাবি আমল

সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে বার ভূঁইয়াদের দমন করে সমগ্র বাংলায় সুবাদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬১৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর বেশ কয়েকজন সুবাদার বাংলার ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তবে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে সুবাদার মির জুমলা ক্ষমতা গ্রহণ করার পূর্ব পর্যন্ত কোন সুবাদারই তেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে ইসলাম খান চিশতি (১৬১৭-১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ) এবং দিল্লির সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের ভাই ইব্রাহিম খান ফতেহ জঙ্গ (১৬১৭-১৬২৪ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সুবাদার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর খুব অল্প সময়ের জন্য সুবাদার নিয়ুক্ত হন দারার খান, মহব্বত খান, মুকাররম খান এবং ফিতাই খান।

সম্রাট শাহজাহান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর বাংলার সুবাদার হিসেবে কাসিম খান জুয়িনীকে নিয়োগ করেন ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে। হুসেন শাহি যুগ হতেই বাংলায় পর্তুগিজরা বাণিজ্য করত। এ সময় পর্তুগিজ বণিকদের প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায়। ক্রমে তা বাংলার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। কাসিম খান জুয়িনী শক্ত হাতে পর্তুগিজদের দমন করেন।

কাসিম খানের পর সুবাদার ইসলাম খান মাসহাদি (১৬৩৫-১৬৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) চার বছর শাসন করেন। অতঃপর শাহজাহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজাকে বাংলার সুবাদার করে পাঠান। সুজা কুড়ি বছর দায়িত্বে ছিলেন। মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল সুজার শাসনকাল। বিদেশি বণিক গোষ্ঠীর মধ্যে ইংরেজরা এ সময় সুবাদারের কাছ থেকে কিছু বাড়তি সুবিধা লাভ করছিল। এতে বাণিজ্যের পাশাপাশি ইংরেজদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। ১৬৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁর চার পুত্রের প্রত্যেকেই সম্রাট হওয়ার জন্য বিদ্রোহ করে। এ সময় আওরঙ্গজেবের সাথে শাহ সুজার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। দুই ভাইয়ের যুদ্ধে ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে শাহ সুজা পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে তিনি আরাকান গমন করেন। সেখানে পরে তিনি সপরিবারে নিহত হন।

আওরঙ্গজেবের সেনাপতি মির জুমলা সুজাকে দমন করার জন্য বাংলার রাজধানী জাহাঙ্গীরনগর পর্যন্ত এসেছিলেন। তাই সম্রাট আওরঙ্গজেব মীর জুমলাকে (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সুবাদারের দায়িত্ব দেন। কুচবিহার এবং আসাম বিজয় ও মির জুমলার সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর সময়েই কুচবিহার সম্পূর্ণরূপে প্রথমবারের মতো মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। আসাম অভিযানের দ্বারা তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্ত আসাম পর্যন্ত বর্ধিত করেন।

মির জুমলার মৃত্যুর পর প্রথমে দিলির খান ও পরে দাউদ খান অস্থায়ী সুবাদার হিসেবে বাংলা শাসন করেন। অতঃপর আওরঙ্গজেবের মামা শায়েস্তা খানকে (১৬৬৪-১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলার সুবাদার নিয়োগ দেওয়া হয়।

শায়েস্তা খান

শায়েস্তা খান ছিলেন একজন সুদক্ষ সেনাপতি ও দূরদর্শী শাসক। তিনি মগদের উৎপাত হতে বাংলার জনগণের জানমাল রক্ষা করেন। তিনি সন্দ্বীপ ও চট্টগ্রাম অধিকার করে আরাকানি জলদস্যুদের সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করেন। সুবাদার শায়েস্তা খান কুচবিহার, কামরূপ, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে মুঘল শাসন সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠা করেন। সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তারও ব্যবস্থা করা হয়।

তাঁর ভয়ে আসামের রাজা মুঘলদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করতে সাহস পাননি। সুবাদারির শেষ দিকে শায়েস্তা খানের সাথে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধ বাধে।

ইংরেজদের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি পেতে থাকে যে তারা ক্রমে এদেশের জন্য হুমকি হিসেবে দেখা দেয়। দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর শায়েস্তা খান বাংলা থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করেন। শায়েস্তা খানের পর একে একে খান-ই-জাহান বাহাদুর, ইব্রাহিম খান ও আজিমুদ্দিন বাংলার সুবাদার হন। তাঁদের সময় বাংলার ইতিহাস তেমন ঘটনাবহুল ছিল না।

শায়েস্তা খান তাঁর শাসন আমলের বিভিন্ন জনহিতকর কাজের জন্য স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। তাঁর সময়ে সাম্রাজ্যের সর্বত্র অসংখ্য সরাইখানা, রাস্তা ও সেতু নির্মিত হয়েছিল। দেশের অর্থনীতি ও কৃষি ক্ষেত্রে তিনি অভাবিত সমৃদ্ধি আনয়ন করেছিলেন। জনকল্যাণকর শাসনকার্যের জন্য শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর সময়ে দ্রব্য মূল্য এত সস্তা ছিল যে, টাকায় আট মণ চাউল পাওয়া যেত।

শায়েস্তা খানের আমলে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূলে ছিল শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার। এ আমলে কৃষি কাজের সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়। শায়েস্তা খান ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশি বণিকদের উৎসাহিত করতেন।

শায়েস্তা খানের শাসনকাল বাংলার স্থাপত্য শিল্পের জন্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র সৌধমালা, মনোরম সাজে সজ্জিত তৎকালীন ঢাকা নগরী স্থাপত্য শিল্পের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করে। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করা যায়। তাঁর আমলে নির্মিত স্থাপত্য কর্মের মধ্যে ছোট কাটরা, লালবাগ কেল্লা, বিবি পরির সমাধি-সৌধ, হোসেনি দালান, সফি খানের মসজিদ, বুড়িগঙ্গার মসজিদ, চক মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মোটকথা, অন্য কোনো সুবাদার বা শাসনকর্তা ঢাকায় শায়েস্তা খানের ন্যায় নিজের স্মৃতিকে এত বেশি জ্বলন্ত রেখে যেতে পারেননি। বস্তুত ঢাকা ছিল শায়েস্তা খানের নগরী।

মুর্শিদ কুলি খান

দক্ষ সুবাদার হিসাবে এবার বাংলার ক্ষমতায় আসেন মুর্শিদ কুলি খান (১৭০০-১৭২৭ খ্রিষ্টাব্দ)। প্রথমে তাঁকে বাংলার দেওয়ান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। দেওয়ানের কাজ ছিল সুবার রাজস্ব আদায় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা। সম্রাট ফখরুখ শিয়ারের রাজত্বকালে মুর্শিদ কুলি খান বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হন। মুর্শিদ কুলি খান যখন বাংলায় আগমন করেন তখন বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। এ পরিস্থিতির মুখে তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত বাংলায় মুঘল শাসন পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। স্বীয় ব্যক্তিত্ব, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা তিনি বাংলার ইতিহাসের গতিকে পরিবর্তন করেছিলেন।

সম্রাট আওঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দুর্বল মুঘল সম্রাটগণ দূরবর্তী সুবাগুলোর দিকে তেমন দৃষ্টি দিতে পারেন নি। ফলে, এসব অঞ্চলের সুবাদারগণ অনেকটা স্বাধীনভাবে নিজেদের অঞ্চল শাসন করতে থাকেন। মুর্শিদ কুলি খানও অনেকটা স্বাধীন হয়ে পড়েন। তিনি সম্রাটের নামমাত্র আনুগত্য প্রকাশ করতেন এবং বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব পাঠাতেন। মুর্শিদ কুলি খানের পর তাঁর জামাতা সুজা উদ্দিন খান বাংলার সিংহাসনে বসেন। এভাবে, বাংলার সুবেদারি বংশগত হয়ে পড়ে। আর এরই পথ ধরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলার স্বাধীন শাসন।

নবাব মুর্শিদ কুলি খানের সময় থেকেই বাংলা সুবা প্রায় স্বাধীন হয়ে পড়ে। এ সময় সুবাকে বলা হতো 'নিজামত' আর সুবাদারের বদলে পদবি হয় 'নাজিম'। নাজিম পদটি হয়ে পড়ে বংশগত। সুবাদার বা নাজিমগণ বাংলার সিংহাসনে বসে মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে শুধু একটি অনুমোদন নিয়ে নিতেন। তাই, আঠারো শতকের বাংলায় মুঘল শাসনের ইতিহাস নিজামত বা নবাবি আমলরূপে পরিচিত। আর প্রায় স্বাধীন শাসকগণ পরিচিত হন 'নবাব' হিসেবে।

রাজস্ব সংস্কার মুর্শিদ কুলি খানের সর্বাধিক স্মরণীয় কীর্তি। তিনি ভূমি জরিপ করে রায়তদের সামর্থ্য অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করেছিলেন। রাজস্ব আদায়কে নিশ্চিত ও নিয়মিত করার জন্য তিনি উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি কর্মচারীদের সাহায্যে ভূমির প্রকৃত উৎপাদিকা শক্তি ও বাণিজ্য করের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতেন। এ পদ্ধতিতে মধ্যস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা প্রজাদের হয়রানির কোনো সুযোগ ছিল না।

মুর্শিদ কুলি খান দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রসারের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে ইংরেজ, ফরাসি ও পারসিক ব্যবসায়ীদেরকে তিনি উৎসাহ প্রদান করতেন। ব্যবসায়ীরা যাতে নির্দিষ্ট হারে প্রচলিত কর প্রদান করে এবং তাদের প্রতি যাতে কোনো অবিচার করা না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতার কারণেই বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়েছিল। কলকাতা, চুঁচুড়া ও চন্দননগর বিভিন্ন বিদেশি বণিকদের ব্যবসার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠে।

মুর্শিদ কুলি খানের কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। তাই তাঁর কন্যা জিনাত-উন-নিসার স্বামী সুজাউদ্দিন খানকে (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রিষ্টাব্দ) সম্রাট ফররুখ শিয়ার বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। সুজাউদ্দিন একজন স্বাধীন নবাবের

মর্যাদা নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা– তিন প্রদেশেরই নবাব হয়েছিলেন তিনি। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজন ও বিশ্বাসভাজনদের উচ্চপদ দান করেন। জমিদারদের সাথেও একটি সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু সুজাউদ্দিনের শেষ জীবন সুখে কাটেনি। প্রাসাদের অনেক কর্মকর্তা তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। কিন্তু দক্ষ হাতে তিনি সংকট মোকাবিলা করেন। সুজাউদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সরফরাজ খান বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হন। তাঁর অযোগ্যতার কারণে দেশজুড়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। এ সুযোগে বিহারের নায়েব-ই-নাজিম আলিবর্দি খান সরফরাজকে আক্রমণ করেন। সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন। মুঘল সম্রাটের অনুমোদনে নয়, বাহুবলে বাংলার ক্ষমতা দখল করেন আলিবর্দি খান। আলিবর্দির শাসনকালে (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ) বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনেকদিন থেকেই বর্গি নামে পরিচিত মারাঠি দস্যুরা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে আক্রমণ করে জনজীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। আলিবর্দি খান ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ১০ বছর প্রতিরোধ করে বর্গিদের দেশ ছাড়া করতে সক্ষম হন। তাঁর শাসনকালে আফগান সৈন্যরা বিদ্রোহ করলে তিনি শক্ত হাতে তা দমন করেন। আলিবর্দির সময়ে ইংরেজসহ অনেক ইউরোপীয় বণিকের বাণিজ্যিক তৎপরতা বাংলার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। একই সাথে এরা সামরিক শক্তিও সঞ্চয় করতে থাকে। আলিবর্দি খান শক্ত হাতে বণিকদের তৎপরতা রোধ করেন।

আলিবর্দি খান তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। আলীবর্দির প্রথম কন্যা ঘষেটি বেগমের ইচ্ছে ছিল তাঁর দ্বিতীয় ভগ্নির পুত্র শওকত জঙ্গ নবাব হবেন। ফলে তিনি সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকেন। কয়েকজন অভিজাতের সমর্থন লাভ করেন ঘষেটি বেগম। এদের মধ্যে রায় দুর্লভ, জগৎশেঠ, মিরজাফর, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ প্রমুখের নাম উল্লেখ করা যায়। প্রাসাদের ভেতর এ ষড়যন্ত্রকে কাজে লাগায় বাংলায় বাণিজ্য করতে আসা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সুচতুর ইংরেজ বণিকরা। ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে তারা হাত মেলায়। অবশেষে, ইংরেজদের সাথে যুদ্ধ বাধে নবাবের। ১৭৫৭ সালের ২৩এ জুন পলাশির যুদ্ধে নবাবের সেনাপতি মিরজাফর বিশ্বাসঘাতকতা করে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বিরত থাকেন। অসহায়ভাবে পরাজয় ঘটে সিরাজউদ্দৌলার। এভাবেই পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। আর একই সাথে বাংলার মধ্য যুগেরও অবসান ঘটে।

কাজ ঃ

১. সুবাদার শাহ সুজার শেষ পরিণতি কি হয়েছিল– তা উল্লেখ কর।

২. সুবাদার শায়েস্তা খানের সময়ের স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শনগুলো উল্লেখ কর।

৩. স্বাধীন নবাবি প্রতিষ্ঠায় সুবাদার মুর্শিদকুলি খানের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

৪. নিম্নের শাসকদের নাম সময়কাল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে সাজাও :

ক্রমিক নং	শাসকের নাম	ধারাবাহিক নাম
১	ইসলাম খান	
২	ইওজ খলজি	
৩	শায়েস্তা খান	
৪	আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	
৫	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ	

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. গৌড়ের নাম 'জান্নাতাবাদ' কে রাখেন?

ক. শেরশাহ খ. হুমায়ুন

গ. জাহাঙ্গীর ঘ. আকবর

২. বার ভূঁইয়াদের দমনে সুবাদার ইসলাম খানের বিশেষ কৌশলের মধ্যে ছিল-

i. শক্তিশালী নৌ-বহর গড়ে তোলা

ii. রাজমহল থেকে ঢাকায় রাজধানী স্থানান্তর

iii. অশ্বারোহী বাহিনী গঠন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

হাজিরহাট অঞ্চলের নির্বাচিত চেয়ারম্যান নোমান সাহেব জনপ্রিয়। তার এলাকায় হিন্দু ও মুসলিম এ দুই সম্প্রদায়ের বাস করে। তিনি নিজে মুসলমান হলেও যোগ্যতা অনুসারে হিন্দুদেরকেও বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব দিতেন। তার এ ধর্মীয় উদারতার ফলে এলাকায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি তৈরি হয়।

৩. মধ্যযুগের কোন সুলতানের শিক্ষা নোমান সাহেবকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে?

ক. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ খ. সিকান্দার শাহ

গ. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ ঘ. আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ

৪. উক্ত সুলতানের কর্মকাণ্ডের ফলে-

i. বাংলা সাহিত্য চর্চা নতুন গতি পায়

i. অদূরদর্শী রাজনীতির পরিচয় মেলে

iii. দক্ষতার সাথে শাসন কার্য পরিচালিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১. টেলিভিশনে প্রাচীন রোমান যোদ্ধাদের যুদ্ধের ছবি দেখছিল সোহেল। সে দেখল যুদ্ধের কৌশল হিসেবে একটি দলের সেনাপতি তার যোদ্ধাদের বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত করে আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। সেনাপতি এ সকল যোদ্ধাদের জঙ্গলপথে অতি সংগোপনে নিজেদের আড়াল করে বিপক্ষ দলের প্রাসাদে আক্রমণ চালিয়ে প্রাসাদ দখল করে নেয়।

ক. রাজা গণেশ দিনাজপুরের কোন অঞ্চলের রাজা ছিলেন?

খ. ইলিয়াস শাহকে ইতিহাসে প্রথম বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বলা হয় কেন?

গ. উদ্দীপকে বিজয়ী সেনাপতির যুদ্ধ কৌশলের প্রতিফলন পাঠ্য বই এর কোন ব্যক্তির কর্মে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ব্যক্তি প্রথমজীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থ হলেও ভাগ্য ও কর্মশক্তির সংমিশ্রণ তাকে সফলতা এনে দেয়? যুক্তি দাও।

২. পাহাড়ি অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকা হাইছড়ি। যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজসাধ্য না হওয়ায় সেখানকার উৎপাদিত পণ্য সময়মত বাজারজাত করা কষ্ঠসাধ্য। পাহাড়ের ঢালু জমিতে প্রচুর কলা উৎপন্ন হওয়ায় সেগুলো সময়মত বাজারজাত করা সম্ভব হয়নি। একেবারেই স্বল্পমূল্যে কলা বিক্রি হওয়া দেখে স্কুল পড়ুয়া দুর্জয় বড়ুয়া তার মাকে বলল এ তো দেখি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

ক. বাংলায় মুসলমান শাসকদের মধ্যে কে নৌ বাহিনীর গোড়াপত্তন করেন?

খ. বাংলাকে 'বুলগাকপুর' বলা হয়েছিল কেন?

গ. বাংলার কোন শাসকের কথা দুর্জয়ের মনে পড়ে যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত শাসকের শাসনকালকে স্থাপত্য শিল্পের স্বর্ণযুগ বলাকে যৌক্তিক মনে কর কি?

সপ্তম অধ্যায়

মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

সেন বংশের পতন এবং ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খলজির বঙ্গ বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার রাজক্ষমতা মুসলমানদের অধিকারে আসে। ফলে বাংলায় মধ্যযুগের সূচনা ঘটে। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বাংলায় বাস করত হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষ। একাদশ শতক থেকে বাংলায় ইসলাম ধর্ম প্রচার করার জন্য সুফি সাধকগণ আসতে থাকেন। বাংলার সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের অনেকে এ সময় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এভাবে ধীরে ধীরে বাংলায় একটি মুসলমান সমাজ কাঠামো গড়ে উঠতে থাকে। এ যুগে বাংলায় হিন্দু আর মুসলমান পাশাপাশি বাস করছিল। ফলে একে অন্যের চিন্তা-ভাবনায় ও আচার-আচরণে মিশ্রণ ঘটতে থাকে। এভাবে বাংলায় যে সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল তাকেই বলা হয় বাঙালি সংস্কৃতি।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- মধ্যযুগে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে সুলতান ও মুঘল শাসকগণের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মধ্যযুগে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার এবং স্থাপত্য ও চিত্রকলার বিকাশে সুলতান ও মুঘল শাসকগণের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব।
- মধ্যযুগে সুলতানি ও মুঘল শাসনামলে বাংলার ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা করতে পারব;
- মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশে সুলতান ও মুঘল শাসকগণের অবদান চিহ্নিত করতে পারব।
- মধ্যযুগে বাংলায় মুসলমানদের আগমনের ফলে বাঙালি জীবনপ্রণালী ও চিন্তাধারার ইতিবাচক পরিবর্তনসমূহ উপলব্ধিতে সক্ষম হব।
- সুলতানি ও মুঘল আমলের অবদান ও স্থাপত্য নিদর্শনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনুধাবন করে পরিদর্শনে আগ্রহী হব।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় হিন্দু ও মুসলমান এ দুইটি ধর্মের প্রভাব বিদ্যমান ছিল। বস্তুত এ দুই ধর্মকে কেন্দ্র করেই মধ্যযুগে বাংলার সামাজিক রীতি-নীতি গড়ে উঠেছিল।

মুসলমান সমাজ

মধ্যযুগের বাংলায় মুসলমান শাসনকালে রাষ্ট্রের সর্বময়কর্তা হিসেবে রাষ্ট্রনায়ক ছিল সমাজ জীবনে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। হিন্দুরাও শাসকের এ অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামাজিক মর্যাদা ও প্রাধান্য মেনে নিয়েছিল। মুসলমান সমাজ জীবনে রাষ্ট্রনায়ক সুলতানকে কতকগুলো বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হতো। জুমা এবং ঈদের নামাজে খুতবা পাঠ মুসলমান শাসকের একটি বিশেষ কর্তব্য ছিল। তাঁকে মুসলমান সমাজের নেতা হিসেবে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে হতো। মুসলমানদের ঐক্য ও ধর্মীয় চেতনার প্রসারের জন্য শাসক নিজ নিজ রাজ্যে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি নির্মাণ করত।

মুসলমান শাসকেরা জমকালো প্রাসাদে বাস করত। তাঁদের রাজধানীও নানা রকম মনোমুগ্ধকর অট্টালিকায় সুসজ্জিত থাকত। ঐশ্বর্য ও আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াও রাজদরবারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তিদের সমাবেশ। শাসকগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সংস্কৃতির উদার পৃষ্ঠপোষক ছিল।

মধ্যযুগের বাংলায় মুসলমান সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চ, মধ্যম, ও নিম্ন– এ তিনটি পৃথক শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। সৈয়দ, উলেমা প্রমুখ শ্রেণি সমাজে যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। ধর্মপরায়ণ ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে জনগণ যথেষ্ট শ্রদ্ধা করত। মুসলমান শাসকগণ ও তাঁদেরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করত। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে ভাতা এবং জমি বরাদ্দ করা হতো।

উলেমাগণ ইসলামি শিক্ষায় অভিজ্ঞ হত। তাঁদের মধ্য হতে কাজি, ইমাম, মুয়াজ্জেম এবং অন্যান্য ধর্ম বিষয়ক কর্মচারী নিয়োগ করা হতো। শেখগণ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে জনগণকে শিক্ষা দিত। মধ্যযুগে বাংলায় মুসলমান সমাজের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

মধ্যযুগে বাংলার মুসলমান সমাজে একটি অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। যোগ্যতা, প্রতিভা ও জ্ঞানের দ্বারা তারা নিজেদের সাধারণ মানুষের তুলনায় একটি আলাদা শ্রেণি হিসেবে গড়ে তুলেছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পের সাধনার দ্বারা তারা তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। যে কোনো ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও প্রতিভা দ্বারা রাষ্ট্রের মর্যাদাপূর্ণ পদে বসতে পারত। এ ক্ষেত্রে সুলতান গিয়াসউদ্দিন ইওজ খিলজি ও সুবেদার মুর্শিদ কুলি খানের দৃষ্টান্ত উল্লেখযোগ্য। অবশ্য পরবর্তী সময়ে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। উত্তরাধিকারসূত্রে মর্যাদাপূর্ণ সরকারি পদ লাভের নীতি প্রচলিত হয়। এ যুগে সামরিক ও বিচার বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়ে সরকারি অভিজাত শ্রেণি গড়ে উঠেছিল। নিম্ন শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের নিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়। কৃষক, তাঁতি এবং অন্যান্য শ্রমিকদের নিয়ে তৃতীয় শ্রেণি গঠিত ছিল। কৃষকদের অধিকাংশই ছিল হিন্দু। কতগুলো পেশা মুসলমানদের জন্য একচেটিয়া ছিল।

মুসলমান সমাজে কতগুলো সামাজিক উৎসব পালন করা হতো। এগুলো এখনও মুসলমানরা পালন করে। সন্তান জন্মলাভ একটি আনন্দদায়ক ব্যাপার ছিল। মুসলমানরা নবজাত শিশুর নামকরণকে কেন্দ্র করে 'আকিকা' নামক বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করে। 'খাত্না' মুসলমান সমাজের একটি অতি পরিচিত সামাজিক প্রথা ছিল। বিবাহ মুসলমান সমাজের একটি বিশেষ উৎসবমুখর অনুষ্ঠান। মৌলবিরা মুসলমান রীতি-নীতি অনুযায়ী বিবাহকার্য সম্পন্ন করে থাকে। নবদম্পতির জন্য বাসর-শয্যার ব্যবস্থা করা হতো। মৃতদেহ সৎকার এবং মৃতের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে মুসলমানরা কতগুলো ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি পালন করে। তারা মৃতদেহকে কবর দেয় এবং তার আত্মার শান্তির জন্য কোরআন পাঠ করে এবং মিলাদ পড়ায়।

ধর্মীয় উৎসবাদি এবং বিয়ে-সাদির মতো সামাজিক অনুষ্ঠানে মৌলবিদের উপস্থিতি অপরিহার্য। মুসলমান সমাজে সুফি ও দরবেশ নামে পরিচিত পির বা ফকির সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বিভিন্ন সমস্যা হতে মুক্তি লাভের জন্য সাধারণ মানুষ তাদের দেয়া তাবিজ-কবজ ব্যবহার করত।

বাংলার এক বিশাল সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা অনেকেই তাদের পূর্ববর্তী ধর্মের কোনো কোনো বিশ্বাস ও সংস্কার ত্যাগ করতে পারেনি। এভাবে হিন্দু সমাজের 'গুরুবাদ' মুসলমান সমাজে প্রবেশ করে। পিরের দরগায় সন্ধ্যায় আলো জ্বালানো এবং সিন্নি প্রদান অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা ছিল।

অভিজাত মুসলামগণ ছিল ভোজন-বিলাসী। তাদের খাদ্য তালিকায় বিভিন্ন মাছ-মাংসের সঙ্গে আচারের নামও পাওয়া যায়। এসব খাবারের পাশাপাশি কাবাব, রেজালা, কোর্মা আর ঘিয়ে রান্না করা যাবতীয় মুখরোচক খাবার জায়গা করে নেয়। ভাত, মাছ, শাক-সবজি বাঙালি মুসলমানদের প্রতিদিনের খাদ্য ছিল। খাদ্য হিসেবে রুটির ব্যবহারের কথাও জানা যায়। খিচুরি তখনকার সমাজে একটি প্রিয় খাদ্য ছিল।

অভিজাত মুসলমানগণ পায়জামা ও গোল গলাবন্ধসহ জামা পরত। তাদের মাথায় থাকত পাগড়ি, পায়ে থাকত রেশম ও সোনার সুতার কাজ করা চামড়ার জুতা। তারা তাদের আঙ্গুলে অনেক মণি-মুক্তা বসানো আংটি ব্যবহার করত। মোল্লা ও মৌলভিরাও পায়জামা, জামা এবং টুপি ব্যবহার করত। গরিব বা নিম্ন শ্রেণির মুসলমানগণ লুঙ্গি ও টুপি পরত। অভিজাত মহিলারা কামিজ ও সালোয়ার ব্যবহার করত। তারা প্রসাধনী ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল না। তারা বাহু ও কব্জিতে সোনার অলংকার এবং আঙ্গুলে সোনার আংটি পরত।

এ যুগের প্রথম দিকে চারিত্রিক গুণাবলি ও সততার জন্য মুসলমানগণ বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরবর্তী সময়ে তারা ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে কঠোর ও নৈতিক মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে মুসলমান সমাজে দুর্নীতি ও অনৈসলামিক কার্যাবলির অনুপ্রবেশ ঘটে। সামাজিক জীবনে মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতন শাসন ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করেছিল। বাংলার নবাবি শাসনের অবসানের পেছনে শাসকবর্গের নৈতিক অবনতি যথেষ্ট পরিমাণে দায়ি ছিল।

একক কাজ ঃ

১. মধ্যযুগে বাংলার মুসলমানদের সামাজিক উৎসব ও রীতিনীতির উল্লেখ কর।

২. মধ্যযুগে বাংলার মুসলমানদের পোশাক-পরিচ্ছদ কীরূপ ছিল?

হিন্দু সমাজ

মধ্যযুগে বাংলার মুসলমানদের প্রভাব, রীতিনীতি ও ভাবধারা হিন্দু সমাজে অনুপ্রবেশ করেছিল। তথাপি হিন্দু সমাজের মূল নীতিগুলো এবং সাধারণ সমাজ ব্যবস্থায় তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। এ যুগেও হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন পেশাকে ভিত্তি করেই এ প্রথার সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র– সমাজে এ চারটি উল্লেখযোগ্য বর্ণ ছিল। এ চার বর্ণের মানুষের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ছিল না। বর্ণপ্রথা কঠোরভাবে পালিত হতো। ফলে এক বর্ণের সঙ্গে অন্য বর্ণের বিবাহ বা আদান-প্রদান নিষিদ্ধ ছিল।

ধর্ম-কর্মের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একক কর্তৃক ছিল। জীবন ও জীবিকার তাগিদে তারা বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত হতেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যারা চিকিৎসাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল সমাজে তারা 'বৈদ্য' বা কবিরাজ' নামে পরিচিত ছিল। কায়স্থ কোন বর্ণ নয়, গোত্র বিশেষ। শিক্ষা ও চাকরির ক্ষেত্রে তারা ছিল উল্লেখযোগ্য। মুসলমান শাসনের সময়ে কায়স্থরা সামাজিক জীবনে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেছিল। কৃষিকাজ ছিল বৈশ্যদের প্রধান পেশা। তাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসাও করত। সমাজের নিম্নতম স্থানে ছিল শূদ্ররা। একই পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরা একত্রে একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করত। সমাজে দাস-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল।

মধ্যযুগের বাংলায় জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু উপলক্ষে হিন্দুরা বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতি পালন করত। তখনকার যুগের প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলো বর্তমানকালেও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে লক্ষ্য করা যায়। সন্তান জন্মের পর তাকে গঙ্গাজল দিয়ে ধৌত করা হতো। ষষ্ঠ দিনে ষষ্টি পূজার আয়োজন করা হতো। ব্রাহ্মণ শিশুর কোষ্ঠি গণনা করতেন। একমাস পর বালক উত্থান পর্ব পালন করা হতো। ছয় মাসের সময় করা হতো অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা। অধিকাংশ হিন্দু রমণী নিয়মিত উপবাস ও একাদশী পালন করত।

হিন্দু সমাজে বিবাহ একটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক অনুষ্ঠান। বাংলায় হিন্দু সমাজে একান্নবর্তী পরিবারই ছিল অধিক। পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্রই সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করত। স্বামী–ভক্তি হিন্দু সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল।

এ সময়ে বাংলার হিন্দু সমাজে নারীদের তেমন কোনো অধিকার ছিল না। স্বামী স্ত্রীকে তার সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করত। কন্যা মাতা-পিতার উপর, স্ত্রী স্বামীর উপর, বিধবারা সন্তানদের উপর নির্ভরশীল ছিল। গৃহকর্তার অনুমতি ছাড়া মেয়েরা ঘরের বাইরে যেতে পারত না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পত্তির উপর স্ত্রীদের কোনো অধিকার ছিল না। সমাজে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে, বাংলায় সর্বত্র এ প্রথা বাধ্যতামূলক ছিল না। তথাপি এ যুগে অনেক নারী নিজ যোগ্যতা ও বুদ্ধিমত্তা দ্বারা নিজেদের স্বাধীন সত্তাকে বিকশিত করতে সমর্থ হয়েছিল। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এ যুগের নারীদের কৃতিত্ব কম ছিল না। বিত্তশালী পরিবারে নিয়মিত শিল্প ও সংস্কৃতির চর্চা হতো। বীণা, তানপুরা ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রে এ যুগের মহিলারা পারদর্শী ছিল।

পোশাক ও অলঙ্কার হিসেবে মেয়েরা পাট ও তুলার কাপড়, আংটি, হার, নাকপাশা, দুল, সোনার ব্রেসলেট, সোনার শাখা, কানবালা, নথ, অনন্ত, বাজু প্রভৃতি ব্যবহার করত। অলঙ্কার বিত্তবান মহিলারা ব্যবহার করত। এ সকল অলঙ্কার সোনা, রূপা, হাতির দাঁত দ্বারা নির্মিত হতো এবং মণিমাণিক্য খচিত থাকত। বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা প্রসাধনী হিসেবে সিঁদুর,

কাজল, চন্দন মিশ্রিত কস্তুরী প্রভৃতি ব্যবহার করত। অনেকে পায়ে নুপুর পরত। কেবল বিশেষ অনুষ্ঠানে এ সকল অলংকার ও প্রসাধনী ব্যবহার করা হত। সাধারণ মেয়েরা নিজেদের গৃহে সাধারণ বেশভূষায় সজ্জিত থাকত। শাড়ি তাদের নিত্যদিনের পোশাক ছিল। পুরুষদের সাধারণ পোশাক ছিল ধুতি। অভিজাত এবং শিক্ষিত ব্যক্তিরা চাঁদর ও পাগড়ি ব্যবহার করত। ধনী ব্যক্তিরা বিশেষত ব্যবসায়ীরা গলায় হার, কানে দুল এবং আঙ্গুলে আংটি পরত।

মধ্যযুগের বাংলার হিন্দু সমাজের খাদ্যের সহিত বর্তমান হিন্দু সমাজের খাদ্যের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। ভাত ছিল প্রধান খাদ্য। এছাড়া খাদ্য তালিকায় ছিল মাছ, মাংস, শাক-সবজি, দুধ, দধি, ঘৃত, ক্ষীর ইত্যাদি। চাউল হতে প্রস্তুত নানা প্রকার পিঠাও জনপ্রিয় মুখরোচক খাবার ছিল। বাঙালি ব্রাহ্মণেরা আমিষ খেত। তখন সকল প্রকার মাছ পাওয়া যেত। পূর্ববঙ্গে ইলিশ ও শুঁটকি মাছ খুব প্রিয় খাবার ছিল। তরকারির মধ্যে বেগুন, লাউ, কুমড়া, ঝিংগে, কাকরুল, কচু উৎপন্ন হতো। ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, কলা, তাল, পেঁপে, নারকেল, ইক্ষু পাওয়া যেত। উল্লেখ্য তখনকার সময়ে হিন্দু-মুসলমানদের খাদ্য তালিকার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য ছিল না। তবে গো-মাংস ভক্ষণ হিন্দুদের নিকট চরম অধর্ম হিসেবে বিবেচিত হতো।

হিন্দু সমাজে কৌলিন্য প্রথা প্রচলিত ছিল। ফলে সমাজে নানা অনাচার অনুপ্রবেশ করেছিল। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে এ প্রথার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কৌলিন্য প্রথার ফলে সমাজে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত হয়। মধ্যযুগে বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান সমাজ জীবনে কতগুলো সামাজিক বিশ্বাস জন্মলাভ করেছিল। জ্যোতিষী পাঁজি-পুঁথি ঘেটে শুভক্ষণ নির্ধারণ করত। এসময় জনগণ ইন্দ্রজাল এবং যাদু বিদ্যায় বিশ্বাস করত।

একক কাজ ঃ মধ্যযুগে হিন্দুরা কী ধরনের সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করতো উল্লেখ কর।

অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য

নদীমাতৃক বাংলার ভূমি চিরদিনই প্রকৃতির অকৃপণ আশীর্বাদে পরিপুষ্ট। এখানকার কৃষিভূমি অস্বাভাবিক উর্বর। মধ্যযুগে এখানকার উৎপন্ন ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, পাট, আদা, জোয়ার, তিল, সীম, সরিষা ও ডাল। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে পিঁয়াজ, রসুন, হলুদ, শশা প্রভৃতি ছিল উল্লেখযোগ্য। আম, কাঁঠাল, কলা, মোসাব্বর, খেজুর ইত্যাদি ফলমূলের ফলনও ছিল প্রচুর। পান, সুপারি, নারকেলও প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। গালা বা দ্রাক্ষাও উৎপন্ন হতো প্রচুর। মুসলমান শাসনের সময় হতেই বাংলায় পাট ও রেশমের চাষ শুরু হয়।

বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস ছিল কৃষি। কৃষি ফলনের প্রাচুর্য থাকলেও এ সময়ের চাষাবাদ পদ্ধতি ছিল অনুন্নত। আধুনিক সময়ের মতো পানি সেচ ব্যবস্থা সে যুগে ছিলনা। কৃষককে অধিকাংশ সময়েই সেচের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হতো। খরার বিরুদ্ধে তাদের করার কিছুই ছিলনা।

কৃষি প্রধান দেশ বলে বাংলার অধিবাসীর বৃহত্তর অংশ ছিল কৃষক। বাংলার মাটিতে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাচুর্য ছিল। ফলে উদ্বৃত্ত বিভিন্ন পণ্য বিদেশে রপ্তানী করা হতো। এ ব্যবসায়িক তৎপরতা কালক্রমে শিল্পের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়। মুসলমান শাসনকালে বঙ্গে বস্ত্র শিল্প, চিনি শিল্প, নৌকা নির্মাণ কারখানা ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল।

বস্ত্রশিল্পে বাংলার অগ্রগতি ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার নির্মিত বস্ত্রগুলো গুণ ও মানের বিচারে যথেষ্ট উন্নত ছিল। তাই বিদেশে এগুলোর প্রচুর চাহিদা ছিল। নিজেদের ব্যবহারের জন্য রঙিন কাপড় এবং বিদেশে রপ্তানি করার জন্য সাদা কাপড় এখানে তৈরি করা হতো। ঢাকা ছিল মসলিন নামক বিশ্বখ্যাত সূক্ষ্ম বস্ত্র শিল্পের প্রধান প্রাণকেন্দ্র। ইউরোপে এর প্রচুর চাহিদা ছিল। এ বস্ত্র এত সূক্ষ্ম ছিল যে ২০ গজ মসলিন একটি নস্যির কৌটায় ভরে রাখা যেত। পাটের ও রেশমের তৈরি বস্ত্রেও বঙ্গের কৃতিত্ব ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলায় চিনি ও গুড় তৈরি এবং জাহাজ নির্মাণ শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

মধ্যযুগে বাংলার রকমারি ক্ষুদ্র শিল্পের কথা জানা যায়। এ প্রসঙ্গে ধাতব শিল্পের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন লৌহ নির্মিত দ্রব্যাদির ব্যাপক প্রচলন ছিল। কর্মকারগণ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি নির্মাণ করত। এছাড়া দুধারী তরবারি,

ছুরি, কাঁচি, কোদাল ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য ধাতব দ্রব্য তৈরি হতো। কলকাতা ও কাশিম বাজারে এদেশের লোকেরা কামান তৈরি করত। কাগজ, গালিচা, ইস্পাত প্রভৃতি শিল্পের কথাও জানা যায়। বঙ্গে অন্যতম শিল্প হিসেবে লবণের কথাও জানা যায়। দেশে স্বর্ণকার সম্প্রদায় ছিল। বাঙালি কারিগরেরা স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্রোঞ্জ, কাঠ, পাথর, গজদন্ত ইত্যাদির কাজ বিশেষ নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদন করত। শঙ্খ শিল্পের জন্য ঢাকার প্রচুর সুখ্যাতি ছিল। ঢাকার শাখারি পট্টি আজও সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাংলার কৃষি ও শিল্প পণ্যের প্রাচুর্য এবং বিদেশে এগুলোর ব্যাপক চাহিদার ফলে বিদেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক তৎপরতা মুসলমান শাসন আমলে অভূতপূর্ব প্রসার লাভ করেছিল। বাংলার রপ্তানি পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সূতি কাপড়, মসলিন, রেশমী বস্ত্র, চাউল, চিনি, গুড়, আদা, লঙ্কা ইত্যাদি। কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে চাউল, তামাক, সুপারি, পাট, ফল ইত্যাদি রপ্তানি হতো। বিবিধ কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য ছাড়াও বাংলা হতে লবণ, গালা, আফিম, নানা প্রকার মসলা, ঔষধ ইত্যাদি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হতো। তখন বাংলায় দাস ব্যবসাও প্রচলিত ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সিংহভাগই ছিল রপ্তানি নির্ভর। খুব অল্প পরিমাণ দ্রব্য আমদানি করা হতো। বাংলার কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় কাঁচামাল হিসেবে তূলা আমদানি করা হত। বাঙালি বণিকেরা গুজরাট থেকে আমদানি করত তূলা, চীন থেকে রেশম, ইরান থেকে সৌখিন দ্রব্য। এছাড়া বাংলায় আমদানি করা হত স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথর।

মুসলমান শাসনের সময় বাংলায় বেশ কিছু সমুদ্র বন্দর ও নদী বন্দর গড়ে উঠেছিল। চট্টগ্রাম ছিল তখনকার বিখ্যাত সমুদ্র বন্দর। উড়িষ্যা, সোনারগাঁও, গৌড়, বাকলা (বরিশাল), মুর্শিদাবাদ, কাশিম বাজার, হুগলি, বিহারের পাটনা ও উড়িষ্যার পিপলী উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য বন্দর ছিল।

ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে দ্রব্য ও টাকা-পয়সার লেনদেন এবং হিসাব-নিকাশ বৃদ্ধি পায়। তাই ক্রমে ব্যাংকিং প্রথার বিকাশ ঘটে। এ যুগে হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশে লেনদেন করা হতো। সমগ্র মধ্যযুগে বাংলায় দ্রব্য সামগ্রী সহজ লভ্য ও সস্তা ছিল। চৌদ্দ শতকে বিখ্যাত ভ্রমণকারী ইবনে বতুতা লিখেছেন যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে বাংলাতেই সবচেয়ে সস্তায় জিনিসপত্র পাওয়া যেত। তারপরও সমসাময়িক সাহিত্য হতে জানা যায় যে, দেশে ঐশ্বর্যশালী ধনীর পাশাপাশি প্রচুর দরিদ্র লোকও ছিল। তাই দ্রব্যসামগ্রী সস্তা হলেও তা সাধারণ কৃষক ও প্রজাদের সহজে কেনার সামর্থ্য ছিল না।

বাংলার শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল বেশি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কোনো কর্তৃত্ব ছিলনা। এদেশের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত আরবীয় ও পারসিক বণিকেরা। নৌ-বাণিজ্যের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ছিল তাদেরই। পরবর্তীকালে পর্তুগিজ ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকগণ ব্যবসার ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকে।

একক কাজ ঃ মধ্যযুগে বাংলায় উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের তালিকা প্রস্তুত কর।

স্থাপত্য ও চিত্রকলা

মুসলমান শাসকগণ ইসলামের গৌরবকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নিজেদের শাসনকালকে স্মরণীয় করে রাখতে বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে অনেক প্রাসাদ, মসজিদ, কবর, দরগাহ ইত্যাদি নির্মাণ করেছিলেন। মসজিদ নির্মাণকে মুসলমান শাসকগণ অতিশয় পুণ্যের কাজ বলে বিবেচনা করতেন। সুলতানি আমলের স্থাপত্যের ধবংসাবশেষের মধ্যে এখনও অনেক স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে।

আদিনা মসজিদ, গৌড়

স্বাধীন বাংলার মুসলমান সুলতানদের রাজধানী প্রথমে ছিল গৌড়, পরে পাণ্ডুয়া এবং এরপর আবার গৌড়। কাজেই এ দুই শহরেই প্রথমে মুসলিম ঐতিহ্যের স্থাপত্য নিদর্শন গড়ে উঠেছিল। ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সিকান্দার শাহ 'আদিনা মসজিদ' নির্মাণ করেন। এ মসজিদের উত্তর পার্শে সিকান্দার শাহের কবর নির্মিত হয়েছিল।

গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ

বর্তমান ঢাকা হতে ১৫ মাইল দূরে সোনারগাঁওয়ে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের একটি কবর আছে। এ কবরের অতি নিকটে পাঁচটি দরগাহ ও পাঁচটি মসজিদ আছে। এগুলো 'পাঁচ পীরের দরগাহ' নামে পরিচিত। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের সমাধি স্থাপত্যকলার একটি সুন্দর নিদর্শন।

সুলতান জালালউদ্দিনের শাসনকালের উল্লেখযোগ্য কীর্তি পাণ্ডুয়ার 'এক লাখি মসজিদ'। এর নির্মাণকাল ১৪১৮-১৪২৩ খ্রিষ্টাব্দ। প্রবাদ আছে যে, তখনকার দিনে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তাই এটি 'এক লাখি মসজিদ' নামে পরিচিত হয়েছে। এ মসজিদ আসলে একটি কবর। এ সমাধি-সৌধে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রী-পুত্রদের সমাহিত করা হয়। এ মসজিদের শিল্পকলায় হিন্দু স্থাপত্য-রীতির প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়।

একলাখি মসজিদ, পান্ডুয়া

বড় সোনা মসজিদের আর এক নাম 'বারদুয়ারি মসজিদ'। এতে বৃহৎ বারটি দরজা ছিল। এ মসজিদে সোনালী রং-এর গিলটি করা কারুকার্য ছিল। সম্ভবত এজন্যই এটি সোনা মসজিদ নামে অভিহিত হতো। এ মসজিদটি গৌড়ের বৃহত্তম মসজিদ। আসাম বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য হুসেন শাহ এ মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৫২৭ খ্রিষ্টাব্দে নসরত শাহ-এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন।

বড় সোনা মসজিদ (বারদুয়ারি মসজিদ), গৌড়

গৌড় শহরের দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান ফিরোজাবাদ গ্রামে 'ছোট সোনা মসজিদ' নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদটি ছিল আকারে ছোট। তবে এ মসজিদেও সোনালী রং-এর গিলটির কারুকার্য ছিল। সম্ভবত এ কারণেই এটি ছোট সোনা মসজিদ নামে পরিচিত। আলাউদ্দিন হুসেন শাহের আমলে জনৈক ওয়ালি মুহম্মদ এটির নির্মাতা ছিলেন।

ছোট সোনা মসজিদ, গৌড়

বাগেরহাট জেলায় 'খান জাহান আলীর সমাধি' নির্মিত হয়েছে। কিংবদন্তি অনুসারে খান জাহান আলী নামক জনৈক পির ঐ স্থানে বসতি স্থাপন করেন। ১৪৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সুলতান নাসিরউদ্দিন ইলিয়াসের সমসাময়িক ছিলেন।

খান জাহান আলীর সমাধি, বাগেরহাট

বাগেরহাট জেলার 'ষাট গম্বুজ মসজিদ' বাংলার মুসলমান শাসনকালের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। খান জাহান আলীর সমাধির তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ষাট গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। অবশ্য এর গম্বুজ ষাটটি নয়, সাতাত্তরটি। পনের শতকের মাঝামাঝি সময়ে এটি নির্মিত হয়েছিল। তুর্কি সেনাপতি ও ইসলামের একনিষ্ঠ সাধক উলুখ খান জাহান এ মসজিদ নির্মাণ করেন। এই স্থাপত্য কর্মটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্বসভ্যতার নিদর্শন হিসেবে (world heritage) স্বীকৃত হয়েছে।

ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

'কদম রসুল' গৌড়ে অবস্থিত। মহানবির পদচিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য এ ভবনটি নির্মিত হয়। নসরৎ শাহ্ এটি নির্মাণ করেছিলেন (১৫৩১ খ্রিষ্টাব্দ)। এ ভবনের এক কক্ষে একটি কালো কারুকার্যখচিত মর্মর বেদীর উপরে হযরত মুহম্মদের (দঃ) পদচিহ্ন সম্বলিত একখণ্ড প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল।

কদম রসুল, গৌড়

ঢাকা জেলার রামপালে 'বাবা আদমের মসজিদ' অবস্থিত। ১৪৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মালিক কাফুর ফতেহ শাহের রাজত্বকালে এটি নির্মিত। এগুলোর বাইরেও বাংলার নানা স্থানে বহু মসজিদ ও সমাধি-সৌধ আছে।

বাবা আদমের মসজিদ, রামপাল, ঢাকা

মসজিদ ও সমাধি-সৌধ ছাড়াও এ যুগের নির্মিত বিভিন্ন তোরণ-কক্ষ ও মিনার মুসলমান বাংলার স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এদের মধ্যে রুকনউদ্দিন বরবক শাহ নির্মিত গৌড়ের 'দাখিল দরওয়াজা' ও আলাউদ্দিন হুসেন শাহের সমাধি-তোরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গৌড়ের 'ফিরোজ মিনার' স্থাপত্য শিল্পের আর একটি উৎকৃষ্ট নির্দশন। অনেকে মনে করেন যে, হাবসি সুলতান সাইফউদ্দিন ফিরোজ শাহ এটি নির্মাণ করেছিলেন।

দাখিল দরওয়াজা, গৌড়

মুঘল আমলে বাংলার শাসকগণ শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক বিস্ময়কর অবদান রেখে গেছেন। আজও বাংলার বহু স্থানে মুঘল শাসকগণের শিল্প প্রীতির নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু মসজিদ, সমাধি ভবন, স্মৃতিসৌধ, মাজার, দুর্গ, স্তম্ভ ও তোরণ নির্মিত হয়েছিল। স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য এ যুগকে বাংলায় মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করা হয়। মুঘল যুগের স্থাপত্য শিল্পের ডিজাইন ও সৌন্দর্য অন্য যুগের চেয়ে স্বতন্ত্র।

বড় কাটরা, ঢাকা

এ যুগের মসজিদের গম্বুজগুলো ছিল খাঁজকাটা। গম্বুজের গায়ে মোজাইক করা হতো। খিলানের চারপাশে ছিল লতাপাতার কারুকাজ। গম্বুজের চূড়া হতো লম্বা ও সূঁচালো। মসজিদের গায়ে থাকত লতাপাতা ও ফুলের অলঙ্করণ। মুঘল যুগের দালান- কোঠার আকৃতি ছিল বিশাল। এ যুগে বিখ্যাত ইমারতগুলো তৈরি হয় ঢাকায়।

মুঘল যুগে 'কাটরা' নামে বেশ কটি দালান তৈরি করা হয়েছিল। এগুলো ছিল অতিথিশালা। ঢাকার 'বড় কাটরা' নির্মাণ করেন শাহ সুজা। এটি চকের দক্ষিণ দিকে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

নারায়ণগঞ্জ জেলায় শীতলক্ষা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত হাজিগঞ্জ দুর্গ (বর্তমানে খিজিরপুর দুর্গ নামে পরিচিতি) সম্ভবত সুবাদার মির জুমলা (১৬৬০-১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দ) নির্মাণ করেন। মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এ দুর্গ তৈরি করা হয়েছিল।

সুবাদার শাহজাদা আজম বেশ কিছু ইমারত তৈরি করেছিলেন। বুড়িগঙ্গার তীর ঘেঁষে তিনি এক বিশাল কাটরা তৈরি করেছিলেন। তাঁর আমলেই 'লালবাগের শাহি মসজিদ' তৈরি হয়।

হাজিগঞ্জ দুর্গ (খিজিরপুর দুর্গ) নারায়ণগঞ্জ

লালবাগের শাহি মসজিদ, ঢাকা

ছোট কাটরা, ঢাকা

বাংলায় মুঘল শিল্পকলার বিস্তারের ক্ষেত্রে শায়েস্তা খানের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৬৬৩ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান ছোট কাটরা নির্মাণ করেন। এটি বড় কাটরা হতে ২০০ গজ দূরে অবস্থিত। এর অভ্যন্তরে একটি মসজিদ ও একটি গম্বুজ আছে। লালবাগের কেল্লা আজও শায়েস্তা খানের শাসনকালকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর শাসনকালের পূর্বেই এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়। তিনি এটি শেষ করার পদক্ষেপ নেন।

লালবাগের কেল্লা, ঢাকা

১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে ইব্রাহিম খানের শাসনকালে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। লালবাগ দুর্গের ভেতর রয়েছে শায়েস্তা খানের কন্যা 'বিবি পরির সমাধি-সৌধ'। মার্বেল পাথরে নির্মিত এ সমাধি ভবনটি এখন পর্যন্ত এদেশে সর্বাধিক সুন্দর মুসলিম স্মৃতি সৌধ হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে শায়েস্তা খান হোসেনি দালান নির্মাণ করেন। চক বাজারের মসজিদ, বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত শায়েস্তা খানের মসজিদ ও সাত গম্বুজ মসজিদের সাথে শায়েস্তা খানের নাম জড়িয়ে আছে।

হোসেনি দালান, ঢাকা

বাংলার নবাবদের সময়েও বহু ইমারত নির্মিত হয়। জিনজিরা প্রাসাদ তাঁদেরই কীর্তি। মুর্শিদ কুলী খানের আমলে বেগম বাজার মসজিদ নির্মিত হয়। মুর্শিদাবাদে তিনি একটি কাটরা ও মসজিদ নির্মাণ করেন। চেহেল সেতুন নামে একটি প্রাসাদও তাঁর সময়ে তৈরি। এটি ছিল একটি প্রকাণ্ড দরবার ভবন। এ সমস্ত স্থাপনা ছাড়াও মুঘল আমলে অনেক দুর্গ, ঈদগাহ, হাম্মামখানা, চিল্লাখানা ও সেতু নির্মাণ করা হয়। মুঘল যুগের এ সকল শিল্প কীর্তি বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বিবি পরির সমাধি-সৌধ, ঢাকা

দলীয় কাজ ঃ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় ছকে এলোমেলোভাবে প্রদত্ত স্থাপত্য কীর্তিগুলো কোথায় অবস্থিত তা সঠিকভাবে পার্শ্বে উল্লেখ করে তালিকা প্রস্তুত কর।

ক্রমিক নং	স্থাপত্য কীর্তির নাম	অবস্থান
১	আদিনা মসজিদ	ঢাকা
২	বড় সোনা মসজিদ	বাগেরহাট
৩	পরিবিবির সমাধি	গৌড়
৪	ষাট গম্বুজ মসজিদ	সোনারগাঁও
৫	গিয়াসউদ্দিন আযম শাহের সমাধি	পাণ্ডুয়া

ধর্মীয় অবস্থা

বর্তমানকালের মতো সে যুগেও হিন্দুরা বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করত। আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সঙ্গে হিন্দুরা বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করত। এর মধ্যে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, শিব, শিবলিঙ্গ, চণ্ডী, মনসা, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, সূর্য, মদন, নারায়ণ, ব্রহ্ম, অগ্নি, শীতলা, ষষ্ঠী, গঙ্গা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাঙালি হিন্দুর সামাজিক জীবনে দুর্গাপূজা, দশহরা, গঙ্গা স্নান, অষ্টমী স্নান এবং মাঘী সপ্তমী স্নানকে পবিত্র বলে মনে করে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের নিকট গঙ্গা জল অত্যন্ত পবিত্র। তারা দোলযাত্রা, রথযাত্রা, হোলি ইত্যাদি ধর্মীয় উৎসব পালন করে।

জাতিগত শ্রেণিভেদ ছাড়াও হিন্দু সমাজে কতগুলো ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল। যেমন- শৈব, শাক্ত ইত্যাদি। হিন্দু জাতির মধ্যে এ সময় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও উল্লেখযোগ্য ছিল। এ সময়ে হিন্দু সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি ছিল না। এক সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের বিরোধ ও বিদ্বেষ অতি পরিচিত ঘটনা ছিল।

মুসলমানরা বর্তমান সময়ের মতোই মধ্যযুগেও বিভিন্ন ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠান পালন করত। ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আজহা মুসলমান সমাজের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হিসেবে পালিত হতো। ধর্মপ্রাণ মুসলমান মাত্রই পবিত্র রমজান মাসে রোজা রাখতো। এছাড়াও শব-ই-বরাত ও শব-ই-কদরের রাতে এবাদত বন্দেগি করতো। উৎসব অনুষ্ঠানে মুসলমানগণ তাদের সাধ্যমত নতুন এবং পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে একে অন্যের গৃহে গিয়ে কুশল ও দাওয়াত বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের সৌর্হাদ্য ও ভ্রাতৃত্বভাবকে সুদৃঢ় করতো।

সুলতান, সুবেদার ও নবাবগণ ধর্মীয় উৎসব উপলক্ষে জনগণের সান্নিধ্যে আসতেন। বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে মুসলমানগণ মহানবির (স.) জন্মদিন পালন করতেন। বর্তমান সময়ের ন্যায় মধ্যযুগেও মহররম উৎসব পালিত হত। এটি শিয়া সম্প্রদায়ের একটি প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে পরিচিত। এ উদ্দেশ্যে শিয়ারা 'তাজিয়া' তৈরি করত। মুসলমানদের বর্ষপঞ্জি অনুসারে মহররমের প্রথম দিনকে নববর্ষ হিসেবে পালন করা হয়। মহররমের চন্দ্র উদয়কে মুসলমানগণ আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে বরণ করত।

এ যুগে ধর্মপ্রীতি মুসলমান সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তেন। এছাড়া তারা নিয়মিত কোরআন ও হাদিস পাঠ করতেন। সমাজে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত। ছেলে-মেয়ে উভয়কেই ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের জন্য মক্তবে প্রেরণ করা হত। সমাজে ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পরিচালনার জন্য মোল্লা সম্প্রদায়কে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হত। বিভিন্ন ব্যাপারে এবং অনেক সমস্যা সমাধানে মোল্লাগণ হাদিস-কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী কার্য সম্পাদন করতে উপদেশ প্রদান করতেন। গ্রামীণ জীবনে ধর্মীয় উৎসবাদিতে এবং বিয়ে-শাদির মতো সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে মোল্লা সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ছিল অপরিহার্য।

মুসলমান সমাজে সুফি ও দরবেশ নামে পরিচিত পির বা ফকির সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁরা ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং সর্বদা আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে তাঁরা ধর্ম সাধনার জন্য 'দরগা' প্রতিষ্ঠা করেন। শাসকবর্গ ও জনগণ সকলের কাছেই তাঁরা শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

বাংলায় ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে মুসলমান সমাজও বিস্তৃত হতে থাকে। বাংলায় মুসলমান সমাজে দুইটি পৃথক শ্রেণি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। একটি বিদেশ হতে আগত মুসলমান, অন্যটি স্থানীয় ধর্মান্তরিত মুসলমান। বিদেশি ও স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে কৃষ্টি ও রীতি-নীতির পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ দেখা দেয়নি। মুসলমান শাসকদের উদারতা এবং স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাই এর কারণ ছিল।

একক কাজ ঃ

১. মধ্যযুগে মুসলমানদের ধর্মীয় রীতি-নীতি ও আচার অনুষ্ঠানগুলো কীরূপ ছিল?

ভাষা, সাহিত্য ও শিক্ষা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশও উন্নতির জন্য সুলতানি ও মুঘল শাসনকালের অবদান বিশেষভঅবে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে প্রথমেই যাঁর নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন তিনি হলেন ইলিয়াস শাহি বংশের সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ (১৩৯৩-১৪১১ খ্রিষ্টাব্দ)। তাঁর শাসনকালেই প্রথম বাঙালি মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর প্রণয়মূলক কাব্য 'ইউসুফ- জোলেখা' রচনা করেন। এটি ফার্সি রচনার অনুবাদ। সুলতানি যুগে আরও কয়েকজন কবি ফার্সি কাব্যের অনুবাদ করেছেন। তাঁদের মধ্যে দৌলত উজির বাহরাম খান ও দোনা গাজীর নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা ভাষায় ঐতিহাসিক সাহিত্য রচনার পথ প্রদর্শক হিসেবে মুসলমানদের অবদান অবিস্মরণীয়। ইসলামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক মুসলমান কবি বিজয় কাব্য রচনা করেছেন। এর মুখ্য বিষয় ছিল মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্বের গুণকীর্তন করা। বিজয় কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন 'রসুল বিজয়' কাব্য রচয়িতা জয়নুদ্দীন। বঙ্গের মুসলমান কবিরা পদাবলী রচনা করেন। চাঁদ কাজী ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম পদাবলী কাব্যের স্রষ্টা। পিরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এ যুগে মুসলমান কবিরা অনেক কাব্য বাংলায় রচনা করেন। বাংলা ভাষায় মুসলমানগণ সঙ্গীতবিদ্যার চর্চাও করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে সঙ্গীতবিদ্যার উপর রচিত প্রথম গ্রন্থ 'রাগমালা' রচনা করেছিলেন কবি ফয়জুল্লাহ্। কবি মোজাম্মেল 'নীতিশাস্ত্র বার্তা' ও 'সাতনামা' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও মুসলমান কবিদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। বহু আরবি ও ফার্সি শব্দ তাঁরা বাংলা ভাষায় ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ, খোদা, নবি, পয়গম্বর, কিতাব ইত্যাদি বহু শব্দ সে সময়ের মুসলামন কবি-লেখকদের ব্যবহারের ফলে বাংলা শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছে।

সুলতানি যুগে হিন্দু কবিরাও সাহিত্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন। এক্ষেত্রে মুসলমান শাসকবর্গের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হুসেন শাহের শাসনকালকে ইতিহাসে অমর করে রেখেছে। তাঁর উদার পৃষ্ঠপোষকতা নিঃসন্দেহে বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। এ যুগের বিখ্যাত কবি ও লেখকগণের মধ্যে রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, মালাধর বসু, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস ও যশোরাজ খান উল্লেখযোগ্য ছিলেন। এ সময়ে মালাধর বসু 'শ্রীমদ্ভাগবৎ' ও 'পুরাণ' বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। সুলতান হুসেন শাহ ও নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় কবীন্দ্র পরমেশ্বর 'মহাভারত' বাংলায় অনুবাদ করেন।

বৈষ্ণব কবি হিসেবে বৃন্দাবন দাসের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা ভাষায় তিনিই সর্বপ্রথম শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত গ্রন্থ 'চৈতন্য-ভগবত' রচনা করেন। চন্দ্রাবতী 'মনসা মঙ্গল' কাব্য রচনা করেছিলেন।

সংস্কৃত সাহিত্যেও মুসলমান সুলতানগণের যথেষ্ট অবদান ছিল। সংস্কৃত ভাষার সাথে বাংলা ভাষার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এজন্য অনেক মুসলমান শাসক এর প্রতি আগ্রহী ছিলেন। তাঁদের অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সংস্কৃত ভাষার চর্চাও করতেন। মুসলমান শাসনকালে বাংলা সংস্কৃত সাহিত্যের এক বিরাট কেন্দ্র ছিল। শুধু বাংলা ও সংস্কৃতই নয়, আরবি ও ফার্সি কাব্যের চর্চাও সুলতানি যুগে ছিল।

মুঘল যুগে বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। তবে মুঘল শাসকগণ সুলতানি যুগের শাসকদের ন্যায় ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ কোনো সহযোগিতা করেননি। বাংলার জমিদারগণ স্বীয় প্রচেষ্টায় সে ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন।

মুসলমান যুগে প্রতিবেশী আরাকানের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল। ফলে আরাকানে বাংলা সাহিত্যের প্রসার ঘটতে শুরু করে। আরাকান রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন দৌলত কাজী। আলাওল ছিলেন রাজসভার আর একজন কবি। তাঁর ছয়টি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'পদ্মাবতী' সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কয়েকটি ফার্সি কাব্যগ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেন। এছাড়া, 'রাগনামা' নামে একটি সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন।

বাহরাম খান রচনা করেন 'লাইলী-মজনু' কাব্যগ্রন্থ। 'জঙ্গনামা' ও 'হিতজ্ঞান বাণী' গ্রন্থগুলো কবি কাজী হায়াৎ মাহমুদ রচিত। কবি শাহ গরীবুল্লাহ ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পুঁথি সাহিত্যিক।

শিক্ষা

বাংলার মুসলিম শাসকগণ কেবল রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। বাংলায় মুসলমান শাসনকালে শিক্ষার দ্বার হিন্দু-মুসলমান সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল। শেখদের খানকাহ ও উলেমাদের গৃহ শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। মুসলমান শাসনের সময় বাংলার সর্বত্র অসংখ্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ সকল মসজিদের সঙ্গেই মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করত। বালক-বালিকারা একত্রে মক্তব ও পাঠশালায় লেখাপড়া করত। প্রাথমিক শিক্ষা সকল মুসলমান বালক-বালিকার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ প্রচলন ছিলনা। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণও মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল না। ফলে সাধারণ মুসলমান মেয়েরা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ হতে বঞ্চিত ছিল। শাসকবর্গের ভাষা ছিল ফার্সি। তাই এ ভাষা প্রায় রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভ করেছিল। নবাব ও মুসলমান অভিজাতবর্গ ফার্সি ভাষা ও সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন। সরকারি চাকরি লাভের আশায় অনেক হিন্দু ফার্সী ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। মুসলমান শিক্ষকগণ ফার্সি ও আরবি ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। এ যুগে বাংলা ভাষা বিশেষ সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। আরবি ও ফার্সি ভাষায় অজ্ঞ সাধারণ মুসলমান যেন ইসলামের ধ্যান-ধারণা বুঝতে পারে সেজন্য অনেকেই বাংলা ভাষায় পুস্তকাদি রচনা করেন। তাঁদের রচনাবলী বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

মুসলমান শাসনের পূর্বে বাংলার হিন্দু সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। মুসলমানদের শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দু সমাজের সকল শ্রেণির জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হয়। পাঠশালায় হিন্দু বালক-বালিকারা প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করত। গুরুর আবাসস্থল কিংবা বিত্তবানদের গৃহে পাঠশালা বসত। কখনও কখনও একই ঘরের চালার নিচে মক্তব ও পাঠশালা বসত। সকালে মুন্সি মক্তবের শিক্ষার্থীদের এবং বিকালে গুরু তার ছাত্রদের পাঠশালায় শিক্ষা দান করতেন। বিত্তবান লোকেরা পাঠশালার ব্যয়ভার গ্রহণ করতেন। হিন্দু বালক-বালিকারা একত্রে পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করত।

৬ বছর পর্যন্ত পাঠশালায় শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য 'টোল' ছিল। সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো। সংস্কৃত সাহিত্য চর্চার জন্য নবদ্বীপ, বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখ্যযোগ্য ছিল। অনেক মহিলা এ যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃত চর্চার ক্ষেত্রে নিজেদের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণি সর্বদা নিজেদের জ্যোতিষশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থাকতেন। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এ যুগে সমাজে জনগণের মধ্যে জ্ঞান ও বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশের জন্য কতগুলো সাধারণ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; যেমন– ধর্মীয় সঙ্গীত, জনপ্রিয় লোক-কাহিনি ও নাটক-গাঁথা ইত্যাদি।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কোন কাব্য ফার্সি রচনার অনুবাদ?

ক. রসুল বিজয় খ. রাগমালা

গ. ইউসুফ জোলেখা ঘ. সাতনামা

২. কেন মধ্য যুগে হিন্দু সম্প্রদায় ফার্সি ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করতেন?

ক. সাহিত্য রচনা করতে খ. চাকরি পেতে

গ. প্রশাসনিক কাজ করতে ঘ. রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

লিমনের চাচা অনেক বছর ধরে আমেরিকাসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে ব্যবসা করে আসছিলেন। তিনি তার ব্যবসা প্রসারের লক্ষ্যে নিজ দেশে ফিরে নারায়ণগঞ্জে একটি শাখা অফিস খোলেন। তিনি ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেন পরিচালনা করেন। ব্যবসার সুবিধার জন্য তিনি ব্যক্তিগত বিমান ব্যবহার করেন।

৩. লিমনের চাচার বাণিজ্যিক প্রসার বাংলার কোন আমলের সঙ্গে মিল পাওয়া যায়?

ক. পাল খ. সেন

গ. সুলতানি ঘ. মুঘল

৪. বাণিজ্যিক প্রসারের ফলেই উক্ত আমলে গড়ে উঠেছিল-

i. সমুদ্র বন্দর

ii. নদী বন্দর

ii. স্থল বন্দর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১. রেজা সাহেব চট্টগ্রামের একজন বড় ব্যবসায়ী। তাঁর আমদানি রপ্তানির ব্যবসা। তিনি জাহাজের মাধ্যমেই বিদেশ থেকে সোনা, রূপা, দামি পাথরের গয়না, রেশমি সুতা, বিভিন্ন দামি মসলা আমদানি করেন। পাশাপাশি তিনি চা ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করেন। গত সপ্তাহে তিনি তার মেয়ের জন্মদিনে পোলাও, কাবাব, রেজালা ও মিষ্টির আয়োজন করেন। সবাই খাবার খেয়ে খুবই খুশি।

ক. মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করেন কে?

খ. কৃষিকে বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির মূল উৎস বলা হয় কেন?

গ. রেজা সাহেবের বাড়ির খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে কোন আমলের মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রেজা সাহেবের অর্থনৈতিক অবস্থা উক্ত আমলের চেয়ে কি সমৃদ্ধ ছিল বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও।

২. গ্রামের স্কুল শিক্ষক সুধীন রায়ের মেয়ে অনন্যা সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তার বান্ধবী রাবেয়া সুলতানাকে তার বাবা আর স্কুলে পাঠাবেন না। তিনি বলেন যে মেয়েদের এর থেকে বেশি পড়া লেখার দরকার নেই। শিক্ষক সুধীন রায় মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে রাবেয়ার বাবার এই মানসিকতা জেনে বললেন যে, বর্তমান সময়ে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম এবং শিক্ষা ছাড়া নারী-পুরুষ সবাই অসম্পূর্ণ। সব যুগেই শিক্ষার গুরুত্ব ছিল এবং আছে।

ক. হোসেনি দালান কে নির্মাণ করেন?

খ. কেন মধ্যযুগকে মুঘলদের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়? বর্ণনা দাও।

গ. রাবেয়ার বাবার শিক্ষা বিষয়ক এই মানসিকতার সঙ্গে মধ্যযুগের মুসলিম শিক্ষার কী মিল রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রাবেয়ার বাবার মতো মানসিকতার কারণেই কী মধ্যযুগে মুসলমান ছেলে-মেয়েরা শিক্ষায় এগিয়ে ছিল? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তোমার মতামত দাও।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনাপর্ব

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ–বিশেষ করে বাংলা অঞ্চল ছিল ধন সম্পদে পূর্ণ রূপকথার মতো একটি দেশ। এ অঞ্চলের স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই তখন এসব গ্রামে পাওয়া যেত। এই স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের কৃষকের ক্ষেত ভরা ফসল, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ থাকত। কুটির শিল্পেও গ্রাম ছিল সমৃদ্ধ। তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় ইউরোপের কাপড়ের চেয়েও উন্নতমানের ছিল। এর মধ্যে জগৎ বিখ্যাত ছিল মসলিন কাপড়। তাছাড়া উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলও নানা ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য, মসলার জন্য বিখ্যাত ছিল। এসব পণ্যের আকর্ষণেই অনেকেই এদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এসেছে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও উপমহাদেশে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। পরবর্তী সময়ে তারা এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। এদেশে আগত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিকে পরাজিত করে এবং স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে নানামুখী ষড়যন্ত্র করে কিভাবে ইংরেজ ব্যবসায়ী কোম্পানি এ অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের সূচনা করে–বর্তমান অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- বাংলায় ইংরেজ শাসনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- পলাশি ও বক্সারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারব;
- ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় দিওয়ানি লাভের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে;
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ইংরেজ শাসনের ফলে বাংলায় রাজনৈতিক পরিবর্তনসমূহ অনুধাবনে সক্ষম হব।

ইউরোপীয়দের আগমন

সপ্তম শতক থেকে এ অঞ্চলের সঙ্গে আরব বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল একচেটিয়া। তারা বাণিজ্য করত মূলত সমুদ্রপথে। ১৪৫৩ খ্রিষ্টাব্দে কন্সটান্টিনোপল অটোমান তুর্কিরা দখল করে নেয়। ফলে উপমহাদেশের সাথে জলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন জলপথ আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মূলত এ কারণেই ইউরোপীয় শক্তিগুলো সমুদ্রপথে উপমহাদেশে আসার অভিযান শুরু করে।

পর্তুগিজ

পর্তুগিজদের মধ্যে যে দুঃসাহসী নাবিক প্রথম সমুদ্রপথে এদেশে আসেন তাঁর নাম ভাস্কো-ডা-গামা। তিনি ১৪৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ২৭এ মে ভারতের পশ্চিম-উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন। উপমহাদেশে তাঁর এ আগমন ব্যবসা-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

ভাস্কো-ডা-গামার ভারতবর্ষে আগমনের পথ

পর্তুগিজরা ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে আসে কিন্তু ক্রমে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই ইউরোপীয় বণিকরা উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলের কালিকট, চৌল, বোম্বাই, সালসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি বন্দরে কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

১৫৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তারা চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ে বাণিজ্যঘাটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। ১৫৭৯ খ্রিষ্টাব্দে হুগলী নামক স্থানে তারা উপনিবেশ গড়ে তোলে। এরপর তারা উড়িষ্যা এবং বাংলার কিছু অঞ্চলে বসতি সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়। বাংলাসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা থাকলেও পর্তুগিজদের বিভিন্ন অপকর্ম ও দস্যুতার কারণে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান তাদের চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের ঘাঁটি দখল করে বাংলা থেকে বিতাড়ন করেন। তাছাড়া পর্তুগিজরা এদেশে আগত অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরাজিত হয়। ফলে এরা এ দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

ওলন্দাজ বা ডাচ

হল্যান্ডের অধিবাসী ওলন্দাজ বা ডাচরা 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে বাণিজ্যির উদ্দেশে ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে এই উপমহাদেশে আসে। ভারতবর্ষে তারা কোম্পানির সনদ অনুযায়ী কালিকট, নাগাপট্টম, বাংলার চুঁচুড়া ও বাকুড়ায় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। তাছাড়া বলাসোর কাশিমবাজার এবং বরানগরেও তারা কুঠি স্থাপন করে। ওলন্দাজ ও অপর ইউরোপীয় শক্তি ইংরেজদের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ শুরু হয় এবং একই সঙ্গে বাংলার শাসকদের সঙ্গে তারা বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত বিদারার যুদ্ধে তারা ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ১৮০৫ খ্রিষ্টাব্দে তারা সকল বাণিজ্য কেন্দ্র গুটিয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। প্রথমে পর্তুগিজ পরে ওলন্দাজ শক্তির পতন, ভারতে ইংরেজ শক্তির উত্থানের পথ সুগম করে।

দিনেমার

দিনেমার বা ডেনমার্কের অধিবাসী একদল বণিক বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে 'ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করেন। ১৬২০ খ্রিষ্টাব্দে তারা দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলায় ত্রিবাঙ্কু এবং ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শ্রীরামপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। কিন্তু, এদেশে তারা লাভজনক ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজদের কাছে বাণিজ্য কুঠি বিক্রি করে কোনো রকম বাণিজ্যিক সফলতা ছাড়াই দিনেমাররা এদেশ ত্যাগ করে।

দলীয় কাজ : পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও দিনেমারদের উপমহাদেশে স্থাপিত বাণিজ্য কুঠিগুলোর একটি তালিকা তৈরি কর।

ইংরেজ

সমুদ্রপথে ইউরোপীয় বণিকদের সাফল্য, প্রাচ্যের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য, ইংরেজ বণিকদেরকেও এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত করে। এই উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের একদল বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বণিক সংঘ গড়ে তোলে। বণিক সংঘটি ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে রানি এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৫ বছর মেয়াদি প্রাচ্যে একচেটিয়া বাণিজ্য করার সনদপত্র লাভ করে। এই সনদপত্র নিয়ে কোম্পানির প্রতিনিধি বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের আশায় আকবরের দরবারে হাজির হন। এরপর ক্যাপ্টেন হকিন্স ১৬০৮ খ্রিষ্টাব্দে জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে ১৬১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম জেমসের দূত হয়ে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন স্যার টমাস রো। সম্রাটের কাছ থেকে তিনি ইংরেজদের জন্য বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে নেন। ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। ইতোমধ্যে কোম্পানি সুরাট আগ্রা, আহমদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে তাদের ভিত্তি মজবুত করে ফেলে।

কোম্পানি তার দ্বিতীয় বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে মসলিপট্টমে। এরপর বাংলার বালাসোরে আরেকটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এদের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকলে এরা করমণ্ডল (মাদ্রাজ শহর) উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। বাংলার সুবেদার শাহ সুজার অনুমোদন লাভ করে তারা ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে হুগলিতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এভাবে কোম্পানি কাশিমবাজার, ঢাকা, মালদহেও বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে।

১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্তুগিজ রাজকন্যা ক্যাথরিনের সঙ্গে বিয়ের যৌতুক হিসেবে লাভ করেন বোম্বাই শহর। অর্থাভাবে চার্লস ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে শহরটি বিক্রি করে দেন। পরবর্তীকালে এই বোম্বাই শহরই কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

জব চার্ণক নামে আরেকজন ইংরেজ ১৬৯০ খ্রিষ্টাব্দে ১২০০ টাকার বিনিময়ে কোলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের জমিদারি স্বত্ব লাভ করেন। ভাগীরথী নদীর তীরের এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে কোলকাতা নগরীর জন্ম হয়। এখানেই কোম্পানি ১৭০০ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের নাম অনুসারে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করে। ধীরে ধীরে এটি ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং রাজনৈতিক স্বার্থ বিস্তারের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন দিল্লির সম্রাট ফারুখশিয়ার তাদের বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন। একই সঙ্গে নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও কোম্পানি লাভ করে। সম্রাটের এই ফরমানকে ইংরেজ ঐতিহাসিক ওরমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মহাসনদ বা ম্যাগনা কার্টা বলে উল্লেখ করেন। এই অধিকার লাভ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিরোধ্য গতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

একক কাজ ঃ

১. যে তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে কোলকাতা নগরীর জন্ম হয় তার নাম লেখ। এখন কোলকাতার বয়স কত?

২. সম্রাট ফারুকশিয়ার কর্তৃক ইংরেজদের দেয়া সনদপত্র প্রদানের ফলে প্রাপ্ত অধিকারগুলোকে মহাসনদ বা ম্যাগনা কার্টা বলে কেন? কারণ লিপিবদ্ধ কর।

ফরাসি

উপমহাদেশে সর্বশেষে আগত ইউরোপীয় বণিক কোম্পানি হচ্ছে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দে এই বাণিজ্যিক কোম্পানি গঠিত হয়। ১৬৬৮ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি সর্বপ্রথম সুরাট এবং পরের বছর মুসলিপট্টমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পন্ডিচেরিতে ফরাসি উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে তারা তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলায় সম্প্রসারিত করে। কোম্পানি বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কাছ থেকে গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত চন্দননগর নামক স্থানটি কিনে নেয়। ১৬৯০ থেকে ১৬৯২ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যে চন্দননগর একটি শক্তিশালী সুরক্ষিত ফরাসি বাণিজ্য কুঠিতে পরিণত হয়। ১৬৯৬ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি এখানে একটি শক্তিশালী দুর্গ স্থাপন করতে সক্ষম হয়। নির্দিষ্ট হারে শুল্ক প্রদানের শর্তে ১৬৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসির বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। পরবর্তীকালে তারা কাশিমবাজার বালাসোরে কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ইংরেজ বণিকরা যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে দৃঢ় অবস্থানে, তখন ফরাসিরা এদেশে আসে। এ অবস্থায় ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা তাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির মতো ফরাসিরাও এদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। ফলে দুই ইউরোপীয় শক্তি--- ইংরেজ ও ফরাসিদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল, উন্নত রণ কৌশলের কাছে ফরাসিরা পরাজিত হয়। বাংলার নবাবের পক্ষ অবলম্বন করায় ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্য তাদেরকে আরও পর্যুদস্ত করে ফেলে। ফলে বাংলার ফরাসী কুঠিগুলো ইংরেজদের দখলে চলে যায়। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের যুদ্ধসমূহে ফরাসি কোম্পানি পরাজিত হলে তারা এদেশ ত্যাগ করে। ফলে ইংরেজরা ভারতবর্ষে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়।

একক কাজ ঃ পলাশির যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের সঙ্গে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ব্যর্থতার সম্পর্ক নির্ণয় কর।

পলাশি যুদ্ধ

১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত আলীবর্দি খান বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নবাব ছিলেন। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি সফলভাবে রাজ্য শাসন করেছেন। তিনি তাঁর সময়ে মারাঠা ও বর্গিদের দমন করে রাখতে সফল হন। সুকৌশলে ইংরেজ বণিক কোম্পানিকেও নিয়ন্ত্রণে রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বাংলার রাজনীতিতে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

নবাব মৃত্যুর আগে তাঁর কনিষ্ঠ কন্যা আমেনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলাকে বাংলার সিংহাসনের উত্তরাধিকার মনোনীত করে যান। ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দের আলীবর্দি খানের মৃত্যু হলে তাঁর প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা ২২ বছর বয়সে নবাবের ক্ষমতা গ্রহণ করেন। সিংহাসনে বসার পর থেকে তাকে নানামুখী ষড়যন্ত্র ও সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। তাঁর প্রথম সমস্যা ছিল পরিবারের ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র। বিশেষ করে আলীবর্দি খানের তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ কন্যা ঘসেটি বেগম সিরাজের নবাব হওয়ায় আশাহত হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এদের সঙ্গে যোগ দেন ঘাষেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ, পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সিরাজের খালাতো ভাই শওকত জঙ্গ এবং অন্যান্যরা। কৌশলে নবাব ঘসেটি বেগমকে নজরবন্দী করেন। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা শওকত জঙ্গ বিদ্রোহী হয়ে উঠলে সিরাজউদ্দৌলা এক যুদ্ধে তাকে পরাজিত ও নিহত করে পূর্ণিয়া দখল করে নেন।

নবাব পারিবারিক ষড়যন্ত্র কৌশলে দমন করলেও তাঁর বিরুদ্ধে বাইরে ষড়যন্ত্রের আরেক জাল বিস্তৃত হতে থাকে। এর সঙ্গে জড়িত হয় দেশি-বিদেশি বণিক শ্রেণি, নবাবের দরবারের প্রভাবশালী রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণি, নবাবের সেনাপতি মীর জাফরসহ আরো অনেকে। প্রত্যেকে যার যার স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশি যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করতে থাকে।

পলাশি যুদ্ধের কারণ

ইতিহাসের যেসব ঘটনা একটি দেশের জনগণের ভাগ্যে ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটাতে পারে, পলাশির যুদ্ধ এ অঞ্চলের জনগণের জন্য তেমনি এক ঘটনা ছিল। এই ঘটনার পেছনের কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

- সিরাজউদৌল্লা বাংলার সিংহাসনে বসার পর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজরা নতুন নবাবকে কোনো উপঢৌকন পাঠায়নি এবং কোনো সৌজন্যমূলক সাক্ষাতও করেনি। ইংরেজদের এই বেয়াদবিতে নবাব ক্ষুব্ধ হন।
- নবাবের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত রাখে।
- ইংরেজ কোম্পানি দস্তকের অপব্যবহার করলে দেশীয় বণিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। নবাব দস্তকের অপব্যবহার করতে নিষেধ করেন এবং বাণিজ্যিক শর্ত মেনে চলার আদেশ দেন। কোম্পানি নবাবের সে আদেশও অগ্রাহ্য করে।
- আলীবর্দি খানের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ইংরেজরা নবাবকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাছাড়া জনগণকে নির্যাতন করার মতো ধৃষ্টতাও তারা দেখাতে থাকে।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

- রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস তার পরিবারের সদস্যদেরসহ প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে কোলকাতায় ইংরেজদের কাছে আশ্রয় নেয়। তাকে ফেরত দেয়ার জন্য নবাব ইংরেজদের নিকট দূত পাঠান। ইংরেজ গভর্নর নবাবের দূতকে অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। এর আগে শওকত জঙ্গের বিদ্রোহের সময়ও ইংরেজরা নবাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের সমর্থন দেয়।

ইংরেজদের একের পর এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও অবাধ্যতা নবাবকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসের শুরুতে নবাব কোলকাতা দখল করে নেন। যাত্রা পথে তিনি কাশিম বাজার কুঠিও দখল করেন। নবাবের অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ ত্যাগ করে পালিয়ে যায়। হলওয়েলসহ বেশকিছু ইংরেজ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে নবাবকে হেয় করার জন্য হলওয়েল এক মিথ্যা

প্রচারণা চালায় যা ইতিহাসে 'অন্ধকূপ হত্যা' নামে পরিচিত। এতে বলা হয় যে, ১৮ ফুট দৈর্ঘ্য ১৪.১০ ফুট প্রস্থ ছোট একটি ঘরে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দি করে রাখা হয়। এতে প্রচণ্ড গরমে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ১২৩ জনের মৃত্যু হয়। এই মিথ্যা প্রচার মাদ্রাজ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ফলে উত্তেজিত হয়ে কোলকাতা দখল করার জন্য ওয়াটসন ও ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে কোলকাতায় চলে আসে। তারা নবাবের সেনাপতি মানিকচাঁদকে পরাজিত করে কোলকাতা দখল করে নেয়। নবাব তাঁর চারদিকে ষড়যন্ত্র ও শত্রু পরিবেষ্টিত টের পেয়ে ইংরেজদের সঙ্গে নতজানু ও অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন। এটি ইতিহাসে আলীনগর সন্ধি নামে খ্যাত।

আলীনগর সন্ধিতে সব ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার পর ক্লাইভের উচ্চাকাঙ্ক্ষা আরো বৃদ্ধি পায়। নবাবের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইউরোপে সংঘটিত সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অজুহাতে ইংরেজরা ফরাসিদের চন্দনগর কুঠি দখল করে নেয়। নবাব এ অবস্থায় ফরাসিদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে ইংরেজদের শায়েস্তা করার ব্যবস্থা নেন। এতে ক্লাইভ ক্ষুব্ধ হয়ে নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।

এই ষড়যন্ত্রে ক্লাইভের সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসায়ী ধনকুবের জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ প্রধান সেনাপতি মীরজাফর প্রমুখ।

পলাশির যুদ্ধের ঘটনা

পলাশির যুদ্ধ বাংলা তথা এ উপমহাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ২৩এ জুন ভাগিরথী নদীর তীরে পলাশির আমবাগানে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতোমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ তার অবস্থান সুদৃঢ় করে সন্ধিভঙ্গের অজুহাতে সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। নবাবের পক্ষে দেশপ্রেমিক মীরমদন, মোহন লাল এবং ফরাসি সেনাপতি সিন ফ্রে প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে মীরমদন নিহত হন। নবাবের বিজয় আসন্ন জেনে মীরজাফর ষড়যন্ত্রমূলকভাবে যুদ্ধ থামিয়ে দেয়। মীর মদনের মৃত্যু ও মীরজাফরের অসহযোগিতা নবাবকে বিচলিত করে। নবাবের সেনাপতি মীরজাফর যুদ্ধক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসহযোগিতা করে নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল। নবাব কোরআন স্পর্শ করিয়ে শপথ নেওয়ালেও মীরজাফরের ষড়যন্ত্র থামেনি। নবাবের সৈন্যরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছে সেই সময় মীরজাফরের ইঙ্গিতে ইংরেজ সৈন্যরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যার অনিবার্য পরিণতি নবাবের পরাজয়।

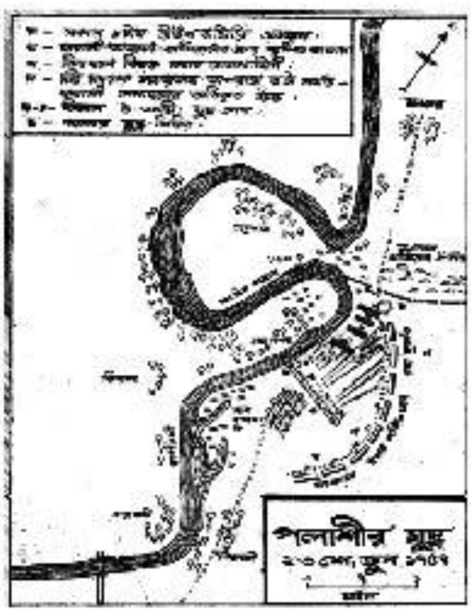

মানচিত্র : পলাশি যুদ্ধক্ষেত্র

নবাবের পতনের কারণ

- নবাবের সেনাপতি মীরজাফর ও তার সহযোগীদের যুদ্ধক্ষেত্রে অসহযোগিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা।
- নবাবের সেনাপতি থেকে সভাসদ অধিকাংশই দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে, ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করে দেখেছে।
- তরুণ নবাবের অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও দৃঢ়তার অভাব ছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থতার পরিচয় দেন।
- সেনাপতি মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা জানা সত্ত্বেও তিনি বার বার তার উপরই নির্ভর করেছেন।
- ইংরেজদের সম্পর্কে সতর্কতা, ফরাসি এবং ইংরেজদের ষড়যন্ত্র এসব বিষয়ে আলীবর্দি খানের উপদেশ সিরাজউদ্দৌলার কাছে গুরুত্ব পায়নি।
- নবাবের শত্রু পক্ষ ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং রণকৌশলে উন্নত।
- রবার্ট ক্লাইভ ছিল দূরদর্শী, সূক্ষ্ম ও কূট বুদ্ধিসম্পন্ন।

পলাশি যুদ্ধের ফলাফল

- সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও মৃত্যু বাংলায় প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের পথ সুগম করে।
- যুদ্ধের ফলে মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসালেও তিনি ছিলেন নামমাত্র নবাব, প্রকৃত ক্ষমতা ছিল রবার্ট ক্লাইভের হাতে।
- পলাশি যুদ্ধের ফলে ইংরেজরা বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের অধিকার লাভ করে। ফরাসিরা এদেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়।
- এ যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তির স্বার্থে এদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন হতে থাকে।
- পলাশি যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী পরিণতি ছিল উপমহাদেশে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা। এভাবেই এ যুদ্ধের ফলে বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হয়।

সুতরাং পলাশির যুদ্ধ একটি খণ্ডযুদ্ধ হলেও বাংলা তথা উপমহাদেশের রাজনীতিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

দলীয় কাজ ঃ পলাশি প্রান্তরে নবাব ও ইংরেজ সেনাবাহিনীর অবস্থান দেখিয়ে একটি চিত্র অংকন কর।

বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দ)

ইংরেজ যে উদ্দেশ্যে মীর জাফরকে সিংহাসনে বসিয়েছিল তাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। নতুন নবাব কোম্পানির প্রাপ্য অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়ে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। নিজের ক্ষমতা রক্ষা করতেও তাকে বার বার ক্লাইভের উপর নির্ভর করতে হয়। আবার ক্লাইভের রাজকার্যে ঘন ঘন হস্তক্ষেপ নবাবের পছন্দ ছিল না। ইংরেজদের বিতাড়নের জন্য মীর জাফর আরেক বিদেশি কোম্পানি ওলান্দাজদের সাথে আঁতাত করেন। বিষয়টি ইংরেজদের দৃষ্টি এড়ায়নি। মীর জাফরের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা, অতিরিক্ত অর্থ প্রদানে অক্ষমতা এবং ওলন্দাজদের সঙ্গে আঁতাতের অভিযোগে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ গভর্নর ভান্সিটার্ট মীরজাফরকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে মীর কাশিমকে শর্ত সাপেক্ষে সিংহাসনে বসান। ক্ষমতারোহণের পর মীর কাশিম স্বাধীনভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। ফলে ইংরেজদের সাথে তাঁর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

বক্সারের যুদ্ধের কারণ ঃ

মীর কাশিম একজন সুদক্ষ শাসক, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন। তিনি তাঁর প্রজাদের কল্যাণের প্রতি সচেতন ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করে আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে। এ উদ্দেশে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপগুলোই শেষ পর্যন্ত বক্সারের যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

- মীর কাশিম প্রথমে ইংরেজদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং প্রশাসনকে প্রভাবমুক্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশে তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন। নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ ও রাজধানীর চারদিকে পরিখা খনন করেন।
- ইংরেজদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করা এবং সৈনিকদের ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য দুইজন ইউরোপীয় সৈনিককে প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দান করেন।
- অস্ত্র-গোলাবারুদের জন্য যেন অন্যের মুখাপেক্ষী হতে না হয় সেজন্য রাজধানীতে কামান, বন্দুক ইত্যাদি তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
- বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণ ইংরেজদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখালে তাকে পদচ্যুত ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা করেন।
- ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সম্রাটের ফরমানে ইংরেজদের ব্যবসা করার যে সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়েছিল তারা তার অপব্যবহার করে। 'দস্তক' নামের ছাড়পত্রের অপব্যবহারের ফলে দেশি ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকে।

ফলে, নবাব সবার জন্য আন্তঃবাণিজ্যে শুল্ক উঠিয়ে দেন। এজন্য ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া লাভজনক ব্যবসায় অসুবিধা হয়। এ বিষয়ে নবাব কোনোরকম আপোষ করতে না চাইলে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।

- নবাবের গৃহীত পদক্ষেপ ছিল দেশ ও জনগণের স্বার্থে, যা ইংরেজদের স্বার্থপরিপন্থী। ফলে ক্ষুব্ধ ইংরেজরা এর প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।
- ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে ক্ষুব্ধ হয়ে পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ এলিস পাটনা দখল করে নেয়। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা ছাড়া নবাবের আর কোনো উপায় থাকে না। মীর কাশিম সফল প্রতিরোধের মাধ্যমে এলিসকে পাটনা থেকে বিতাড়িত করেন। ১৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কোলকাতা কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেজর এডামসের নেতৃত্বে প্রেরিত ইংরেজ বাহিনীর কাছে গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে নবাব শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

ইতোমধ্যে ইংরেজরা মীর জাফরকে পুনরায় বাংলার সিংহাসনে বসায়। মীর কাশিম পরাজিত হয়েও হতাশ হননি। নবাব ইংরেজদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে বিহারের বক্সার নামক স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মিলিত বাহিনী মেজর মনরোর কাছে পরাজিত হয়।

মীর কাশিমের পরাজয়ের কারণে বাংলার সার্বভৌমত্ব উদ্ধারের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইংরেজ শক্তি অপ্রতিরোধ্য গতিতে বাংলা তথা উপমহাদেশের সর্বত্র ক্ষমতার বিস্তার ঘটাতে থাকে। এ কারণে উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশির যুদ্ধের চেয়ে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশি।

একক কাজ ঃ ছকটি সঠিক করে সাজাও

বক্সারের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নাম ও দেশের নাম

নাম	দেশ
মীর কাশিম	ইংল্যান্ড
সম্রাট শাহ আলম	বাংলা
মেজর মনরো	অযোধ্যা
সুজাউদ্দৌলা	দিল্লি

বক্সার যুদ্ধের ফলাফল :

১. এ যুদ্ধের ফলে মীর কাশিমের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপমহাদেশে ইংরেজদের প্রভাব- প্রতিপত্তি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বিনা বাধায় তারা আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

২. এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখণ্ডে পালিয়ে যান। দিল্লির সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেন। মীর কাশিম পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেন। ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

৩. ইংরেজরা অযোধ্যার নবারের কাছ থেকে কারা ও এলাহাবাদ হস্তগত করতে সক্ষম হয়।

৪. এ যুদ্ধের ফলে শুধু বাংলার নবাবই পরাজিত হননি, তাঁর মিত্র ভারত সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাও পরাজিত হন। এই তিন শক্তির একসঙ্গে পরাজয় ইংরেজদের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৫. এ যুদ্ধের ফলে রবার্ট ক্লাইভ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ফলে বাংলায় ইংরেজ অধিকার আইনত স্বীকৃত হয় এবং তারা অসীম ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে থাকে।

বক্সারের যুদ্ধে মীর কাশিমের পরাজয় শুধু নবাবি আমলেরই পরিসমাপ্তি ঘটায়নি, মুঘল সম্রাটের দুর্বলতাও ইংরেজদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে দ্রুতগতিতে ইংরেজদের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে।

কোম্পানির দেওয়ানি লাভ

১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মীর জাফরের মৃত্যুর পর তার পুত্র নাজিম-উদ-দৌলাকে শর্ত সাপেক্ষে বাংলার সিংহাসনে বসানো হয়। শর্ত থাকে যে তিনি তার পিতার মতো ইংরেজদের নিজস্ব পুরাতন দস্তক অনুযায়ী বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্য করতে দিবেন এবং দেশীয় বণিকদের অবাধ বাণিজ্যের সুবিধা বাতিল করবেন। বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলায় ইংরেজ শাসনের পথ সুগম হয়। এ সময়ে ইংরেজ কোম্পানি মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে বাংলার রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব অর্থাৎ দেওয়ানি লাভ করে। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজরাই বাংলার সত্যিকার শাসকরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

এতদিন দেওয়ান এবং সুবেদার পদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হত। মুর্শিদ কুলি খান এই প্রথা ভঙ্গ করে দুইটি পদ একাই দখল করে নেন। তাঁর সময় কেন্দ্রে নিয়মিত রাজস্ব পাঠানো হলেও পরবর্তীকালে অনেকেই তা বন্ধ করে দেয়। আলীবর্দি খানের সময় থেকে একবারেই তা বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সম্রাট কোম্পানিকে বাৎসরিক উপঢৌকনের বদলে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণের অনুরোধ করেন। কিন্তু এই অনুরোধ কোম্পানি তখন গ্রাহ্য করেনি। বক্সারের যুদ্ধের পর ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ক্লাইভ দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসলে পরিস্থিতি পাল্টে যায়।

ক্লাইভ দেশ থেকে ফিরে প্রথমেই পরাজিত অযোধ্যার নবাব এবং দিল্লির সম্রাটের দিকে নজর দেন। তিনি অযোধ্যার পরাজিত নবাবের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করেন। বিনিময়ে আদায় করে নেন কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুইটি। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায় করেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। অপরদিকে দেওয়ানি শর্ত সম্বলিত দুইটি চুক্তি তিনি করেন। একটি দিল্লির সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে। এতে কোম্পানিকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানি দান করা হয়। এর বিনিময়ে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা নবাব প্রতিবছর সম্রাটকে পাঠাবেন। এই টাকা নিয়মিত পাঠানোর জামিনদার হবে কোম্পানি।

অপর চুক্তিটি হয় মীর জাফরের নাবালক পুত্র নবাব নাজিম-উদ-দৌলার সঙ্গে। বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নবাব কোম্পানির দেওয়ানি লাভের সকল শর্ত মেনে নেন। এই চুক্তিদ্বয়ের ফলে কোম্পানির ক্ষমতা একচেটিয়া বৃদ্ধি পায়। নবাব এখন বস্তুত কোম্পানির পেনশনার মাত্র। সম্রাটও তাই। সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে। দেওয়ানি থেকে যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানির যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব। সুতরাং দেওয়ানির গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে হয় যে,

১. দেওয়ানি লাভ কোম্পানির শুধু রাজনৈতিক নয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বিশাল বিজয়।

২. সম্রাট ও নবাব উভয়েই ক্ষমতাহীন শাসকে পরিণত হন। প্রকৃতপক্ষে তারা হয়ে যান কোম্পানির পেনশনভোগী কর্মচারী।

৩. দেওয়ানি লাভের ফলে এবং নবাব কর্তৃক প্রদত্ত শর্ত অনুযায়ী শুল্কহীন বাণিজ্যের কারণে কোম্পানির কর্মচারীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। তাদের অর্থলোভ দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে দেশীয় বণিকশ্রেণি, সাধারণ মানুষ। তাদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে।

৪. দেওয়ানি লাভের ফলে বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হতে থাকে। এর পরিমাণ এতটাই ছিল যে এই অর্থের বলে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল।

দলীয় কাজ ঃ 'ইংরেজ শাসনের সূচনায় দেওয়ানি লাভ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা'- (দলীয় বিতর্ক)

দ্বৈত শাসন

রবার্ট ক্লাইভ দেওয়ানি সনদের নামে বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের একচেটিয়া ক্ষমতা লাভ করে। দিল্লি কর্তৃক বিদেশি বণিক কোম্পানিকে এই অভাবিত ক্ষমতা প্রদানে সৃষ্টি হয় দ্বৈত শাসনের। অর্থাৎ কোম্পানি লাভ করে দায়িত্বহীন ক্ষমতা, নবাব পরিণত হন ক্ষমতাহীন শাসকে। অথচ নবাবের দায়িত্ব থেকে যায় ষোলআনা। ফলে বাংলায় এক অভূতপূর্ব প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়, যার চরম মাসুল দিতে হয় এদেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে।

রবার্ট ক্লাইভ

১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) গ্রীষ্মকালে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ, যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। কোম্পানির মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি রিচার্ড বেচারের ভাষায় 'দেশের কয়েকটি অংশে যে জীবিত মানুষ মৃত মানুষকে ভক্ষণ করিতেছে তাহা গুজব নয়, অতি সত্য'। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৭৬৫-৭০ খ্রিষ্টাব্দে বাৎসরিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ যা ছিল, দুর্ভিক্ষের বছরও আদায় প্রায় তার কাছাকাছি ছিল। ফলে চরম শোষণ নির্যাতনে বাংলার মানুষ হতদরিদ্র ও অসহায় হয়ে পড়ে। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় নবাবের হাতে পর্যাপ্ত অর্থ না থাকায় প্রশাসন পরিচালনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হন। সারাদেশে শুরু হয় বিশৃঙ্খলা। এই পরিস্থিতিতে ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটান।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

কোম্পানির শাসন দুর্নীতিমুক্ত ও সুসংগঠিত করতে ১৭৮৬ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিসকে ভারতের গভর্নর জেনারেল ও সেনা প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। তিনি ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ঐ বছর ২২এ মার্চ নির্দিষ্ট রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জমিদারগণকে নিজ নিজ জমির উপর স্থায়ী মালিকানা দান করে যে বন্দোবস্ত চালু করা হয় তাকেই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলা হয়।

পটভূমি ঃ ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। এই ব্যবস্থায় উচ্চহারে ডাক নিয়ে জমির বন্দোবস্ত নিলেও সে অনুপাতে রাজস্ব আদায় হতো না। নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকায় জমিদাররা কৃষকদের কাছ থেকে প্রয়োজনে নির্যাতন করে অর্থ আদায় করত। অথচ কৃষকদের উন্নয়ন বা জমির উন্নয়নের প্রতি তাদের কোন লক্ষ ছিল না। ফলে নির্যাতনের ভয়ে কৃষকরা জমি ছেড়ে পালিয়ে যেত। বছরের পর বছর জমি অনাবাদি থাকায় জমির দাম কমে যেত। এ অবস্থায় হেস্টিংস জমিদারদের সঙ্গে একসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। কিন্তু, এ ব্যবস্থায়ও সরকার, জমিদার, প্রজা– কারো কোনো ধরনের উপকার হয়নি। পরবর্তীকালে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার রাজস্ব সমস্যা সমাধানের জন্য ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট নতুন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দে পিটের ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় স্থায়ী নিয়ম-কানুন প্রবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি রাজস্ব ব্যবস্থা চালুর জন্য কোম্পানিকে নির্দেশ দেয়া হয়। ১৭৮৯ সালে কর্ণওয়ালিস জমিদারদের দশশালা বন্দোবস্ত দিতে প্রস্তুতি নেন। ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্তের অনুমতি প্রদান করলে কর্ণওয়ালিস এই অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৯ সালে দশসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। তবে এর সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও তিনি দেন যে, কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন পেলে দশসালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হবে।

১৭৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। ১৭৯৩ সালের ২২এ মার্চ কর্ণওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করেন।

বৈশিষ্ট্য

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদেরকে জমির স্থায়ী মালিকে পরিণত করে এবং জমিদারগণ জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে।
- রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়ার ফলে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জমিদার জমিদারি ভোগের চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করে।

- এ প্রথা চালু হওয়ার ফলে জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। সরকার স্বয়ং শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- নজরানা ও বিক্রয় ফি সমূহ বাতিল করা হয়।
- খাজনা বাকি পড়লে জমিদারদের ভূমির কিছু অংশ বিক্রি করে রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা ছিল। তাও সম্ভব না হলে জমিদারি বাজেয়াপ্ত করা হতো।

ফলাফল

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে। কর্ণওয়ালিস জমিদার ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের মতো এদেশেও একটি জমিদার শ্রেণি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, ইউরোপ আর উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও তার বিকাশের ধরন এক ছিল না। ফলে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া এ ব্যবস্থায় সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই অধিক পরিলক্ষিত হয়।

সুবিধা

- এ ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হচ্ছে সরকার তার আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। যে কারণে বাজেট প্রণয়ন, বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সরকারের পক্ষে সহজ হয়।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি কোম্পানির একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে উঠে। ফলে, ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়করণ এবং দীর্ঘায়িতকরণে জমিদাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।
- জমির উপর জমিদারের স্থায়ী মালিকানা স্বীকৃত হওয়ার কারণে অনেকেই নিজ নিজ এলাকায় নানা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্রতী হয়। তারা নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, উপাসনালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে। তাছাড়া প্রজাদের কল্যাণের জন্য রাস্তাঘাট, পুল তৈরি, পুকুর খননের মতো কাজ ছাড়াও অনেক সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তারা জড়িত হয়।
- জমিদাররা জমির মালিক হওয়ার কারণে পতিত জমি, জঙ্গলাকীর্ণ জমি চাষের ব্যবস্থা করে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়।
- গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকার কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

দোষ ঃ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। তারা ধীরে ধীরে ধনিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। অপর দিকে জমিতে প্রজাদের পুরোনো স্বত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ফলে জমিদার ইচ্ছে করলেই যেকোনো সময় তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। প্রথম দিকে প্রজাস্বত্ব আইন না থাকায় তাদের ভাগ্যের জন্য সম্পূর্ণভাবে জমিদারের দয়ার উপর নির্ভর করতে হত।

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির সঠিক জরিপের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় নিষ্কর জমির উপর বেশি রাজস্ব ধার্য করা হতো। জমির সীমা নির্ধারিত না থাকায় পরবর্তীকালে মামলা বিবাদ দেখা দিত।
- সূর্যাস্ত আইনে নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যাস্তের মধ্যে খাজনা পরিশোধ বিধানের কঠোরতার কারণে অনেক বড় বড় জমিদারি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুধু বর্ধমানের জমিদারি ছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাত বছরের মধ্যে অন্যান্য সব জমিদারি ধ্বংস হয়ে যায়।
- জমিদারি আয় ও স্বত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জমিদাররা নায়েব-গোমস্তার উপর দায়িত্ব দিয়ে শহরে বসবাস শুরু করেন। এইসব অনুপস্থিত জমিদারদের নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে জমির উৎপাদন কমে যেতে থাকে, গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ হতে থাকে।

- উপমহাদেশে জমি ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। ফলে নিম্নবর্ণের অনেক ব্যক্তি, সাধারণ মানুষ যারা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থের মালিক হন, তারা জমিদারি কিনে আভিজাত্যের মর্যাদালাভে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে দেশীয় পুঁজি, দেশীয় শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ধ্বংস হয়ে যায়। অপর দিকে কোম্পানিও সম্ভাব্য এদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর হাত থেকে বেঁচে যায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা সরাসরি জমিদার কর্তৃক শোষিত হতে থাকে। আবার এই জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে গ্রামীণ সমাজে একটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে উঠছিল, যারা পরবর্তী সময়ে দেশ-জাতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃক সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি যারা প্রথমদিকে ব্রিটিশ সম্রাজ্যের শক্ত ভিত ছিল, তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ-রাজ উৎখাতের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

একক কাজ ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার অর্থনীতি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়?

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. কোন পর্তুগিজ নাবিক প্রথম সমুদ্রপথে ভারতীয় উপমহাদেশে আসেন?

ক. ভাস্কো-ডা-গামা খ. ক্যাপ্টেন হকিন্স

গ. স্যার টমাস রো ঘ. জব চার্নক

২. নবাব সিরাজউদ্দৌলা পলাশির প্রান্তরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন; কারণ-

i. নবাবের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইংরেজরা কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত রাখে

ii. চুক্তি ভঙ্গ করে ইংরেজরা নবাবকে কর দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে

iii. নবাব ইংরেজদের সম্পদ দখল করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

অনেক বছর আগের কথা। সিলেটের রহমান সাহেব ও তাঁর তিন বন্ধু স্থানীয় জমিদারের নিকট থেকে সুপারিশপত্র নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গমন করে বাণিজ্যিক সুবিধা লাভের আশায় সেখানকার কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা একটি নদীর তীরে অর্থের বিনিময়ে কয়েকটি গ্রাম ইজারা নিয়ে কুঠি স্থাপন করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ রহমান সাহেব ও তার গোষ্ঠীকে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করারও অধিকার প্রদান করেন।

৩. তোমার পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কোন ইউরোপীয় জাতির বাণিজ্য কার্যক্রমের সাথে রহমান সাহেব ও তাঁর বন্ধুদের গৃহীত ব্যবস্থার মিল রয়েছে?

ক. পর্তুগিজ খ. ওলন্দাজ

গ. দিনেমার ঘ. ইংরেজ

৪. উক্ত জাতির কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল-

i. সম্রাট আকবরের দরবারে হাজির হওয়া

ii. ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ করা

iii. বিনা শুল্কে বাণিজ্যিক অধিকার লাভ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১. মামুন ও কামাল দুই ভাই। পিতার মৃত্যুর পর তাদের স্টার গার্মেন্টস এর মালিকানা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধলে বড় ভাই মামুন গার্মেন্টস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ছোট ভাই কামাল সংসার দেখাশোনার দায়িত্ব নেয়। গার্মেন্টস এর আয় থেকে কামালকে সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান না করায় সংসারে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

ক. ভাস্কো-ডা-গামা কোন দেশের নাবিক ছিলেন?

খ. প্রাচীনকালে অনেকেই বাংলা অঞ্চলে বাণিজ্য করতে এসেছিল কেন?

গ. উদ্দীপকের ক্ষমতা ভাগাভাগির সাথে তোমার পাঠ্য বইয়ের কোন ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত ঘটনা বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. বেশ কিছুদিন ধরে পলাশপুর চা বাগানের বার্ষিক আয় উঠা-নামা করছিল। এ জন্য বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানের আয় নির্দিষ্ট করার লক্ষ্যে উৎপাদন ব্যবস্থা কয়েক বছরের জন্য কতিপয় ব্যক্তির নিকট বরাদ্দ দেন। এ ব্যবস্থায় নতুন ইজারাদাররা বেশি মুনাফা লাভের আশায় চা শ্রমিকদেরকে অতিরিক্ত সময়ে কাজ করাতে বাধ্য করে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক ছাড়াই। এ ব্যবস্থার ফলে চা-বাগান ও চা শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের প্রতি কোনো দৃষ্টি ছিল না ইজারাদারদের। বাগান কর্তৃপক্ষ এ দুরবস্থার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে এবং বাগানের আয় সুনির্দিষ্ট করতে ইজারাদারদের সাথে স্থায়ীভাবে বরাদ্দ সম্পাদন করে।

ক. কোন নদীর তীরে পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল?

খ. 'অন্ধকূপ হত্যা' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের নতুন ব্যবস্থার সাথে তোমার পাঠ্যপুস্তকের কোন ঘটনার মিল খুঁজে পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত বন্দোবস্ত অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল? যুক্তি দাও।

নবম অধ্যায়

ইংরেজ শাসন আমলে বাংলায় প্রতিরোধ, নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

বাংলার কৃষক একসময়ে সূর্য উঠা ভোরে লাঙ্গল কাঁধে ছুটত তার ফসলের জমিতে। ফিরত অস্তগামী সূর্যকে সামনে রেখে। তার ঘরে অন্ন-বস্ত্রের প্রাচুর্য ছিল না, তবে অভাবও ছিল না। অভাব ছিল না আনন্দ-উৎসবের। বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকত। জারি, সারি, কীর্তন, যাত্রাপালা গানে জমে উঠত গ্রাম-বাংলার সান্ধ্য আসর। কিন্তু, পনের শতকের শেষদিকে ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের আগ্রাসী আগমন ধীরে ধীরে কেড়ে নিতে থাকে বাংলার কৃষকের মুখের হাসি, তাদের আনন্দ-উৎসব। এরই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে ইংরেজ বণিকদের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে উত্থান ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

প্রথমে তারা ধ্বংস করেছিল গ্রাম-বাংলার কুটির শিল্প, তারপর তাদের নজর পড়ে এদেশের উর্বর জমির উপর। অতিরিক্ত অর্থের লোভে ভূমি রাজস্ব আদায়ে একের পর এক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। যে পরীক্ষার নিষ্ঠুর বলি হয়, বাংলার কৃষক-সাধারণ মানুষ। এ কারণে বিদ্রোহ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। এ বিদ্রোহ ক্রমাগত চলতে থাকে আঠারো শতকের শেষার্ধ থেকে উনিশ শতকের শেষার্ধ পর্যন্ত।

এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে, যা পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। একই সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক চিন্তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে এ সমাজের শিক্ষিত মহলে। ফলে, হিন্দু সমাজে যেমন শিল্প, সাহিত্যে নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে, তেমনি উদ্ভব ঘটে মুক্তচিন্তা, মুক্তবুদ্ধির। শুরু হয় কুসংস্কার, গোঁড়ামি দূর করে হিন্দু ধর্মের সংস্কার। মুসলমান শিক্ষিত সমাজও সংস্কারের মাধ্যমে তাদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা অব্যাহত থাকে।

মূলত আঠারো ও উনিশ শতকজুড়ে এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক রাজনীতিতে বইতে থাকে পরিবর্তনের হাওয়া। এই পরিবর্তনের প্রথম সূচনা করে বাংলার কৃষক, সাধারণ মানুষ।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- ইংরেজ শাসনামলে বাংলায় প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রেক্ষিত এবং এর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব;
- নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলনে বিশেষ ব্যক্তিবর্গের অবদান মূল্যায়ন করতে পারব;
- ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রতিরোধ আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হব;
- বিভিন্ন সংস্কারক ও সংস্কার কর্মকাণ্ড জানার মাধ্যমে মুক্তচিন্তায় অনুপ্রাণিত হব।

প্রতিরোধ আন্দোলন

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন

বাংলার ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন ছিল একটি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন। আঠারো শতকের শেষার্ধে এই আন্দোলনের শুরু। এর আগে নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে ফকির-সন্ন্যাসীদের সাহায্য চান। এই ডাকে সাড়া দিয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে মীর কাশিম পালিয়ে গেলেও ফকির-সন্ন্যাসীরা তাদের ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। নবাবকে সাহায্য করার কারণে ইংরেজরা তাদের গতিবিধির প্রতি কড়া নজর রাখতে থাকে।

চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী, ফকির-সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাবৃত্তি বা মুষ্টি সংগ্রহের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। ধর্মীয় উৎসব, তীর্থস্থান দর্শন উপলক্ষে সারা বছর তারা এক স্থান থেকে আরেক স্থানে ঘুরে বেড়াত। তাদের সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য নানা ধরনের হালকা অস্ত্র থাকত। বাংলায় ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত তারা ছিল স্বাধীন এবং মুক্ত। কিন্তু, ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ চলাফেরায় বাধার সৃষ্টি করতে থাকে। তীর্থস্থান দর্শনের উপর করারোপ করে, ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে। তাছাড়া তাদেরকে ডাকাত-দস্যু বলে আখ্যায়িত করতে থাকে। ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে ফকির-সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়। বিদ্রোহী ফকির দলের নেতার নাম ছিল মজনু শাহ। আর সন্ন্যাসীদের নেতার নাম ছিল ভবানী পাঠক। তাদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য ছিল সরকারি কুঠি, জমিদারদের কাছারি ও নায়েব-গোমস্তার বাড়ি। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ শুরু করে।

১৭৭১ খ্রিষ্টাব্দে মজনু শাহ উত্তর বাংলায় ইংরেজবিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৭৭-১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ জেলায় ইংরেজদের সঙ্গে মজনু শাহ বহু সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তার যুদ্ধ কৌশল ছিল গেরিলা পদ্ধতি অর্থাৎ অতর্কিতে আক্রমণ করে নিরাপদে সরে যাওয়া। ইংরেজদের পক্ষে তাকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করা কখনই সম্ভব হয়নি। তিনি ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করলে বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসা শাহ, সোবান শাহ, চেরাগ আলী শাহ, করিম শাহ, মাদার বক্সসহ প্রমুখ ফকির। এই নেতারা কয়েক বছর ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখে। ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে তারা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়। অপরদিকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠক ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের নেতৃত্বে একদল ব্রিটিশ সৈন্যের আক্রমণে দুই সহকারীসহ নিহত হন। সন্ন্যাসী আন্দোলনের প্রধান নেতা ছিলেন তিনি। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সন্ন্যাসী আন্দোলনেরও অবসান ঘটে।

একক কাজ ঃ মীর কাশিমের পরাজয়ের সঙ্গে ফকির-সন্ন্যাসীদের প্রতি ইংরেজদের কড়া নজরের সম্পর্ক কী? এর পরিণতি কী হলো?

তিতুমিরের সংগ্রাম

তিতুমির

মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমির চব্বিশ পরগনা জেলার বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। উত্তর ভারত ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যখন ওয়াহাবি আন্দোলনের জোয়ার চলছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে বারাসাত অঞ্চলে এই আন্দোলন তিতুমিরের নেতৃত্বে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে। উনিশ শতকে ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজে এক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। বাংলায় তার দুইটি ধারা প্রবহমান ছিল। যার একটি ওয়াহাবি বা মুহাম্মদিয়া আন্দোলন, অপরটি ফরায়েজি আন্দোলন নামে খ্যাত। উভয় আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে মুসলিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথ নির্দেশ করা। বাংলার ওয়াহাবিরা তিতুমিরের নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল। তিতুমিরের নেতৃত্বে পরিচালিত তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া আন্দোলন ছিল উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদ শহীদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত।

তিতুমির হজ করার জন্য মক্কা শরিফ যান। ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং ধর্ম সংস্কার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে বহু মুসলমান বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা এবং নদীয়া জেলার বহু কৃষক, তাঁতি এই আন্দোলনে সাড়া দেয়। ফলে, জমিদাররা মুসলমান প্রজাদের উপর নানা ধরনের নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং তাদের প্রতি নির্যাতনমূলক আচরণ শুরু করে। তিতুমির এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে শান্তিপূর্ণভাবে সুবিচার চেয়ে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁর অনুসারীরা সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ অবলম্বন করেন। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে নারিকেলবাড়িয়া গ্রামে তিতুমির তাঁর প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করেন। নির্মাণ করেন শক্তিশালী এক বাঁশের কেল্লা। গোলাম মাসুমের নেতৃত্বে গড়ে তোলেন সুদক্ষ শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী।

ইংরেজ, জমিদার, নীলকরদের দ্বারা নির্যাতিত কৃষকরা দলে দলে তিতুমিরের বাহিনীতে যোগ দিলে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন একটি ব্যাপক কৃষক আন্দোলনে রূপ নেয়। ফলে শাসক-শোষক জমিদারশ্রেণি কৃষকদের সংঘবদ্ধতা এবং তিতুমিরের শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে তিতুমিরের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার এক বিশাল সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। মেজর স্কটের নেতৃত্বে এই বাহিনী তিতুমিরের নারিকেলবাড়িয়া বাঁশের কেল্লা আক্রমণ করে। ইংরেজদের কামান বন্দুকের সামনে বীরের মতো লড়াই করে পরাজিত হয় তিতুমিরের বাহিনী। তিনি যুদ্ধে নিহত হন। গোলার আঘাতে বাঁশের কেল্লা উড়ে যায়। এভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটে একটি সুসংঘটিত কৃষক আন্দোলনের। তিতুমির ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ব্যাপক কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইংরেজদের গোলাবারুদ, নীলকর, জমিদারদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে তাঁর বাঁশের কেল্লা ছিল দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক, যা যুগে যুগে বাঙালিকে অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহস যুগিয়েছে। প্রেরণা যুগিয়েছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যেতে।

একক কাজ ঃ ১। তিতুমিরের কোন কোন কর্মকাণ্ড দুঃসাহস আর দেশপ্রেমের প্রতীক এর তালিকা কর।
২। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন কৃষক আন্দোলনে পরিণত হলো– এর পেছনের কারণ অনুসন্ধান কর।

দলীয় কাজ ঃ শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপনের জন্য শিক্ষকের সহায়তায় তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা, তার প্রতীকী মূল্য, ব্রিটিশ শাসকদের প্রতিরোধে কেল্লার দুঃসাহসী ভূমিকা ও এর পরিণতির উপর একটি প্রেজেন্টেশন তৈরি কর।

নীল বিদ্রোহ

ইংরেজরা এদেশে এসেছিল ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। উপমহাদেশের শাসকদের দুর্বলতার সুযোগে তারা এদেশের শাসক হয়ে উঠে। তবে সব সময় তাদের ব্যবসায়ী বুদ্ধি ছিল সজাগ। এই সজাগ ব্যবসায়ী বুদ্ধির কারণেই বাংলার উর্বর ফসলের ক্ষেতে তাদের দৃষ্টি পড়ে। তারা এই উর্বর ক্ষেতগুলোতে খাদ্য ফসলের (খাবার ফসল) পরিবর্তে বাণিজ্য ফসল (বাণিজ্যের জন্য যে ফসল) উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে উঠে। নীল ছিল তাদের সেই বাণিজ্যিক ফসল।

ঐ সময়ে নীল ব্যবসা ছিল খুবই লাভজনক। বস্তুত শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাপড় রং করার জন্য ব্রিটেনে নীলের চাহিদা খুব বেড়ে যায়। তাছাড়া আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলো স্বাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইংরেজ বণিকদের সেখানকার নীল চাষ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বাংলা হয়ে উঠে নীল সরবরাহের প্রধান কেন্দ্র। ১৭৭০ থেকে ১৭৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজ আমলে বাংলাদেশে নীলচাষ শুরু হয়।

নীলচাষের জন্য নীলকরগণ কৃষকের সর্বোৎকৃষ্ট জমি বেছে নিত। কৃষকদের নীলচাষের জন্য অগ্রীম অর্থ গ্রহণে (দাদন) বাধ্য করা হতো। আর একবার এই দাদন গ্রহণ করলে সুদ-আসলে যতই কৃষকরা ঋণ পরিশোধ করুক না কেন, বংশ পরম্পরায় কোনো দিনই ঋণ শোধ হতো না। নীলচাষে কৃষকরা রাজি না হলে তাদের উপর চরম অত্যাচার চালানো হতো। বাংলাদেশে নীলের ব্যবসা ছিল একচেটিয়া ইংরেজ বণিকদের। ফরিদপুর, যশোর, ঢাকা, পাবনা, রাজশাহী, নদীয়া, মুর্শিদাবাদে ব্যাপক নীল চাষ হতো।

জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীল চাষের খরচও বৃদ্ধি পায়। নীলকররা বিষয়টি বিবেচনায় রাখত না। তাছাড়া, প্রথম দিকে তারা চাষিদের বিনামূল্যে নীল বীজ সরবরাহ করলেও পরের দিকে তাও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ক্রমাগত নীলচাষ চাষিদের জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

উপর্যুক্ত বঞ্চনার হাত থেকে চাষিদের বাঁচার কোনো উপায় ছিল না। আইন ছিল তাদের নাগালের বাইরে। আইন যারা প্রয়োগ করবেন, সেসব বিচারকদের বেশির ভাগ ছিল নীলকরদের স্বদেশি বা বন্ধু। আবার নীলকররাও অনেক সময় নিজেরাই অবৈতনিক (অনারারি) ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োগ পেতেন। ফলে, আইনের আশ্রয় বা সুবিচার পাওয়া চাষির জন্য ছিল অসম্ভব। এমতাবস্থায় নীলকর সাহেবরা বাংলার গ্রামাঞ্চলে শুধু ব্যবসায়ী রূপে নয় দোর্দণ্ড প্রতাপশালী এক

অভিনব অত্যাচারী জমিদার রূপেও আত্মপ্রকাশ করে। এরা এতটাই নিষ্ঠুর আর বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে অবাধ্য নীলচাষিকে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি।

শেষ পর্যন্ত দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া নীল চাষিরা ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রচণ্ড বিদ্রোহে ফেটে পড়ে। গ্রামে-গ্রামে কৃষকরা সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ হতে থাকে। এই সব বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেয় নীলচাষিরাই। যশোরের নীল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন নবীন মাধব ও বেণী মাধব নামে দুই ভাই। হুগলিতে নেতৃত্ব দেন বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সর্দার। নদীয়ায় ছিলেন মেঘনা সর্দার এবং নদীয়ার চৌগাছায় বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই। স্থানীয় পর্যায়ের এই নেতৃত্বে বাংলায় কৃষক বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। কৃষকরা নীল চাষ না করার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেয়। এমনকি তারা ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশও অগ্রাহ্য করে। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি নীলচাষিদের প্রতি সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রকাশ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনি ছাপা হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের লেখা 'নীলদর্পণ' নাটকের কাহিনি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

শেষ পর্যন্ত বাংলার সংগ্রামী কৃষকদের জয় হয়। ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার ইন্ডিগো কমিশন বা নীল কমিশন গঠন করে। এই কমিশনের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে নীল চাষকে কৃষকদের 'ইচ্ছাধীন' বলে ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া ইন্ডিগো কন্ট্রাক্ট বাতিল হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহের অবসান হয়। পরবর্তীকালে নীলের বিকল্প কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ায় ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে এদেশে নীলচাষ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

একক কাজ ঃ ১ কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে নীল বিদ্রোহ ঘটে-তার উপর কেস স্ট্যাডি প্রস্তুত কর।

২ বাংলায় চিরতরে নীল চাষ বন্ধ হওয়ার প্রেক্ষাপট তুলে ধরো।

ফরায়েজি আন্দোলন

ফরায়েজি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজি শরিয়তউল্লাহ বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলার শাসশাইল গ্রামে ১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘ বিশ বছর মক্কায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি ইসলাম ধর্মের উপর লেখাপড়া করে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।

দেশে ফিরে তিনি বুঝতে পারেন যে বাংলার মুসলমানরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তাদের মধ্যে অনৈসলামিক রীতিনীতি, কুসংস্কার, অনাচার প্রবেশ করেছে। ইসলাম ধর্মকে কুসংস্কার আর অনাচারমুক্ত করতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এই প্রতিজ্ঞার বশবর্তী হয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তিনি এক ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত করেন। হাজি শরিয়তউল্লাহর এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের নামই 'ফরায়েজি আন্দোলন'।

ফরায়েজি শব্দটি আরবি 'ফরজ' (অবশ্য কর্তব্য) শব্দ থেকে এসেছে। যারা ফরজ পালন করে তারাই ফরায়েজি। আর বাংলায় যাঁরা হাজি শরিয়তউল্লাহর অনুসারী ছিলেন, ইতিহাসে শুধু তাদেরকেই ফরায়েজি বলা হয়ে থাকে। ইসলাম অননুমোদিত সব বিশ্বাস, আচার-আচরণ ও অনুষ্ঠান ত্যাগ করে ইসলাম ধর্মে যা অবশ্য করণীয়, তা পালন করার জন্য তিনি মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানান। তিনি বাংলা তথা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পারেন নি। তিনি ইংরেজ রাজত্বকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' অর্থাৎ 'বিধর্মীর দেশ' বলে ঘোষণা করেন। তিনি বিধর্মী-বিজাতীয় শাসিত দেশে জুমা এবং দুই ঈদের নামাজ বর্জনের জন্য মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বাংলার শোষিত, নির্যাতিত দরিদ্র রায়ত, কৃষক, তাঁতি, তেলি সম্প্রদায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করে। শরিয়তউল্লাহর উপর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আস্থা, বিশ্বাস, তাঁর অসাধারণ সাফল্য নিম্নশ্রেণির জনগণের মধ্যে দৃঢ় ঐক্য গড়ে তোলে। মুসলমানদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে জমিদাররা বাধা প্রদান করতে থাকে। তিনি প্রজাদের অবৈধ কর দেওয়া থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন এবং জমিদারদের সব অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুতি নেন। দেশজুড়ে অভাব দেখা দিলে তিনি নুন-ভাতের দাবিও উত্থাপন করেন।

জমিদারশ্রেণি নানা অজুহাতে ফরায়েজি প্রজাদের উপর অত্যাচার শুরু করলে প্রজাদের রক্ষার জন্য তিনি লাঠিয়াল বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে তার উপর পুলিশি নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ফরায়েজি আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁর যোগ্যপুত্র মুহম্মদ মুহসিন উদ্দিন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া। তিনি ১৮১৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মতো পণ্ডিত না হলেও তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা ছিল অসাধারণ।

একক কাজ ঃ হাজি শরিয়তউল্লাহ যে ফরজের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তার একটি তালিকা তৈরি কর।

দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজি আন্দোলন একাধারে ধর্মীয় সংস্কার পাশাপাশি কৃষকশ্রেণির শোষণ মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হয়। যার ফলে এই আন্দোলনের চরিত্র শেষ পর্যন্ত শুধু ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। ইংরেজ শাসকদের চরম অর্থনৈতিক শোষণে বিপর্যস্ত বাংলার কৃষক এই আন্দোলনের মাধ্যমে শোষণবিরোধী প্রত্যক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হলো। নীলকর সাহেবদের নির্যাতন থেকে বাঁচার জন্য হাজার হাজার কৃষক ও শত শত জমিদার ফরায়েজি আন্দোলনে যোগদান করে।

দুদুমিয়া ছিলেন ফরায়েজিদের গুরু বা ওস্তাদ। পিতার মৃত্যুর পর তিনি শান্তিপ্রিয় নীতি পরিহার করে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। ফরায়েজিদের প্রতিরোধ সংগ্রামকে দৃঢ় এবং শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তিনি নিজে লাঠি চালনা শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর পিতার আমলের লাঠিয়াল জালালউদ্দিন মোল্লাকে সেনাপতি নিয়োগ করে এক সুদক্ষ লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের অবৈধ কর আরোপ এবং নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। এখানে উল্লেখ্য, ফরিদপুর, পাবনা, রাজশাহী, যশোর, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলো নীল চাষের জন্য ছিল উৎকৃষ্ট। সুতরাং এ অঞ্চলে নীলকরগণের অত্যাচারের মাত্রাও ছিল দুঃসহ। তাঁর নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছিল। কৃষক প্রজাসাধারণকে নিয়ে স্বাধীন সরকারের একটা সেনাবাহিনীও (লাঠিয়াল বাহিনী) গঠন করা হয়েছিল।

ফরায়েজিদের সরকারব্যবস্থায় পূর্ব বাংলাকে কতগুলো হলকা বা এলাকায় বিভক্ত করা হয়। দুদু মিয়া তাঁর অনুসারীদের নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী জমিদার, নীলকর সরকারের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চালিয়ে যান। দেশীয় জমিদাররা বিদেশি ইংরেজ সরকার ও নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক ফৌজদারি মামলা দায়ের করতে থাকে। কিন্তু, দুদু মিয়ার বিরুদ্ধে সাক্ষি না পেয়ে বারবার তাঁকে মুক্তি দিতে হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠলে ইংরেজ সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে। ভীত ইংরেজ সরকার দুদু মিয়াকে রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে কলকাতার কারাগারে আটকে রাখে। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মুক্তি পান এবং ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে এই দেশপ্রেমিক বিপ্লবীর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফরায়েজি আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

একক কাজ ঃ ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে দুদু মিয়াকে কারারুদ্ধ করে। এর পেছনের কারণগুলো ধারাবাহিকভাবে সাজাও।

নবজাগরণ ও সংস্কার আন্দোলন

নবজাগরণ

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশি যুদ্ধের পর এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের সূচনা হয়। আবার অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব এবং ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে) প্রভাবও এসে পড়ে এ অঞ্চলের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে। এ সময়ে বাংলার কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সংস্পর্শে আসেন। তাঁরাই বাংলায় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূচনা করেন। ইউরোপীয় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রভাবে এই শিক্ষিত বাঙালিদের মনে নবজাগরণের সূচনা হয়। এদের নেতৃত্বের প্রভাবে দেশবাসীর মধ্যে আত্মসচেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ তীব্রভাবে জাগ্রত হতে থাকে। নবজাগরণের প্রভাবেই শেষ পর্যন্ত এ দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাথমিক ভিত রচিত হয়, যা শেষ পর্যন্ত বাঙালিকে তথা ভারতীয়দের স্বাধীনতার পথে ঠেলে দেয়।

এই সময়ে প্রচলিত ধর্ম, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য, সামাজিক রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে এক ধরনের চিন্তার বিপ্লব সূচিত হয়। এই পরিণতিতে উদ্ভব ঘটে নতুন ধর্মমত (ব্রাহ্ম ধর্ম ও নব হিন্দুবাদ), নতুন শিক্ষা, নতুন সাহিত্য, নতুন সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতির। এই নতুনের মধ্যেই বাংলায় 'রেনেসাঁ' বা নবজাগরণের সূত্রপাত ঘটে। এভাবেই উপমহাদেশে তথা বাংলায় প্রথম নবজাগরণের বা রেনেসাঁর জন্ম। ফলে ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা হয়ে উঠে আধুনিক চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রস্থল। ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রভাবে বাঙালি পরিণত হয় পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক-বাহকে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা প্রত্যাখ্যান করে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাধীনতা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করে আধুনিক মানুষে পরিণত হন। এই নব ভাবধারা প্রসারে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কিছুসংখ্যক উদারচেতা প্রশাসকেরও অবদান রয়েছে। এঁরা দেশি ভাষা-সাহিত্যের উন্নতির জন্য ব্যাপক উৎসাহ দেখিয়েছেন। হেস্টিংস, এ্যালফিনস্টোন, ম্যালকম মনরো, মেটকাফ প্রমুখ ইংরেজ প্রশাসক ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য ভাবধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনে উজ্জীবিত করাকে তাঁদের নৈতিক ও মানবিক দায়িত্ব কর্তব্য বলে মনে করতেন। তাছাড়া খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রতিষ্ঠিত ছাপাখানাও আধুনিক শিক্ষার ভাবধারা প্রসারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

রাজা রামমোহন রায়

বাংলার নবজাগরণের স্রষ্টা ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দে হুগলী জেলার রাধানগর গ্রামে তাঁর জন্ম। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। বিশেষ করে আরবি, ফারসি, উর্দু, ল্যাটিন ও গ্রিক ভাষায় তিনি অসামান্য দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি বেদান্তসূত্র ও বেদান্তসারসহ উপনিষদের অনুবাদ প্রকাশ করেন। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে আছে তুহ্ফাতুল মুজাহহিদদীন (একেশ্বরবাদ সৌরভ), মনজারাতুল আদিয়ান (বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা), ভট্টাচার্যের সহিত বিচার, হিন্দুদিগের পৌত্তলিক ধর্মপ্রণালি ইত্যাদি। তাছাড়া তিনি সম্বাদ কৌমুদী, মিরাতুল আখবার ও ব্রাহ্মণিকাল ম্যাগাজিন নামে তিনটি পত্রিকার প্রকাশকও ছিলেন।

রাজা রামমোহন রায়

আধুনিক ভারতের রূপকার রাজা রামমোহন তৎকালীন সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক গতিধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। নিজের চিন্তাধারার আলোকে নতুন সমাজ গঠনে প্রয়াসী হন। তিনি হিন্দু সমাজের সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কার দূর করতে প্রচেষ্টা চালান। তাছাড়া তিনি সব কুসংস্কার দূর করে আদি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হন। হিন্দুধর্মের সংস্কার তথা নিজ ধর্মীয় মতবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে আত্মীয় সভা নামে একটি সমিতি গঠন করেন। ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ২০এ আগষ্ট তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরে ব্রাহ্মণসমাজের উপাসনালয় স্থাপন করেন। তাঁর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা উপমহাদেশের ধর্মীয় ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করে। শুধু সামাজিক আর ধর্মীয় বিষয় নয়, শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর অবদান ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশের মানুষের জন্য প্রয়োজন ইংরেজি শিক্ষার। এ কারণে তিনি নিজে সংস্কৃত পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রস্তাবিত সরকারি সংস্কৃত কলেজের প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। রাজা রামমোহন ১৮২২ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় 'অ্যাংলো হিন্দু স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে ইংরেজি, দর্শন, আধুনিক বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। এ দেশের মানুষকে সংস্কৃত শিক্ষার বদলে আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে চিঠি লেখেন। তাছাড়া ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ইংরেজ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ১ লক্ষ টাকা তিনি সংস্কৃত ও মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যয় না করে আধুনিক শিক্ষায় ব্যয় করার জন্যও আবেদন করেন।

১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় রেনেসাঁর স্রষ্টা রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পর ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়। ভারতীয়দের পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার সরকারি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কাজ ঃ রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত গ্রন্থ এবং প্রকাশিত পত্রিকাগুলোর তালিকা তৈরি কর।

ডিরোজিও ও ইয়াং বেঙ্গল মুভমেন্ট

হেনরি লুই ডিরোজিও ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল কলকাতা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন পর্তুগিজ এবং মা ছিলেন বাঙালি। ডিরোজিও ইংরেজি শিক্ষার স্কুল ডেভিড ড্রামন্ডের ধর্মতলা একাডেমিতে পড়ালেখা শুরু করেন। স্কুলে প্রধান শিক্ষক ড্রামন্ড ছিলেন প্রগতিবাদী, সংস্কারমুক্ত অসাম্প্রদায়িক চেতনা সমৃদ্ধ মানবতাবাদী অত্যন্ত নিষ্ঠাবান শিক্ষক। এই শিক্ষকের আদর্শ ডিরোজিওকে তাঁর শিশুকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রভাবিত করে রেখেছিল। যে কারণে পরবর্তীকালে তিনি হতে পেরেছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তরসূরি। তিনি ছিলেন 'রেনেসাঁ' যুগে বাঙালি যুব সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টিকারী 'ইয়াং বেঙ্গল' আন্দোলনের প্রবক্তা। বয়সে তরুণ হলেও তিনি ইতিহাস, ইংরেজি, সাহিত্য, দর্শনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দূরদৃষ্টি, বাগ্মিতা ও বিশ্লেষণক্ষমতা তৎকালীন তরুণ সমাজকে ব্যাপক প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে ছিল রাজা রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ধারা। দৃঢ়ভাবে সে ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্রবৃন্দ, ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের মাধ্যমে। যাঁর নেতৃত্বে ছিলেন হিন্দু কলেজের তরুণ অধ্যাপক হেনরি লুইস ডিরোজিও। তিনি তাঁর ছাত্র-অনুসারীদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করার শিক্ষা দেন।

ইয়াং বেঙ্গল আন্দোলনের সদস্যরা এ দেশবাসীকে বারবার এ কথাই বোঝাতে চেয়েছে যে তারা ব্রিটিশ কর্তৃক শাসিত ও শোষিত হচ্ছে। এ কারণে এই তরুণরা ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী সব কাজের ঘোর বিরোধিতা করেছে। যেমন– প্রেস আইন, মরিশাসে ভারতীয় শ্রমিক রপ্তানি, ভারতবাসীর স্বার্থের প্রতি উদাসীন ১৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দে চার্টার আইন এদের দ্বারা তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছে।

তরুণ সমাজের পুরোনো ধ্যান ধারণা পাল্টে দিতে ডিরোজিও প্রতিষ্ঠিত ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে একাডেমি অ্যাসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। একাডেমিতে তরুণদের এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান। নতুন চিন্তাধারায় প্রভাবিত তরুণরা সনাতনপন্থী হিন্দু এবং গোঁড়াপন্থী খ্রিষ্টানদের ধর্মবিশ্বাসেও আঘাত হানে। ফলে এরা ডিরোজিও এবং তার একাডেমির সদস্যদের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে ডিরোজিওর অনুপ্রেরণায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা 'পার্থেনন' নামে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এতে সমাজ, ধর্ম, বিভিন্ন কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকলে কলেজ কর্তৃপক্ষ এটি বন্ধ করে দেয়। তিনি ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে 'হিসপাবাস' নামক একটি পত্রিকা সম্পাদনা এবং 'ইস্ট ইন্ডিয়া' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ঐ বছরই ডিসেম্বরে মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

মৃত্যুর পরও তাঁর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে চলতে থাকে তাঁর হাতে গড়া অনুসারীরা। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারী ছাত্ররা বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখতে থাকে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ সিকদার, প্যারিচাঁদ মিত্র, কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি প্রমুখ। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর ছাত্র না হলেও তাঁর আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। ডিরোজিওর অনুসারীদের আন্দোলন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও প্রভাবিত করেছিল।

একক কাজ ঃ 'যুক্তিহীন বিশ্বাস হলো মৃত্যুর সমান'-এর আলোকে ডিরোজিওর কর্মকাণ্ড মূল্যায়ণ কর।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

পাণ্ডিত্য, শিক্ষা বিস্তার, সমাজ সংস্কার, দয়া ও তেজস্বিতায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন উনিশ শতকের বাংলায় একক ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রজ্ঞা ছিল প্রাচীন ভারতীয় ঋষির মতো, শৌর্য ছিল ইংরেজদের মতো, আর হৃদয় ছিল বাংলার কোমলমতি মায়েদের মতো।

এই অসাধারণ যুগ প্রবর্তক মহাপুরুষের জন্ম হয়েছিল ১৮২০ খ্রিষ্টাব্দে মেদেনিপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। তিনি তাঁর তেজস্বিতা, সত্যনিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন তাঁর দরিদ্র ব্রাহ্মণ পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে; আর হৃদয়ের মমত্ববোধ তাঁর মা ভাগবতীদেবীর কাছ থেকে। দারিদ্রের কারণে

রাতে বাতি জ্বালিয়ে পড়ার ক্ষমতা ছিল না। ফলে শিশু ঈশ্বরচন্দ্র সন্ধ্যার পর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তার গ্যাস বাতির নিচে দাঁড়িয়ে পড়াশোনা করতেন। তিনি ইংরেজি সংখ্যা গণনা শিখেছিলেন তাঁর বাবার সঙ্গে গ্রামের বাড়ি থেকে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসার সময়, রাস্তার পাশের মাইল ফলকের সংখ্যার হিসেব গুণতে গুণতে।

অসাধারণ মেধা আর অধ্যবসায়ের গুণে তিনি মাত্র একুশ বছর বয়সে সংস্কৃত সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, বেদান্ত, স্মৃতি, অলঙ্কার ইত্যাদি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। ঐ বয়েসে তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিতের দায়িত্ব লাভ করেন। একইসঙ্গে তিনি বিদ্যালয় পরিদর্শকের দায়িত্বও পালন করেন।

কর্মজীবনে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাহিত্য চর্চায়ও মনোযোগী হন। বাংলা ভাষায় উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দেখে তিনি গদ্যসাহিত্য রচনা শুরু করেন। তিনি বাংলা গদ্যসাহিত্যকে নবজীবন দান করেন। এ জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়। শিশুদের লেখাপড়া সহজ করার জন্য তিনি রচনা করেন বর্ণ পরিচয়ের প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাকে সহজ করার জন্য তিনি ব্যাকরণের উপক্রমণিকা রচনা করেন। তাছাড়া তিনি অনেক গ্রন্থের অনুবাদও করেছেন।

শুধু সাহিত্য নয়, শিক্ষা বিস্তারে তাঁর কৃতিত্ব অসাধারণ। সংস্কৃত শিক্ষার সংস্কার, বাংলা শিক্ষার ভিত্তিস্থাপন এবং নারীশিক্ষা প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা তাঁর অক্ষয় কীর্তি। তাছাড়া স্কুল পরিদর্শক থাকাকালে গ্রামে-গঞ্জে ২০টি মডেল স্কুল, ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। এখন এটি বিদ্যাসাগর কলেজ নামে খ্যাত।

তিনি একজন সফল সমাজ-সংস্কারকও ছিলেন। দেশে প্রচলিত নানা ধরনের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি রুখে দাঁড়ান। তিনি কন্যাশিশু হত্যা, বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন। তিনি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের পক্ষে কঠোর অবস্থান নেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের সম্মতিক্রমে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়।

বিদ্যাসাগর দান-দাক্ষিণ্যের জন্য খ্যাত ছিলেন। এ কারণে তাঁকে দয়ার সাগরও বলা হতো। যথেষ্ট স্বচ্ছল না হলেও বহু অনাথ ছাত্র তাঁর বাসায় থেকে লেখাপড়া করতো। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের চরম অর্থকষ্টের সময়ে বিদ্যাসাগর তাঁকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করেছেন। কবি নবীনচন্দ্র সেন তরুণ বয়সে বিদ্যাসাগরের অর্থে লেখাপড়া করেছেন।

তাঁর মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। মায়ের ইচ্ছায় তিনি গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ের ডাকে সাড়া দিয়ে তার কাছে যাওয়ার জন্য তিনি একবার ভরা বর্ষায় গভীর রাতে দামোদর নদ পার হয়ে বাড়ি যান।

এই সমাজ সেবক মহাজ্ঞানী ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে ৭১ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

একক কাজ ঃ বিদ্যাসাগরকে বাংলা গদ্যের জনক বলার কারণ অনুসন্ধান কর।

হাজি মুহম্মদ মহসিন

হাজি মুহম্মদ মহসিন

হাজি মুহম্মদ মহসিন ১৭৩২ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গের হুগলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মুহম্মদ ফয়জুল্লাহ। মায়ের নাম ছিল জয়নাব খানম। তাদের আদি নিবাস ছিল পারস্যে। হাজি মুহম্মদ মহসিনের পূর্বপুরুষ ভাগ্য অন্বেষণে হুগলী শহরে এসে বসবাস শুরু করেন।

মহসিনের শিক্ষাজীবন শুরু হুগলীতে। তাঁর গৃহশিক্ষক আগা সিরাজি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তাঁর কাছে আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। ভোলানাথ ওস্তাদ নামে একজন সঙ্গীতবিদের কাছে সঙ্গীত ও সেতার বাজানো শেখেন। তাঁর উচ্চশিক্ষা শুরু হয় মুর্শিদাবাদে। পিতার মৃত্যুর পর তিনি হুগলী ফিরে আসেন এবং ১৭৬২ খ্রিষ্টাব্দে দেশ ভ্রমণে বের হন। তিনি মক্কা, মদিনা গমন করেন এবং পবিত্র হজ পালন করেন। আরব,

মিশর, পারস্য ভ্রমণ করে তিনি সাতাশ বছর পর দেশে ফিরে আসেন। আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরেজি এবং ইতিহাস ও বীজগণিতে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল।

১৮০৩ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর একমাত্র বোনের মৃত্যু হলে নিঃসন্তান বোনের বিশাল সম্পত্তির মালিক হন তিনি। তিনি অত্যন্ত সাধারণ জীবনযাপন করতেন। তখন বাংলার মুসলমানদের ছিল চরম দুর্দিন। অর্থ ব্যয় করে লেখাপড়ার ক্ষমতা তাদের ছিল না। তিনি তাঁর সমুদয় অর্থ শিক্ষা বিস্তার চিকিৎসা এবং দরিদ্র মানুষের জন্য ব্যয় করেন।

তিনি হুগলীতে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দান করেন। মৃত্যুর ছয় বছর পূর্বে ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি ফান্ড গঠন করে জনহিতকর কার্যে সমস্ত সম্পত্তি দান করেন। মহসিন ফান্ডের অর্থে তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে হুগলী মহসিন ফান্ড, হুগলী দাতব্য চিকিৎসালয় এবং ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হুগলীতে ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীতে মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা করা হয়। মহসিন ফান্ডের বৃত্তির অর্থে হাজার হাজার মুসলমান তরুণ উচ্চ-শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়। এর মধ্যে বাংলার মুসলমান সমাজকে যাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার পথ দেখিয়েছিলেন, তাঁদের অগ্রদূত সৈয়দ আমির আলীও ছিলেন। এভাবে তিনি তাঁর মৃত্যুর পরও বাঙালি মুসলমানদের জন্য শিক্ষার পথ সুগম করে যান। এই দানশীল বিদ্যানুরাগী মহাপুরুষ ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে ২৯ নভেম্বর হুগলীতে পরলোকগমন করেন।

কাজ ঃ জনহিতকর কার্যে হাজি মুহম্মদ মুহসিনের অর্থ কোথায় কোথায় ব্যয় হয়েছে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

নওয়াব আবদুল লতিফ

আবদুল লতিফ ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা মাদ্রাসায় ইংরেজি শিক্ষা লাভ করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে তিনি প্রথমে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল এবং পরে কলকাতা মাদ্রাসায় অধ্যাপনা করেন। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে যোগদান করেন। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে তাকে কলকাতা প্রেসিডেন্সির ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত করা হয়। ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সরকারি চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। কর্মজীবনে তাঁর কৃতিত্বের জন্য সরকার তাঁকে প্রথমে খান বাহাদুর ও পরে নওয়াব উপাধিতে ভূষিত করে।

তিনি বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তারের প্রয়োজন এবং তাদের ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারেন। তাই তিনি মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদের কল্যাণের জন্য প্রচেষ্টা চালান। এই উদ্দেশ্যে জনমত গঠনের জন্য তিনি ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে 'মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে ইংরেজি শিক্ষার সুফল' শীর্ষক এক রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় কলকাতা মাদ্রাসায় অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগ খোলা হয়। সেখানে উর্দু, বাংলা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। উচ্চ-শিক্ষা গ্রহণে মুসলমান ছাত্রদের সমস্যার কথা তিনি সরকারের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সি কলেজে রূপান্তর করা হলে মুসলমান ছাত্ররা সেখানে পড়ালেখা করার সুযোগ পায়। তিনি ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আবদুল লতিফের প্রচেষ্টার কারণে ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে মহসীন ফান্ডের টাকা শুধু বাংলার মুসলমানদের শিক্ষায় ব্যয় হবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলোতে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি ইংরেজি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করা হয়। আবদুল লতিফের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হচ্ছে ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি বা মুসলিম সাহিত্য-সমাজ।

নওয়াব আবদুল লতিফের সারা জীবনের কর্মের মূল উদ্দেশ্য ছিল তিনটি :

১. মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ইংরেজ সরকারের বিদ্বেষভাব দূর করা;

২. মুসলমান সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; এবং

৩. হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করা।

একক কাজ ঃ নওয়াব আবদুল লতিফের কর্মের উদ্দেশ্য তিনটি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

সৈয়দ আমির আলি

উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজের নবজাগরণে যিনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন তিনি হলেন সৈয়দ আমির আলি। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক ও বৈষয়িক উন্নতি করতে চেয়েছেন। পাশাপাশি তিনি তাদের রাজনৈতিকভাবেও সচেতন করতে চেয়েছেন।

সৈয়দ আমির আলি ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে হুগলীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ, ও বি.এল ডিগ্রি লাভ করেন। ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডনের লিঙ্কন্স ইন থেকে ব্যারিস্টারি পাস করে দেশে ফেরেন। কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য হন।

বাংলা তথা ভারতে তিনিই প্রথম মুসলমান নেতা, যিনি বিশ্বাস করতেন মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এবং তাদের দাবি দাওয়ার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন থাকা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় 'সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

তিনি পত্র পত্রিকায় শিক্ষা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করেন। ফলে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে সরকার মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতির জন্য কতগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসায় কলেজ পর্যায়ে ইংরেজি শিক্ষা এবং করাচিতে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করেন।

তাঁর বিখ্যাত দুইটি গ্রন্থ ***'The Spirit of Islam'*** এবং ***'A Short History of the Saracens'*** এ ইসলাম ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা ও ইসলামের অতীত গৌরবের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, আধুনিক ভারতের উন্নতির জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের একযোগে কাজ করা প্রয়োজন। তিনি ১৯০৬ খ্রিষ্টাব্দে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানান। ১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। সৈয়দ আমির আলি নারী অধিকারের বিষয়েও সচেতন ছিলেন।

একক কাজ ঃ সৈয়দ আমির আলি মুসলমানদের অগ্রগতির জন্য কী কাজ করেছেন তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বেগম রোকেয়া

বেগম রোকেয়া

বিশ শতকের শুরুতে যখন ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো জ্বলছে, বাঙালি মুসলমান মেয়েরা তখনও পিছিয়ে ছিল। মুসলমান সমাজের মেয়েরা সব অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। লেখাপড়া শেখা তাদের জন্য একরকম নিষিদ্ধই ছিল। সমাজ ধর্মের নামে তাদের রাখা হতো পর্দার আড়ালে গৃহবন্দী করে।

মুসলমান মেয়েদের এই বন্দি দশা থেকে যিনি মুক্তির ডাক দিলেন, তাঁর নাম, বেগম রোকেয়া। ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার পায়রাবন্দ গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতার নাম জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ আবু আলি সাবের।

মায়ের নাম মোসাম্মৎ রাহাতুন্নেসা সাবেরা চৌধুরানি। ঐ অঞ্চলে সাবের পরিবার ছিল অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত এবং রক্ষণশীল। মেয়েরা ছিল খুবই পর্দানশিন। বেগম রোকেয়া তাঁর বড় ভাই ইব্রাহিম সাবের এবং বড় বোন করিমুন্নেসার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। তাঁকে পড়াশোনা করতে হতো গভীর রাতে, যাতে বাড়ির লোক টের না পায়। বড় ভাইয়ের একান্ত উৎসাহে তিনি উর্দু, আরবি, ফারসি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। স্কুলে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব না হলেও তিনি বাংলা ভাষায় যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করেন। কিশোর বয়স থেকেই তিনি সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

সাহিত্যচর্চার বিষয়বস্তুও ছিল নারী সমাজকে নিয়ে। তিনি সমাজের কুসংস্কার, নারী সমাজের অবহেলা-বঞ্চনার করুণ চিত্র নিজ চোখে দেখেছেন। যা উপলব্ধি করেছেন, তা-ই তিনি তাঁর লেখার মধ্যে তুলে ধরেছেন। সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন নারীদের করুণ দশা, তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের নমুনা। তাঁর 'অবরোধ বাসিনী', 'পদ্মরাগ', 'মতিচুর', 'সুলতানার স্বপ্ন' প্রভৃতি গ্রন্থে সে চিত্র ফুটে উঠেছে।

বিবাহিত জীবনে তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে জ্ঞানচর্চার উৎসাহ লাভ করেছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর জীবনের বাকি সময়টি নারী শিক্ষা আর সমাজসেবায় ব্যয় করেন। তিনি স্বামীর নামে ভাগলপুরে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল উর্দু প্রাইমারি স্কুল স্থাপন করেন। ১৯৩১ সালে এটি উচ্চ ইংরেজি গার্লর্স স্কুলে উন্নীত হয়। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা এবং সুপারিনটেনডেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে কলকাতায় আঞ্জুমান খাওয়াতিনে ইসলাম (মুসলিম মহিলা সমিতি) প্রতিষ্ঠা করেন। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর নেতৃত্বে সমিতি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।

নারীমুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ বেগম রোকেয়ার মনে নারীর প্রতি অত্যাচার ও অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে ছিল তীব্র ক্ষোভ ও বিদ্রোহের সুর। তিনি কর্মের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে এই মহীয়সী নারী কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

একক কাজ ঃ সমাজে নারীদের করুণদশা উল্লেখ করে বেগম রোকেয়া যে বইগুলো লিখেছিলেন তার একটি তালিকা তৈরি কর।

দলীয় কাজঃ
উপস্থিত বক্তৃতা : নবজাগরণ আন্দোলনের সংস্কারকদের সম্পর্কে উপস্থিত বক্তৃতার আয়োজন কর (লটারির মাধ্যমে নির্বাচন)।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. "সম্বাদ কৌমুদী" পত্রিকার প্রকাশক কে ছিলেন?

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
খ. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
গ. রাজা রামমোহন রায়
ঘ. হাজি শরিয়তউল্লাহ

২. ফকির সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়, কারণ ইংরেজরা-

i. তাদেরকে ডাকাত- দস্যু মনে করত
ii. তীর্থস্থান দর্শনের উপর করারোপ করত
iii. তাদের চলাফেরায় বাঁধার সৃষ্টি করত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সচেতন ও ধর্মীয় সুশিক্ষিত লোকের অভাবে রসুলপুর গ্রামের লোকজন নানারকম কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। কুসংস্কারচ্ছন্ন এ অঞ্চলের মানুষদের সঠিক পথের সন্ধান দিতে এগিয়ে আসেন আব্দুল্লাহ নামক একজন সচেতন ব্যক্তি।

৩. কোন ব্যক্তির জীবনের শিক্ষা কাজে লাগিয়ে আব্দুল্লাহ কুসংস্কারমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসেন?

ক. হাজি শরিয়তউল্লাহ　　খ. দুদু মিয়া

গ. তিতুমির　　ঘ. গোলাম মাসুম

৪. উক্ত ব্যক্তির আন্দোলনের ধরণ ছিল-

i. সামাজিক

ii. ধর্মীয়

iii. রাজনৈতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii　　খ. ii ও iii

গ. i ও iii　　ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১. রূপপুর অঞ্চলে দরিদ্র কৃষকদের জীবনধারা স্বচ্ছল ছিল না। বিভিন্ন সিগারেট কোম্পানির লোকজন তাদের এই অস্বচ্ছল জীবনধারার সুযোগ নিয়ে তাদেরকে চড়া সুদে অর্থ প্রদান করে অসম চুক্তির মাধ্যমে তামাক চাষে আগ্রহী করে তোলে। কৃষকদের প্রাপ্ত মূল্য উৎপাদন খরচের তুলনায় কম হওয়ায় তামাক চাষিরা কোম্পানির রাহুগ্রাস থেকে বের হতে না পেরে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। উপরন্তু টেলিভিশনে তামাকের স্বাস্থ্য ঝুঁকির কথা জেনে ঐ অঞ্চলের তামাক চাষিরা করিম ও জলিলের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং কোম্পানির এ ধরনের কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ জানায়।

ক. ভারতের প্রথম আধুনিক পুরুষ বলা হয় কাকে?

খ. ফরায়েজি আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?

গ. উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট তথ্যগুলো তোমার পাঠ্যপুস্তকে পঠিত কোন ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত ঘটনাটি কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় কতটুকু যুক্তিযুক্ত ছিল বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও।

২. সুলতানপুর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল। সেখানে এখনো নানা ধরনের সামাজিক কুসংস্কার বিরাজমান। এ গ্রামের মেয়েদের বাড়ির বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ জামিলা বেগম মেয়েদের পড়ালেখা করতে বাঁধা দেন। মেয়েদের বাড়ির বাইরে বের হওয়াকে তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের পরিপন্থী এবং গর্হিত কাজ মনে করতেন।

ক. 'The Spirit of Islam' বইটির লেখক কে?

খ. 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' গঠনের উদ্দেশ্য কী ছিল?

গ. উদ্দীপকে জামিলা বেগমের চরিত্রের বিপরীত চিত্র পাঠ্যপুস্তকে পঠিত কোন মহীয়সীর জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর বর্তমান নারী-শিক্ষার অগ্রগতিতে উক্ত মহীয়সীর অবদান অনস্বীকার্য? যুক্তি দাও।

দশম অধ্যায়
ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন

বাঙালিরা কখনই বিদেশি ইংরেজ শাসকদের মেনে নেয়নি। ফলে, পলাশি যুদ্ধের পর পরই এদেশের কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। পরাধীনতার একশ বছর পর স্বাধীনতা ঘোষণা করে এদেশের সৈনিকরা ও দেশীয় রাজরাজারা। পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণ সমাজ। বাঙালি তরুণ সমাজ সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দলে দলে আত্মাহুতি দিয়ে কাঁপিয়ে তোলে ইংরেজ শাসনের ভিত। উপমহাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে সবচেয়ে গৌরবময় ভূমিকা ছিল বাঙালিদের। এই অধ্যায়ে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামসহ পরবর্তী আন্দোলনসমূহে বাঙালি তথা তৎকালীন ভারতবাসীর গৌরবের ও আত্মত্যাগের ইতিহাস সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- ইংরেজ শাসন আমলে বাংলার স্বাধিকার ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং এর ফলাফল মূল্যায়ন করতে পারব;
- বিভিন্ন আন্দোলন সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হব;
- সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়ে উদ্বুদ্ধ হব।

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

পলাশি যুদ্ধের একশ বছর পর ভারতের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে প্রধানত সিপাহিদের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটিত হয়, তাকেই ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিকভাবে হেয় করা, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা সর্বোপরি ভারতীয় সৈনিকদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ–এসবই এই সংগ্রামের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। নিম্নে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো।

রাজনৈতিক : পলাশি যুদ্ধের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজ্য বিস্তার, একের পর এক দেশীয় রাজ্যগুলো দখল, দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে ভীতি, অসন্তোষ ও তীব্র ক্ষোভের জন্ম দেয়। লর্ড ডালহৌসি স্বত্ববিলোপ নীতি প্রয়োগ করে সাতারা, ঝাঁসি, নাগপুর, সম্বলপুর, ভগৎ, উদয়পুর, করাউলি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। স্বত্ববিলোপ নীতি অনুযায়ী দত্তক পুত্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারত না। তাছাড়া অপশাসনের অজুহাতে অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। এসব ঘটনায় দেশীয় রাজন্যবর্গ অতন্ত ক্ষুব্ধ হন।

অর্থনৈতিক : ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় চরম অর্থনৈতিক শোষণ বঞ্চনা। কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আগেই এদেশের শিল্প ধ্বংস করেছিল। ক্ষমতা দখলের পর ভূমি রাজস্ব নীতির নামে ধ্বংস করা হয় দরিদ্র কৃষকের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। আইন প্রয়োগের ফলে অনেক বনেদি জমিদার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

দরিদ্র কৃষকের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করা হয়। জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীদের তীব্র শোষণের শিকার এসব কৃষক মহাজনদের কাছে ঋণগ্রস্ত হয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।

একদিকে বাজার দখলের নামে স্থানীয় শিল্প ধ্বংস, অপর দিকে অতিরিক্ত অর্থ লাভের আশায় জমি বন্দোবস্তের নামে কৃষি ধ্বংস হয়। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এ অবস্থার শিকার সাধারণ মানুষ কোম্পানি শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠে।

সামাজিক ও ধর্মীয় ঃ উপমহাদেশের জনগণের ক্ষোভের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল সামাজিক ও ধর্মীয়। আঠারো শতকের শেষ ভাগে এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে পাশ্চাত্যের প্রভাব, কোম্পানির সমাজ সংস্কার জনকল্যাণমূলক হলেও গোটা রক্ষণশীল হিন্দু-মুসলমান এসব মেনে নিতে পারেনি। ইংরেজি শিক্ষা, সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ, হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিবাহ, খ্রিষ্টান ধর্মযাজকদের ধর্ম প্রচার ইত্যাদির ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের গোঁড়াপন্থীরা শঙ্কিত হয়ে উঠে। ধর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি বিভিন্নভাবে সংস্কারের কারণে ক্ষুব্ধ হয় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ।

সামরিক সামরিক বাহিনীতে ইংরেজ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যকার বৈষম্য বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। ইংরেজ সৈন্য ও ভারতীয় সিপাহিদের মধ্যে পদবি এবং বেতন-ভাতার মধ্যে বিরাট বৈষম্য ছিল। ভারতীয়দের সুযোগ-সুবিধাও কম ছিল। তাছাড়া পদোন্নতির সুযোগ থেকেও তারা বঞ্চিত ছিল। তার উপর ব্রিটিশ অফিসারদের পক্ষপাতিত্ব, ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

তাছাড়া হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিদের ব্যবহারের জন্য 'এনফিল্ড' রাইফেলের প্রচলন করা হয়। এই রাইফেলের টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে প্রবেশ করাতে হতো। সৈন্যদের মধ্যে ব্যাপকভাবে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে এই টোটায় গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত আছে। ফলে উভয়ই ধর্মনাশের কথা ভেবে বিদ্রোহী হয়ে উঠল।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ বিদ্রোহের আগুন প্রথমে জ্বলে উঠে পশ্চিম বঙ্গের ব্যারাকপুরে। ১৮৫৭ সালের ২৯এ মার্চ বন্দুকের গুলি ছুড়ে বিদ্রোহের সূচনা করেন মঙ্গলপাণ্ডে নামে এক সিপাহি। দ্রুত এই বিদ্রোহ মিরাট, কানপুর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, বিহার, বাংলাসহ ভারতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী এই বিদ্রোহে শামিল হয়।

কাজ বাংলাদেশের কোথায় কোথায় এ সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়েছিল– বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে সে অঞ্চলগুলো দেখাও।

বিদ্রোহীরা দিল্লি দখল করে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে ভারতবর্ষের বাদশা বলে ঘোষণা করে। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন নানা সাহেব, ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ, অযোদ্ধার বেগম হজরত মহল, মৌলভি আহমদ উল্লাহসহ ক্ষুব্ধ বঞ্চিত দেশীয় রাজন্যবর্গ। বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় সিপাহি ও যুদ্ধরত বিদ্রোহী নেতারা প্রাণপণ লড়াই করে পরাজিত হন। এই সংগ্রামে জড়িত অধিকাংশ হয় যুদ্ধে শহিদ হন অথবা তাদের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

বাহাদুর শাহ পার্ক

মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে (মায়ানমার) নির্বাসিত করা হয়। রানি লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধে নিহত হন। নানা সাহেব পরাজিত হয়ে অন্তর্ধান করেন। সাধারণ সৈনিক বিদ্রোহীদের উপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতন। ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে ঝুলিয়ে রাখা হয় অনেক সৈনিকের লাশ। এ ধরনের বীভৎস ঘটনা ঘটিয়ে শাসকগোষ্ঠী জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে। ফলে নির্যাতনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। ১৮৫৮ সালের জুলাইয়ের মধ্যে সব আন্দোলন শেষ হয়ে যায়। তবে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের গুরুত্ব ঃ এই বিদ্রোহের তাৎক্ষণিক গুরুত্বও ছিল। এর ফলে কোম্পানি শাসনের অবসান হয়। ব্রিটিশ সরকার ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর মহারানি ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য নিয়ম বাতিল করা হয়। তাছাড়া এই ঘোষণাপত্রে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতীয়দের চাকরি প্রদান এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি ক্ষমা ঘোষণা করা হয়।

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়। এই বিদ্রোহের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব হচ্ছে এই বিদ্রোহের ক্ষোভ থেমে যায়নি। এই সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণ সচেতন হয়ে উঠে এবং আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটায়।

কাজ কোন অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশে সিপাহিরা বিদ্রোহ করে, সে কারণগুলো চিহ্নিত কর।

বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫ -১৯১১ খ্রিষ্টাব্দ)

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গের প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদয়ের সম্প্রীতি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। একে অপরকে শত্রু ভাবতে শুরু করে। উভয়ের মধ্যে অবিশ্বাস বৃদ্ধি পেতে থাকে। নেতাদের উদার প্রচেষ্টা, যৌথ রাজনৈতিক কর্মসূচির ফলে মাঝে মাঝে ঐক্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বিভেদ নীতিরই জয় হয়। উভয় সম্প্রদয়ের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও শত্রুতার অবসান ঘটে। পরিণতিতে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে উপমহাদেশ ভাগ হয়।

বঙ্গভঙ্গ পটভূমি ঃ ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা ভাগ করেন। এই বিভক্তি ইতিহাসে বঙ্গভঙ্গ নামে পরিচিত। ভাগ হবার পূর্বে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও আসামের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত ছিল বাংলা প্রদেশ বা বাংলা প্রেসিডেন্সি। বঙ্গভঙ্গের এই পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। বাংলা প্রেসিডেন্সির আয়তন অনেক বড় হওয়ার কারণে ১৮৫৩ থেকে ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এর সীমানা পুনর্বিন্যাসের অনেক প্রস্তাব ব্রিটিশ সরকারি মহলে উপস্থাপন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৩ সালে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯০৪ সালে ভারত সচিব এটি অনুমোদন করেন এবং ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়। এই বছর অক্টোবরে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, আসাম, জলপাইগুড়ি, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ নিয়ে গঠিত হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ। প্রদেশের রাজধানী হয় ঢাকা। অপরপক্ষে পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় পশ্চিম বাংলা প্রদেশ, যার রাজধানী হয় কলকাতা।

বঙ্গভঙ্গের কারণ ঃ বঙ্গভঙ্গের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল, যা নিচে উল্লেখ করা হলো-

প্রশাসনিক কারণ : লর্ড কার্জনের শাসনামলে বঙ্গভঙ্গ ছিল একটি প্রশাসনিক সংস্কার। উপমহাদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোকের বসবাস ছিল বাংলা প্রেসিডেন্সিতে। কলকাতা থেকে পূর্বাঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা ছিল কঠিন কাজ। যে কারণে লর্ড কার্জন এত বড় অঞ্চলকে একটি প্রশাসনিক ইউনিটে রাখা যুক্তিসংগত মনে করেন নি। তাই ১৯০৩ সালে বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার পরিকল্পনা করেন এবং ১৯০৫ সালে তা কার্যকর হয়।

আর্থ-সামাজিক কারণ ঃ বাংলা ভাগের পেছনে আরো কারণ ছিল যার একটি অর্থনৈতিক, অপরটি সামাজিক। তখন কলকাতা হয়ে উঠেছিল আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র। শিল্প, কারখানা, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সবকিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতাকে ঘিরে। যা কিছু উন্নতি অগ্রগতি, সবই ছিল কলকাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফলে, পূর্ব বাংলার উন্নতি ব্যাহত হয়। অথচ এখান থেকে যে কাঁচামাল সরবরাহ করা হতো তার জন্যও সুষ্ঠু যোগাযোগব্যবস্থা ছিল না। ফলে পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে খারাপ হতে থাকে। উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারায় এ অঞ্চলের লোকজন অশিক্ষিত থেকে যায়। কর্মহীনদের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে থাকে। এ অবস্থার কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গের প্রয়োজন ছিল।

রাজনৈতিক কারণ ঃ লর্ড কার্জন শুধু শাসন-সুবিধার জন্য বা পূর্ব বাংলার জনগণের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে বঙ্গভঙ্গ করেন নি। এর পেছনে ব্রিটিশ প্রশাসনের সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক স্বার্থও জড়িত ছিল। লর্ড কার্জন বাংলার রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। বাঙালি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণি ক্রমশ জাতীয়তাবাদ ও রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠেছিল। বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। কংগ্রেস নেতারা কলকাতা থেকেই সারা ভারতের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। সুতরাং কলকাতাকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থামিয়ে দেওয়া ছিল এর মূল উদ্দেশ্য। হিন্দু ও মুসলমান সম্মিলিত শক্তি, ঐক্যবদ্ধ বাংলা ছিল বৃটিশ প্রশাসনের জন্য বিপদজনক। ফলে বাংলা ভাগ করে একদিকে বাঙালির শক্তিকে দুর্বল করা হলো, অপরদিকে পূর্ব বাংলার উন্নয়নের নামে মুসলমান সম্প্রদায়কে খুশি করা হলো। এভাবেই কার্জন 'বিভেদ ও শাসন' নীতি প্রয়োগ করে যতটা না পূর্ব বাংলার কল্যাণে, তার চেয়ে বেশি ব্রিটিশ ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার স্বার্থে বাংলা ভাগ করেন। এভাবে কৌশলে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যকে দুর্বল করার ব্যবস্থা করা হলো।

বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ঃ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার ফলে বাংলার মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পূর্ব বাংলার মুসলমানরা নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। মুসলিম পত্র-পত্রিকাগুলোও বঙ্গ বিভাগে সন্তোষ প্রকাশ করে। নতুন প্রদেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলমান। সুতরাং পূর্ব বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলমান সম্প্রদায় শিক্ষা-দীক্ষা এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাবে এ আশায় তারা বঙ্গভঙ্গের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রদান করে।

অপরদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। এর পেছনের কারণ সম্পর্কে কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন উঁচুতলার মানুষ অর্থাৎ পুঁজিপতি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, জমিদার, আইনজীবী, সংবাদপত্রের মালিক, রাজনীতিবিদদের স্বার্থে আঘাত লাগার কারণে এরা বঙ্গভঙ্গের ঘোর বিরোধিতা শুরু করে। তবে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষার কারণে হোক বা জাতীয় ঐক্যের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে হোক, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। এই আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলকসহ গোখলের মতো উদারপন্থী নেতাও অংশ নেন। সুখেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বঙ্গভঙ্গকে জাতীয় দুর্যোগ বলে আখ্যায়িত করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে রূপ নেয়। চরমপন্থী নেতাদের কারণে এই আন্দোলনের সঙ্গে সশস্ত্র কার্যকলাপও যুক্ত হয়। ব্রিটিশ সরকার আন্দোলনকারীদের দমন করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রহিত করে। রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত সফরে এসে ১৯১১ সালে দিল্লির দরবারে বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণা দেন।

বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে হিন্দু সম্প্রদায় খুশি হয়, আর কংগ্রেস মনে করে এটি তাদের নীতির জয়। কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গ রদে প্রচণ্ড মর্মাহত হয়। ব্রিটিশ সরকার ও কংগ্রেসের প্রতি তাদের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে শুরু করে কংগ্রেস মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ একে ব্রিটিশ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার জঘন্য উদাহরণ বলে মন্তব্য করেন।

বঙ্গভঙ্গের পর থেকে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল ধরে। এরপর থেকেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সূত্রপাত। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ গঠিত হলে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক পথ আলাদা হয়ে যায়। মুসলমানদের জন্য ক্রমশ স্বতন্ত্র জাতি-চিন্তা তীব্র হতে থাকে।

একক কাজ ঃ বঙ্গভঙ্গের পিছনে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চিহ্নিত কর।

স্বদেশি আন্দোলন

ব্রিটিশ সরকারের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যর্থ হলে কংগ্রেসের উগ্রপন্থী অংশের নেতৃত্বে যে আন্দোলন গড়ে উঠে, তাকেই স্বদেশি আন্দোলন বলা হয়। এ আন্দোলনের মূল কর্মসূচি ছিল দুইটি– বয়কট ও স্বদেশি।

'বয়কট' আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিলেতি পণ্য বর্জন। ক্রমে ক্রমে 'বয়কট' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। বয়কট শুধু বিলেতি পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বিলেতি শিক্ষা বর্জনও কর্মসূচিতে যুক্ত হয়। ফলে স্বদেশি আন্দোলন শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে রূপ নেয়। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন করার অপরাধে সরকারি স্কুল-কলেজ থেকে বহু শিক্ষার্থীকে বের করে দেওয়া হয়, যে কারণে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় এবং কয়েকটি কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্রও গড়ে উঠে।

স্বদেশি আন্দোলন ক্রমশ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিলেতি শিক্ষা বর্জনের মতো পণ্য বর্জনের জন্যও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। স্থানে স্থানে সমিতির মাধ্যমে বিলেতি পণ্য বর্জন এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারে শপথ নেওয়া হয়। কংগ্রেস নেতারা গ্রামে-গঞ্জে-শহরে প্রকাশ্য সভায় বিলেতি পণ্য পুড়িয়ে ফেলা এবং দেশীয় পণ্য ব্যবহারের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করতে থাকেন। ফলে বিলেতি পণ্যের চাহিদা কমে যেতে থাকে। একই সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এ সময় দেশি তাঁতবস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি ও চামড়ার দ্রব্য তৈরির কারখানা গড়ে উঠে।

স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ যুক্ত হতে থাকে। আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন বাড়ানোর জন্য বাংলার জেলায় জেলায় বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়, যেমন- ঢাকায় অনুশীলন, কলকাতায় যুগান্তর সমিতি, বরিশালে স্বদেশি বান্ধব, ফরিদপুর ব্রতী, ময়মনসিংহে সাধনা ইত্যাদি সংগঠনের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ করার মতো। জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কবি-সাহিত্যিকরা দেশাত্মবোধক বিভিন্ন রচনা পত্রিকায় লিখতে থাকেন। এসব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেন প্রমুখ। বরিশালের চারণ কবি মুকুন্দ দাস গ্রামে গ্রামে গান গেয়ে আন্দোলনের পক্ষে মানুষের মনে দেশপ্রেম জাগাতেও সক্ষম হন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এক্ষেত্রে বেঙ্গলি, সঞ্জীবনী, যুগান্তর, অমৃতবাজার, সন্ধ্যা হিতবাদীসহ বাংলা-ইংরেজি পত্রিকা স্বদেশ প্রেম ও বাঙালি জাতীয় চেতনায় সমৃদ্ধ লেখা ছাপতে থাকে। বাংলার নারীসমাজ স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ নিতে শুরু করে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পূর্ব বঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থবিরোধী হলেও কিছু মুসলমান নেতা প্রাথমিক পর্যায়ে সমর্থন করেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে তারা স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনে যোগ দেন নি। তাছাড়া স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দুধর্মের আদর্শ-আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব থাকার কারণে মুসলমান সমাজ এ থেকে দূরে থাকে। স্বদেশি আন্দোলনের দৃঢ় সমর্থক ছিল বাংলার জমিদার শ্রেণি। কারণ বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক ছিল মুসলমান। তারা ভূমিব্যবস্থার কারণে চরমভাবে শোষিত হচ্ছিল। অত্যাচারিত হচ্ছিল জমিদার ও তাদের নায়েব-গোমস্তাদের দ্বারা। যে কারণে জমিদারদের প্রতি কৃষকরা ক্ষুব্ধ ছিল। আবার এই জমিদারদের অধিকাংশ ছিল হিন্দু। জমিদারের অত্যাচারে অতিষ্ট অনেক দরিদ্র হিন্দু কৃষকও বঙ্গভঙ্গের সমর্থক ছিল।

দলীয় কাজ ঃ যেসব পত্রপত্রিকা বঙ্গভঙ্গের বিরোধী ছিল, সেগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত কর। স্বদেশি আন্দোলনের ফলে গড়ে উঠা বিপ্লবী সমিতিগুলোর নামের পাশে অঞ্চলের নাম সাজাও।

মুসলমান সমাজ দূরে থাকার কারণে স্বদেশি আন্দোলন জাতীয় রূপলাভে ব্যর্থ হয়। এ আন্দোলনের মাধ্যমে বিলেতি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনও সফল হয়নি। কারণ কলকাতার মাড়ওয়ারি অবাঙালি ব্যবসায়ী এবং বাংলার গ্রামগঞ্জের ব্যবসায়ীরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। সর্বোপরি গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে অগ্রসর হলে এ আন্দোলন থেকে জনগণ দূরে সরে যায়। ফলে গণবিচ্ছিন্ন আন্দোলন সফলতার দ্বারে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়।

মুসলিম সমাজ এই আন্দোলন থেকে দূরে থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে আন্দোলন শক্তিশালী হতে পারেনি। সাধারণ মানুষ, এমনকি নিম্নবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়, দরিদ্র সমাজও এই আন্দোলনের মর্ম বোঝার চেষ্টা করেনি। ফলে আন্দোলন সর্বজনীন এবং জাতীয় রূপ লাভ করতে ব্যর্থ হয়। এর উপর চলে ইংরেজ সরকারের চরম দমননীতি, পুলিশি অত্যাচার। সবকিছু মিলে শেষ পর্যন্ত আন্দোলন ব্যর্থ হয়।

স্বদেশি আন্দোলনে তাৎক্ষণিক সফলতা না এলেও এর ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গণসচেতনতার জন্ম হয়। এ আন্দোলন উপমহাদেশে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করে। আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রসমাজ যুক্ত হওয়ার কারণে গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমনই জনগণ রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে।

ভারতের পরবর্তী আন্দোলনগুলোতে তাদের উপস্থিতির শুরু এখান থেকেই। এই আন্দোলনের আরেকটি ইতিবাচক দিক হচ্ছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এর ফলে দেশি শিল্প-প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা স্থাপনের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এদেশীয় ধনী ব্যক্তিরা কল-কারখানা স্থাপন করতে থাকেন। যেমন: স্বদেশি তাঁত বস্ত্র, সাবান, লবণ, চিনি, কাগজ, চামড়াজাত দ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন স্থানে কল-কারখানা স্থাপিত হয়। ঐ সময় আধুনিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান যেমন বেঙ্গল ক্যামিকেল প্রতিষ্ঠিত হয়, বিখ্যাত টাটা কোম্পানি ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে কারখানা স্থাপন করে। তাছাড়া আরো ছোটখাটো দেশি শিল্প কারখানা এই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বিজ্ঞান, শিক্ষা, ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার প্রতি আগ্রহ উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত, মুকুন্দ দাসের বাঙালি জাতি চেতনায় সমৃদ্ধ এবং দেশাত্মবোধক গানগুলো ঐ সময় রচিত। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি রবীন্দ্রনাথ ঐ সময় রচনা করেন যা আমাদের জাতীয় সংগীত।

স্বদেশি আন্দোলনের হতাশার দিক হচ্ছে, এই আন্দোলনের কারণে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্কে ফাটল ধরে। নানা ঘটনার মাধ্যমে এই তিক্ততা ক্রমশ বাড়তে থাকে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে ভাঙ্গনের সূত্রপাত, স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে তা আরো তিক্ত হয়। ফলে সম্পর্কের এই ভাঙ্গন এদেশের রাজনীতি, সমাজ ও জাতীয় কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রে সর্বাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে থাকে, যা শেষ হয় ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের মধ্য দিয়ে।

একক কাজ ঃ স্বদেশি আন্দোলনের ফলে যেসব দেশীয় শিল্প স্থাপিত হয় তার একটি তালিকা তৈরি কর।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন ঃ হিন্দু ও মুসলমানের মিলিত সংগ্রাম হিসেবে উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আন্দোলন দুটি ছিল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাপক ও জাতীয়ভিত্তিক গণ-আন্দোলন। হিন্দু-মুসলমানের এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। তুরস্কের খলিফার মর্যাদা ও তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য ভারতীয় মুসলিম সমাজ এই আন্দোলন গড়ে তোলে। অপরদিকে অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জন্য স্বরাজ অর্জন।

খিলাফত আন্দোলনের কারণ ঃ ভারতের মুসলমানেরা তুরস্কের সুলতানকে মুসলিম বিশ্বের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা বলে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তুরস্কের সুলতান ব্রিটিশবিরোধী শক্তি জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করলে ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় বিব্রত হন। কারণ ধর্মীয় কারণে তারা খলিফার অনুগত, আবার অন্যদিকে রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ সরকারের অনুগত থাকতে বাধ্য। নিজ দেশের সরকার হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানরা ব্রিটিশ সরকারকেই সমর্থন দিয়েছে। তবে শর্ত ছিল যে এই সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের খলিফার কোনো ক্ষতি করবে না। কিন্তু, যুদ্ধে জার্মানি হেরে গেলে তুরস্কের ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধ শেষে জার্মানির পক্ষে যোগদানের জন্য ১৯২০ সালে সেভার্সের চুক্তি অনুযায়ী শাস্তিস্বরূপ তুরস্ককে খণ্ডবিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা করা হয়। এতে ভারতীয় মুসলমানরা মর্মাহত হয় এবং ভারতীয় মুসলমানরা খলিফার মর্যাদা এবং তুরস্কের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলে, যা ইতিহাসে খিলাফত আন্দোলন নামে খ্যাত। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন দুই ভাই মাওলানা মোহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলী।

বাংলায় খিলাফত আন্দোলন ঃ খিলাফত কমিটি গঠনের জন্য ১৯১৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ঢাকায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কমিটি গঠনসহ খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা মুহাম্মদ আলী ও মাওলানা শওকত আলীর মুক্তি দাবি করা হয়। অমৃতসরের খিলাফত কমিটি কর্তৃক আহূত নিখিল ভারত খিলাফত কমিটির অধিবেশনে ৬ জন প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯২০ সালে খিলাফত 'ইসতেহার' প্রকাশ করা হয় এবং সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানানো হয়। বাংলার হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেয়। খিলাফত আন্দোলনের নেতা মাওলানা শওকত আলী ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ঢাকায় আসেন। ঢাকার জনগণ তাদের 'আল্লাহু আকবার' ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানায়। তাছাড়া ১৯এ মার্চ হরতালের দিন মুসলমান সম্প্রদায় রোজা এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন উপোস থাকে। এদিন ঢাকায় এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্তে বলা হয় যে খিলাফত অক্ষুণ্ন না থাকলে মুসলমানদের ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অনুগত থাকা অসম্ভব। এ বছর ১৩ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড স্মরণে এক সভা হয়। পাশাপাশি খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচিও পালিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন ঃ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের পেছনে বিভিন্ন কারণ ছিল। ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া ব্রিটিশ সরকারের দমননীতির কারণে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে নতুন ধারার জন্ম দেয়। ১৯১৯ সালে সরকার রাওলাট আইন পাস করে। এই আইনে যেকোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতার এবং সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আদালতে দণ্ড দেয়ার ক্ষমতা পুলিশকে দেওয়া হয়। এই আইন ভারতের সর্বস্তরের মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অহিংস আন্দোলনে বিশ্বাসী মহাত্মা গান্ধীর ডাকে এই নিপীড়নমূলক আইনের বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল হরতাল পালিত হয়। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে অন্যান্য স্থানের মতো পাঞ্জাবেও আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৩ই এপ্রিল পাঞ্জাবের অমৃতসরে এক সভায় জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে বহু নিরস্ত্র মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইতিহাসে এই নরকীয় হত্যাযজ্ঞের ঘটনা 'জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। এই হত্যাকাণ্ডের তদন্তের জন্য কংগ্রেস বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন। সরকারের দমননীতির পাশাপাশি চলে সংবাদপত্রে হস্তক্ষেপ। তাছাড়া মহাযুদ্ধের সৃষ্ট অর্থনৈতিক মহামন্দার কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দেয়। এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানান। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে খিলাফত আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯২১-২২ খ্রিষ্টাব্দে এই আন্দোলন সর্ব-ভারতীয় গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়।

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য ঃ

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বিভিন্ন দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানরা যেমন প্রথমবারের মতো ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগ দেয়, তেমন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় প্রথমবারের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনে নামে। কিছুদিনের জন্য হলেও ব্রিটিশ বিভেদ ও শাসননীতি ব্যর্থ হয়। ফলে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির এক রাজনৈতিক আবহ সৃষ্টি হয়। অপর দিকে এই ঐক্য ব্রিটিশ সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। এই আন্দোলন শুধু শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের নয়, সারা ভারতের জনগণের মধ্যে এক রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। তবে এই আন্দোলন এবং হিন্দু-মুসলিম ঐক্য দুই-ই ছিল ক্ষণস্থায়ী। আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন (১৯১১ - ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দ)

স্বদেশি আন্দোলনের ব্যর্থতা বাংলার স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক যুব সমাজকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ঠেলে দেয়। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন করার যে গোপন তৎপরতার সূত্রপাত ঘটে, তাকেই বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন বলা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে বিভিন্ন অঞ্চলে অতর্কিত বোমা হামলা, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী হত্যা, গেরিলা পদ্ধতিতে খণ্ডযুদ্ধ ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ্যে চলে আসতে থাকে।

১৯১১ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত এই সংগ্রাম জোরদার হলেও এর আগেই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। ১৯০৮ সালে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ক্ষুদিরামের বোমা হামলার মধ্য দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করে। এই আন্দোলন মূলত শেষ হয় ১৯৩০ সালে। তবে এর পরেও বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র আক্রমণের ঘটনা ঘটে।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদের আগেই বাংলার প্রথম পর্যায়ের সশস্ত্র আন্দোলন কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। প্রথম পর্যায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, রবীন্দ্র ঘোষ, ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত প্রমুখ। পুলিন বিহারী দাস ছিলেন ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান সংগঠক। এরা বোমা তৈরি থেকে শুরু করে সব ধরনের অস্ত্র সংগ্রহসহ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। সশস্ত্র আক্রমণ, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে এরা সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখেন। অপরদিকে লেফটেন্যান্ট গভর্নর ফুলারকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার চেষ্টায় নিয়োজিত প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করেন এবং ধরা পড়ার পর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। এছাড়া মানিকতলা বোমা হামলাসহ নানা অভিযোগে বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে ঐ সময় ফাঁসি দেওয়া হয়। বেশ কয়েকজন বিপ্লবীকে কারাবন্দী ও দ্বীপান্তরে প্রেরণ করা হয়। এই সমস্ত চরম দমননীতির কারণে প্রথম পর্যায়ে সশস্ত্র বিপ্লব স্থিমিত হয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয় ১৯১২ সালে। এই আন্দোলন কলকাতাকেন্দ্রিক হলেও ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলেও। এই সময় বিপ্লবীরা আবার হত্যা, বোমা হামলা, ডাকাতি ইত্যাদি কার্যক্রম শুরু করেন। এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় গোপনে বোমার কারখানা স্থাপন করা হয়। এর মধ্যে কলকাতা ও পূর্ব বাংলার যশোর, খুলনায় অনেক সশস্ত্র ডাকাতির ঘটনা ঘটে। ১৯১২ সালের শেষের দিকে দিল্লিতে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায় লর্ড হার্ডিংকে হত্যার জন্য বোমা হামলা চালানো হয়। হার্ডিং বেঁচে যান। কিন্তু, বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে ধরার জন্য ইংরেজ সরকার এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে বাংলার অনেক বিপ্লবী বিদেশ থেকে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহের মতো দুঃসাহসী চেষ্টাও করেছেন। এদের উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে দেশ স্বাধীন করা। এদের মধ্যে ছিলেন বাঘা যতীন (যতীন্দ্রনাথ মুখোপধ্যায়) ডা. যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ। এরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ শক্তির প্রতিপক্ষ জার্মানি থেকে অস্ত্র সাহায্যের আশ্বাস পান। তবে সরকার গোপনে এ খবর জানতে পেরে কৌশলে বাঘা যতীনসহ তার সঙ্গীদের গ্রেফতারের ব্যবস্থা করে। গ্রেফতারের সময় পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে চিত্তপ্রিয় নামের, এক বিপ্লবী শহিদ হন। বাঘা যতীন তিন বিপ্লবীসহ আহত অবস্থায় বন্দী হন। বন্দী থাকাকালে তাঁর মৃত্যু হয়। বন্দী অপর দুই বিপ্লবীর ফাঁসি হয়, আর একজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, নির্মম অত্যাচারও বিপ্লবীদের পথভ্রষ্ট করতে পারেনি। ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরিরত দেশীয় এবং বিদেশি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের হত্যার পরিকল্পনা অব্যাহত থাকে। পুলিশের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ, চোরাগুপ্তা হামলা, বোমাবাজি ক্রমাগত চলতে থাকে।

১৯১৬ সালের ৩০এ জানুয়ারি ভবানীপুরে হত্যা করা হয় পুলিশের ডেপুটি সুপার বসন্ত চট্টোপাধ্যায়কে। এভাবে হত্যা, খণ্ড যুদ্ধের সংখ্যা বেড়ে গেলে সরকার প্রতিরক্ষা আইনে বহু লোককে গ্রেফতার করে। ১৯২২ সালে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেফতার ও পুলিশি নির্যাতন বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বৃদ্ধি পায় বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড। বিপ্লবীরা অত্যাচারী পুলিশ সদস্যদের হত্যার আহ্বান জানিয়ে 'লালবাংলা' শীর্ষক প্রচারপত্র প্রকাশ করে। ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহা নামে একজন বিপ্লবী কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে হত্যা করতে গিয়ে ভুল করে অপর একজন ইংরেজকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য গোপীনাথকে ফাঁসি দেওয়া হয়। আলিপুর জেলের সুপার বন্দী বিপ্লবীদের পরিদর্শন করতে গেলে প্রমোদ চৌধুরী নামে একজন বিপ্লবীর রডের আঘাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ১৯২৪ সালের অক্টোবর মাসে ইংরেজ সরকার বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি করে। এই অর্ডিন্যান্সের বলে অনেক বিপ্লবী কারারুদ্ধ হলে বিপ্লবী কার্যক্রম কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে।

মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ সালে শুরু করেন আইন অমান্য আন্দোলন। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বিপ্লবী কর্মকাণ্ড আবার বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য সে সময় বিপ্লবী আন্দোলন বাংলায় বেশি শক্তিশালী ছিল এবং বাঙালিরা ইংরেজ প্রশাসনকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে। বাঙালি তরুণরা মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে বারবার সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

সূর্যসেন

এমন একজন দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন চট্টগ্রামের মাস্টারদা, যাঁর আসল নাম সূর্য সেন (১৮৯৪ ১৯৩৪)। কলেজ জীবনে তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। স্নাতক ডিগ্রি লাভের পর তিনি উমাতারা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এর মধ্যেই তিনি মাস্টারদা নামে পরিচিত হয়ে উঠেন। এ সময় তিনি অম্বিকা চক্রবর্তী, অনুরূপ সেন, নগেন সেনের সহায়তায় একটি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁর সংগঠন এবং তিনি নিজে একের পর এক সশস্ত্র কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বারবার গ্রেফতার হলেও প্রমাণের অভাবে মুক্তি পেয়ে যান। চট্টগ্রামকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করার জন্য গঠন করেন চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী। পরে এই আত্মঘাতী বাহিনীর নাম হয় 'চিটাগাঙ রিপাবলিকান আর্মি'। এই বাহিনী একের পর এক সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো দখল করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত সরকারি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে। 'স্বাধীন চিটাগাঙ সরকার' এর ঘোষণা দেওয়া হয় এবং একই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এই যুদ্ধ ছিল অসম শক্তির যুদ্ধ। সূর্য সেনের বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে ইংরেজ সরকার বিপুল বাহিনী নিয়োগ করে। চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয় জালালাবাদ পাহাড়ে। গোলাবারুদ ফুরিয়ে গেলে বিপ্লবীরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। অনেক তরুণ বিপ্লবী এই খণ্ডযুদ্ধে এবং অন্যান্য অভিযানে নিহত হন। বিপ্লবীরা গ্রামের কৃষকদের বাড়িতে বাড়িতে আশ্রয় নেন। ১৯৩৩ সালে সূর্য সেন গ্রেফতার হন। ১৯৩৪ সালে সংক্ষিপ্ত ট্রাইবুনালের বিচারে তাঁকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। চরম নির্যাতনের পর ১২ই জানুয়ারি তাঁকে ফাঁসি দেওয়া এবং তাঁর মৃতদেহ বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

সূর্য সেনের বিপ্লবী বাহিনীতে নারী যোদ্ধাও ছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কল্পনা দত্ত ও প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। অসাধারণ মেধাবী ছাত্রী প্রীতিলতা ১৯০০ সালে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং ডিসটিংশন নিয়ে বি.এ পাস করেন। ইতোমধ্যে তিনি বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন এবং সূর্য সেনের দলের সঙ্গে যুক্ত হন। সাহসী নারী প্রীতিলতাকে তাঁর যোগ্যতার জন্য চট্টগ্রাম 'পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাব' আক্রমণের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। সফল অভিযান শেষে তিনি তাঁর সঙ্গী বিপ্লবীদের নিরাপদে স্থান ত্যাগ করতে সহায়তা করেন। কিন্তু ধরা পড়ার আগে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। প্রীতিলতা বাংলার সমস্ত বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পাশাপাশি কলকাতায় যুগান্তর দলও যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। ১৯৩০ সালে ডালহৌসি স্কোয়ারে চার্লস টেগার্টকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওই বছর ডিসেম্বরে এক অভিযানে নিহত হন কলকাতা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন। এর আগে বিনয় বসুর হাতে নিহত হন অত্যাচারী পুলিশ অফিসার লোম্যান। এই বিপ্লবী অভিযানের সঙ্গে জড়িত বিনয় ও বাদল আত্মহত্যা করে এবং দীনেশের ফাঁসি হয়। ঐ বছরই বাংলার গভর্নর

জ্যাকসনকে হত্যার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত বীণা দাসের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে মেদেনীপুরে পরপর তিনজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের হাতে নিহত হয়।

বিপ্লবীদের ব্যাপক তৎপরতা কমে গেলেও চট্টগ্রামে তারা এর পরও একের পর এক অভিযান চালিয়েছে। ১৯৩৪ সালের ৭ই জানুয়ারি চট্টগ্রামের পল্টন ময়দানে ইংরেজদের ক্রিকেট খেলার আয়োজনে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে সক্ষম হয়। ঐদিনও দুইজন বিপ্লবী নিহত হন এবং দুইজন ধরা পড়লে তাদেরকে পরে হত্যা করা হয়।

সশস্ত্র আন্দোলন ব্যর্থতার কারণ

সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হচ্ছে গণবিচ্ছিন্নতা। এই আন্দোলন পরিচালিত হতো গুপ্ত সমিতিগুলোর দ্বারা। এর সঙ্গে যুক্ত ছিল কিছু সংখ্যক শিক্ষিত সচেতন যুবক। নিরাপত্তার কারণে সমস্ত বিপ্লবী কর্মকাণ্ড গোপনে পরিচালিত হতো। সাধারণ জনগণের এ সম্পর্কে ধারণা ছিলনা। সাধারণ মানুষের কাছে সশস্ত্র আক্রমণ, বোমাবাজি, হত্যাকাণ্ড সবই ছিল আতঙ্ক আর ভয়ের কারণ। ফলে সাধারণ মানুষ ছিল এদের কাছ থেকে অনেক দূরে।

বাংলার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মুসলিম সম্প্রদায় এই আন্দোলন থেকে দূরে ছিল। বিপ্লবীদের হিন্দু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি বাধ্যবাধকতা থাকায় অর্থাৎ গীতা স্পর্শ, কালীর সম্মুখে ধর্মীয় শ্লোক উচ্চারণ করে শপথ গ্রহণ, ইত্যাদির কারণে মুসলিম সম্প্রদায় এ আন্দোলনে যুক্ত হওয়াকে বাধা বলে মনে করে।

গুপ্ত সংগঠনগুলোকে নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা রক্ষার জন্য ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে কাজ করতে হতো। সব দল সব বিষয়ে জানতে পারত না। ফলে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। এ কারণে অনেক সময় সবার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে কোনো অভিযান সফল করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমন্বয়ের অভাবে সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা দেয়। তাছাড়া গুপ্ত সমিতিগুলো যার যার মতো করে কাজ করত। এক সমিতির সঙ্গে অন্য সমিতির কোনো যোগাযোগ ছিল না। ফলে সশস্ত্র বিপ্লবে কোনো একক নেতৃত্ব না থাকায় সারা দেশে আন্দোলন চলে বিচ্ছিন্নভাবে। এই বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া সরকারের কঠোর দমননীতি ও জনবিচ্ছিন্নতার কারণে বিপ্লবীরা নিরাশ্রয় এবং কোণঠাসা হয়ে পড়ে। বিভিন্ন সংগঠন ও নেতাদের মধ্যকার আদর্শের বিরোধ-বৈরিতা যেমন সশস্ত্র বিপ্লবকে দুর্বল করেছিল, তেমন এদের মধ্যে তীব্র বিভেদের জন্ম দিয়েছিল। এ অবস্থায় বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি সংগঠিত হলে অনেক বিপ্লবী এতে যোগদান করেন।

সশস্ত্র বিপ্লব সফল না হলেও বিপ্লবীদের আত্মাহুতি, দেশপ্রেম, সাহস পরাধীন বাংলা তথা ভারতবাসীকে স্বাধীনতার পথ দেখিয়েছিল। এ আন্দোলন প্রত্যক্ষভাবে সফল না হলেও বিপ্লবীদের আদর্শ পরবর্তী আন্দোলনসমূহে প্রেরণা যুগিয়েছিল।

একক কাজ ঃ ১. বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের নেতাদের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
২. 'প্রীতিলতার জীবন ও বিপ্লবী কর্মকাণ্ড'একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

স্বরাজ ও বেঙ্গল প্যাক্ট

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলে কংগ্রেসের অনেক নেতা কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ সময় মুক্তিপ্রাপ্ত নেতা চিত্তরঞ্জন দাস (সি.আর. দাস) ও মতিলাল নেহরুর সঙ্গে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের কর্মপন্থা নিয়ে মতবিরোধ দেখা দেয়। সি. আর. দাস ও তাঁর সমর্থকরা নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যবস্থাপক

পরিষদগুলোতে যোগদানের পক্ষে ছিলেন। কারণ ঐ সময় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণে আইন অমান্য আন্দোলনের পরিবেশে না থাকায় তাঁরা এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাছাড়া তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল আইনসভায় যোগ দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে ১৯১৯ সালে সংস্কার আইন অচল করে দেওয়া। কিন্তু কংগ্রেসের গোয়া সম্মেলনে তাঁদের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২২ সালে কংগ্রেসের একাংশের সমর্থনে সি.আর. দাসের নেতৃত্বে গঠিত হয় স্বরাজ পার্টি। সি.আর. দাস হন এ দলের সভাপতি। মতিলাল নেহরু হন অন্যতম সম্পাদক।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে যারা স্বরাজ লাভের জন্য স্বরাজ পার্টির সমর্থক ছিলেন, তাদেরকে পরিবর্তনপন্থী এবং যারা স্বরাজ পার্টির বিপক্ষে অংশ নেয় তাদের বলা হয় পরিবর্তনবিরোধী। এই দুই পক্ষের সঙ্গে শুধু আন্দোলনের পন্থা নির্ধারণের ধরন ছাড়া আর কোনো বিষয়ে বিরোধ ছিল না।

স্বরাজ দলের বিরোধীরা অসহযোগ আন্দোলনের ধারা বজায় রেখে আইন বয়কট করার সিদ্ধান্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে। অপর দিকে স্বরাজ দল গঠনের পরপর বাংলার অনেক বিপ্লবী– সুভাষচন্দ্র বসু, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীসহ অনেক যুবনেতা এতে যোগদান করেন।

স্বরাজ দলের কর্মসূচি ঃ

১. আইনসভায় প্রবেশ করে সরকারি কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা এবং ১৯১৯ সালে প্রণীত সংস্কার আইন অকার্যকর করে দেওয়া;

২. সরকারি বাজেট প্রত্যাখ্যান করা এবং মন্ত্রিসভার পতন ঘটানো;

৩. বিভিন্ন প্রস্তাব ও বিল উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও কর্মকাণ্ডকে জোরদার করা এবং

৪. বিদেশি শাসনকে অসম্ভব করে তোলা।

স্বরাজ দলের কার্যাবলি ঃ

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন বা মন্টেগু চেমসফোর্ড সংস্কার আইন অনুযায়ী, ১৯২৩ সালে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। স্বরাজ দল তাদের কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আশাতীত সাফল্য অর্জন করে। বিশেষ করে বাংলা ও মধ্য প্রদেশে স্বরাজ দল এ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। মুসলমানদের সমর্থন লাভের কারণে আইন সভায় স্বরাজ দলের ভিত শক্ত হয় এবং কর্মসূচি অনুযায়ী সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপে বাধা সৃষ্টি করা সম্ভব হয়। বাংলায় স্বরাজ দলের অভূতপূর্ব বিজয়ের কৃতিত্ব ছিল দলের সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাসের। তাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা, উদারনীতি বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়। মুসলিম সম্প্রদায়ের সমর্থন তাঁকে এবং তাঁর দলকে শক্তিশালী করে তোলে।

বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি (ডিসেম্বর, ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দ)

উপমহাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন স্বরাজ দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস। ফলে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম সমস্যা দূর করার জন্য এই দূরদর্শী, বাস্তববাদী নেতা যে চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন, ইতিহাসে তা বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি নামে খ্যাত। এই সময়ে বাংলার ইতিহাসে প্রধান ঘটনাই ছিল বেঙ্গল প্যাক্ট। নিঃসন্দেহে তাঁর এই প্রচেষ্টা হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

সি.আর. দাস ফর্মুলা নামে খ্যাত বাংলা চুক্তি সম্পাদনা করতে যেসব মুসলমান নেতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আব্দুল করিম, মুজিবুর রহমান, আকরম খান, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদি। এ ছাড়া, স্যার আব্দুর রহিম, একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী সমঝোতা চুক্তি সম্পাদনে সহযোগিতা ও এতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। অপরদিকে বাংলার কংগ্রেস নেতা সুভাষচন্দ্র বসু চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। তাঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে বেঙ্গল প্যাক্ট আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়।

১৯২৩ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত চুক্তিতে মুসলমানদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান করার শর্তই ছিল মূল বিষয়। যেমনঃ

১. স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলার প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ অধিকার পাবে। লোকসংখ্যার অনুপাতে এ স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথায় বাংলাদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হবে।

২. স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রত্যেক জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় শতকরা ৬০টি আসন পাবে এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায় শতকরা ৪০টি আসন পাবে।

৩. সরকারি দপ্তরে মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫৫ ভাগ চাকরি সংরক্ষিত থাকবে।

৪. কোনো সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিষয়ে আইন পাস করতে হলে আইনসভায় নির্বাচিত উক্ত সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থন থাকতে হবে।

৫. মসজিদের সামনে গান-বাজনাসহ কোনো মিছিল করা যাবে না এবং গরু জবাই করার ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না।

একক কাজ ঃ বেঙ্গল প্যাক্টে অসাম্প্রদায়িক চেতনার যে প্রতিফলন ঘটেছে তার ধারাগুলো পরপর সাজাও।

বেঙ্গল প্যাক্টের অবসান

বাংলাদেশের রাজনীতি এবং সমাজে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের দলিল ছিল বেঙ্গল প্যাক্ট বা বাংলা চুক্তি। এই চুক্তির কারণেই মুসলমানের আস্থা অর্জন করে স্বরাজ পার্টি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সক্ষম হয়। অপরদিকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলকাতার ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন এবং মুসলমানরা কর্পোরেশনে চাকরি লাভে সক্ষম হয়। বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সি.আর দাসের এই পদক্ষেপ যেমন বাস্তবধর্মী ছিল তেমন ছিল প্রসংশনীয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে থাকতেই হিন্দু পত্রিকাগুলো, রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ, গান্ধীজির সমর্থক কংগ্রেস দল ও স্বরাজ দলবিরোধী হিন্দুরা 'বেঙ্গল প্যাক্ট'- এর তীব্র বিরোধিতা করে। অপরদিকে হিন্দু মহাসভার 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন' নামক আন্দোলন এবং মুসলমানদের 'তাবলিগ' ও 'তানজিম' নামক আন্দোলন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে। ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দাসের অকালমৃত্যুতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ কিছুকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া কংগ্রেস এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ 'বেঙ্গল প্যাক্ট-এর বিষয়ে উদাসীন থাকে। পরের বছর অর্থাৎ ১৯২৬ সালে কলকাতা এবং পরে ঢাকায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার কারণে উভয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি নষ্ট হলে এই চুক্তি বাস্তবায়নের সকল পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

একক কাজ ঃ কার মৃত্যুতে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথ জন্য বন্ধ হয়ে যায়? এই ঐক্যের জন্য তার কাজের তালিকা প্রস্তুত কর।

লাহোর প্রস্তাবের পটভূমি

বেঙ্গল প্যাক্ট অকার্যকর হলে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের সম্ভাবনা ব্যাহত হয়। ১৯২৮ সালে নেহরু রিপোর্টের মাধ্যমে হিন্দু-মুসলিম সমঝোতার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়, নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষণের প্রশ্নে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপন প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত ১৪ দফা উত্থাপন করেন। এর মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রবল হতে থাকে এবং দুই সম্প্রদায়ের মধ্যকার দূরত্ব ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৩০ সালে প্রকাশিত সাইমন কমিশনের রিপোর্ট সব রাজনৈতিক দল প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৩০-১৯৩২ সাল পর্যন্ত লন্ডনে আহূত পরপর তিনটি গোলটেবিল বৈঠকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আসন সংরক্ষণের দাবির বিষয়ে একমত হতে না পারার কারণে সমঝোতা ছাড়াই পরিসমাপ্তি ঘটে। এ সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর উপর চাপ প্রয়োগ করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড সমস্যা সমাধানের জন্য 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' ঘোষণা করেন। সেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য কিছু আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থাসহ পৃথক নির্বাচনের সুযোগ দেওয়া হয়। 'সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ' বিভিন্ন সম্প্রদায় ও দলের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তবে মুসলমানরা প্রতিবাদ সত্ত্বেও

সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরপর যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদ্ধতি এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের বৈশিষ্ট্য সংবলিত ভারত শাসন আইন ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। এই আইন ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল হলেও এই আইন অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব হয়নি। কারণ জিন্নাহ এই আইনে প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। অপরদিকে কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এর তীব্র সমালোচনা করে বলেন, এই আইনে স্বায়ত্তশাসনের স্বাভাবিক অগ্রগতির কোনো লক্ষণ নেই। উভয় দলই ভারতের জন্য অধিকতর শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক সংস্কার দাবি করে। অপরদিকে হিন্দু মহাসভা এই আইনের বিরোধিতা করে। দলগুলোর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সত্ত্বেও ১৯৩৭ খ্রিষ্টাব্দে এই আইনের অধীনে প্রস্তাবিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়। অপরদিকে প্রাদেশিক নির্বাচনে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করে। এ অবস্থায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলোতে মুসলিম লীগের সঙ্গে কোনো রকম আলোচনা ছাড়াই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। তাছাড়া কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহরু নির্বাচন পরবর্তীকালে মন্তব্য করেন যে ভারতে দুইটি শক্তির অস্তিত্ব লক্ষণীয়–একটি সরকার, অপরটি কংগ্রেস। তাঁর এ ধরনের মন্তব্য মুসলিম নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। জিন্নাহ যিনি দীর্ঘ সময় ধরে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তিনি কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্যের কারণে রাজনীতির ভিন্ন পথে অগ্রসর হন। ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি সিন্ধুতে প্রাদেশিক মুসলিমলীগের সভায় হিন্দু ও মুসলমান দুইটি ভিন্ন জাতি বলে উল্লেখ করেন। এভাবে লাহোর প্রস্তাবের আগেই হিন্দু-মুসলমান আলাদা জাতি; এই চিন্তা করার ফলে তাদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের চিন্তারও প্রকাশ ঘটতে থাকে। এই প্রকাশের বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব।

লাহোর প্রস্তাব

লাহোর প্রস্তাবের অনেক আগেই ১৯৩০ সালে কবি আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৩ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমত আলী ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকাগুলো নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রের রূপরেখা অঙ্কন করেন। ১৯৩৭-৩৮ সালে পর্যন্ত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের কথা ভাবেন নি। কিন্তু ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং নির্বাচনের পরে বিজয়ী কংগ্রেস সভাপতির বক্তব্যে তিনি বুঝতে পারেন যে, সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা হিন্দু নেতৃবৃন্দের শাসনাধীনে বাস্তব রূপ লাভ করবে না। সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং মুসলমানদের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে জিন্নাহ তাঁর বহু আলোচিত-সমালোচিত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ঘোষণা দেন। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব মূলত তার এই ঘোষণার বাস্তব রূপ দেওয়ার পথনির্দেশ করে।

১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ২৩এ মার্চ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় বলে এটি ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব নামে খ্যাত। উপমহাদেশের মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাসে লাহোর প্রস্তাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন এই অধিবেশনের সভাপতি। এ. কে. ফজলুল হক ২৩এ মার্চের অধিবেশনে তাঁর রচিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়, কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনা এদেশে কার্যকর হবে না, যদি এটি লাহোর প্রস্তাবে উত্থাপিত মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়।

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

লাহোর প্রস্তাবের প্রধান ধারাসমূহ-

ক. ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্ব ভূ-ভাগের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে নিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ গঠন করতে হবে।

খ. এসব স্বাধীন রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাষ্ট্রগুলো স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম হবে।

গ. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলোর সাথে পরামর্শ করে তাদের সব অধিকার এবং স্বার্থরক্ষার জন্য সংবিধানে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে।

ঘ. প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে ক্ষমতা সংশ্লিষ্ট অঙ্গ রাজ্যগুলোর হাতে ন্যস্ত থাকবে।

উল্লেখিত প্রস্তাবের ধারাসমূহের কোথাও পাকিস্তান শব্দটির উল্লেখ নেই। কিন্তু তৎকালীন বিভিন্ন পত্রিকায় এটিকে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে প্রচার হতে থাকে। ফলে দ্রুত এ প্রস্তাব 'পাকিস্তান প্রস্তাব' হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে থাকে।

লাহোর প্রস্তাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠন করার কথা বলা হয়েছিল। যার ফলে বাঙালি মুসলমান পূর্বাংশ নিয়ে একটি 'স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ৯ই এপ্রিল দিল্লিতে মুসলিম লীগের দলীয় আইনসভার সদস্যদের এক কনভেনশনে নীতিবহির্ভূতভাবে জিন্নাহ 'লাহোর প্রস্তাব' সংশোধনের নামে ভিন্ন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এতে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহ নিয়ে একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে নয়, ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে উত্থাপিত দিল্লি প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানের জন্ম হয়।

লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব

লাহোর প্রস্তাবের প্রতি কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা করেন। তবে ঐতিহাসিক সত্য এই যে লাহোর প্রস্তাবের পর থেকে মুসলমান সম্প্রদায় নিজস্ব আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতে থাকে। এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ভারতের রাজনৈতিক-শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনে এক নতুন ধারার জন্ম হয়। দ্বি-জাতি তত্ত্বের মাধ্যমে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানদের আলাদা জাতি হিসেবে চিহ্নিত করতে থাকেন। সে অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য ভিন্ন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা শুধু সময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এরপর থেকে মুসলিম লীগ এবং জিন্নাহর রাজনীতি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার দিকে ধাবিত হতে থাকে; যার শেষ পরিণতি ছিল ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসের দেশ বিভাগ। দ্বি-জাতি তত্ত্বের বাস্তব পরিণতিতে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট ভারত নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

বিভাগ-পূর্ব বাংলার রাজনীতি (১৯৩৭-১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)

১৯২৫ সালে চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যু এবং ১৯২৬ সালে কলকাতায় দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। এ পরিস্থিতিতে মওলানা আকরম খাঁ, তমিজউদ্দিন খান প্রমুখ মুসলিম নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

১৯২৯ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনের পর 'নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতি' নামে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বাংলার কৃষকের অবস্থার উন্নতি সাধন করা। ফলে কৃষক আন্দোলন ও রাজনীতিতে নতুন ধারা প্রবর্তিত হয়। ১৯৩৫ সালে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রজা সমিতির সম্মেলনে এ.কে. ফজলুল হক নিখিল বঙ্গ প্রজা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন।

পরবর্তী বছর এর নতুন নামকরণ হয় 'কৃষক-প্রজা পার্টি'। কৃষক প্রজা পার্টি ছিল সম্পূর্ণভাবে পৃথক এবং প্রদেশ পর্যায়ে গঠিত বাংলার রাজনৈতিক সংগঠন। ১৯৩৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লীগের মধ্যে। তবে কোনো দল এককভাবে সরকার গঠন করার যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ফলে মুসলিম লীগ ফজলুল হকের নেতৃত্বে সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সম্মিলিত মন্ত্রিসভা ছিল দুর্বল। ফলে কৃষক-প্রজা পার্টি দুর্বল হয়ে পড়ে।

জিন্নাহর সাথে ফজলুল হকের মতবিরোধের কারণে ১৯৪১ সালে ফজলুল হক মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন। ফজলুল হকের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন থাকায় ঐ সালের ডিসেম্বর মাসেই তিনি দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ নতুন মন্ত্রিসভা ছিল বহুদলের সমাবেশ। এরূপ একটি মন্ত্রিসভা গঠনের মাধ্যমে ফজলুল হক বাংলার রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা করেন। এই নতুন ধারা ছিল বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করা। ফজলুল হকের দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা ১৯৪১ থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যন্ত

ক্ষমতাসীন ছিল। ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় সমর্থন না পেয়ে ফজলুল হক পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

১৯৪৩ সালের ১৩ই এপ্রিল দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে খাজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সর্বনাশা এ দুর্ভিক্ষে বাংলার ৩০ লক্ষাধিক লোক মৃত্যুবরণ করে বলে ধারণা করা হয়। ১৯৪৫ সালে নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে বাংলার মুসলিম লীগ দুইটি উপদলে বিভক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দী বাংলার মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১১৪ আসনে জয়লাভ করে। প্রকারান্তরে পাকিস্তান দাবির প্রতি বাংলার মুসলমানদের সুস্পষ্ট সমর্থনের প্রতিফলন ঘটায়।

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এ নির্বাচন ও নির্বাচনের ফল ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৬ সালের ২৪এ এপ্রিল সোহরাওয়ার্দী একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। প্রকৃতপক্ষে সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার সময় ছিল বাংলা ও ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ও দেশ বিভাগের রাজনৈতিক পরিবেশে কলকাতার দাঙ্গা ও স্বাধীন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ও ভারত বিভাগ ছিল এ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

অখণ্ড বাংলার উদ্যোগ

১৯৪৭ সালে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক এক রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় রূপ নেয়। এরকম চরম জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইচ্ছা ঘোষণা করে। ঠিক এই রকম পরিস্থিতিতে বাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্ত বাংলার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন শরৎচন্দ্র বসু। প্রস্তাবটি উপমহাদেশের ইতিহাস 'বসু'-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব নামে খ্যাত।

১৯৪৭ সালের ২৭এ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে শহীদ সোহরাওয়ার্দী তাঁর বক্তব্যে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এর পক্ষে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। মুসলিম লীগ নেতা আবুল হাশিম বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের একটি রূপরেখা প্রণয়ন করেন। পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বসু তাঁর এক প্রস্তাবে অখণ্ড বাংলাকে একটি 'সোস্যালিস্ট রিপাবলিক' হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

বসু- সোহরাওয়ার্দী চুক্তি

১৯৪৭ সালের ২০এ মে তারিখে কলকাতায় কংগ্রেস নেতা শরৎচন্দ্র বসুর বাসগৃহে অখণ্ড বাংলার পক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বৃহত্তর বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে বসু-সোহরাওয়ার্দী চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন মুসলিম লীগের পক্ষে আবুল হাশিম এবং কংগ্রেসের পক্ষে শরৎচন্দ্র বসু। সভায় উপস্থিত ছিলেন মুসলিম লীগের হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, ফজলুর রহমান, মোহাম্মাদ আলী, এ. এম মালেক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। অপরদিকে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু, কিরণ শংকর রায় ও সত্যরঞ্জন বখশী। সভায় স্বাক্ষরিত চুক্তিটি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. বাংলা হবে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ভারতের বাকি অংশের সঙ্গে এ রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে তা সে নিজেই ঠিক করবে।

২. হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা অনুপাতে আসনসংখ্যা বণ্টন করে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে আইন সভায় নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকবে।

৩. স্বাধীন বাংলা প্রস্তাব গৃহীত হলে বাংলার বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়া হবে। পরিবর্তে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করা হবে। উক্ত মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীর পদ ছাড়া বাকি সদস্যপদ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করা হবে।

৪. সামরিক ও পুলিশ বাহিনীসহ সকল চাকরিতে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা সমান থাকবে। এসব চাকরিতে শুধু বাঙালিদের নিয়োগ দেয়া হবে।

৫. সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩০ সদস্যবিশিষ্ট গণপরিষদ থাকবে। এর মধ্যে ১৬ জন মুসলমান ও ১৪ জন হিন্দু সদস্য থাকবেন।

অখণ্ড বাংলা প্রস্তাবের ব্যর্থতা

অখণ্ড বাংলা প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ উভয় দলের নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রথম দিকে মুসলিম লীগের গোঁড়াপন্থী রক্ষণশীল নেতারা বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্রের পক্ষে ছিলেন। প্রাথমিক পর্যায়ে মহাত্মা গান্ধী ও মোহাম্মদ আলী জিন্নাহরও এই প্রস্তাবের প্রতি মৌন সমর্থন ছিল। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের প্রথম সারির নেতাদের তীব্র বিরোধিতার কারণে বিষয়টি জটিল হয়ে যায়। ফলে উভয় নেতা অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়ে মত বদলে ফেলেন। মুসলিম লীগের রক্ষণশীল নেতারা প্রথম দিকে এর সমর্থক হলেও পরে তারা অখণ্ড বাংলাকে পাকিস্তানের অংশ করার দাবি করতে থাকেন। বিশেষ করে খাজা নাজিমুদ্দিন, আকরম খাঁ প্রমুখ। আকরম খাঁ ১৬ই মে দিল্লিতে জিন্নাহর সঙ্গে এক বৈঠকের পর সাংবাদিকদের জানান যে অখণ্ড বাংলা মুসলিম লীগ সমর্থন করে না। ফলে বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব মুসলিম লীগের সমর্থন হারায়।

বৃহত্তর স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব অর্থাৎ বসু-সোহরাওয়ার্দী প্রস্তাব প্রথম থেকেই কংগ্রেসের উঁচু পর্যায়ের নেতাদের তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হয়। কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু ও সরদার বল্লভ ভাই প্যাটেলসহ বহু নেতা এর বিরোধী ছিলেন। তাঁরা কোনোমতেই স্বাধীন ভারতবর্ষে কলকাতাকে হাতছাড়া করার পক্ষপাতি ছিলেন না। তাছাড়া পেট্রোল ও অন্যান্য খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ আসামও তাঁদের প্রয়োজন ছিল। অপরদিকে কংগ্রেস মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অখণ্ড বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়েও শংকিত ছিলেন। হিন্দু মহাসভার শ্যামাপ্রসাদ যুক্ত বাংলার চরম বিরোধী ছিলেন। ফলে যুক্ত বাংলা প্রস্তাব কংগ্রেসের সমর্থন হারায়।

তাছাড়া পত্রপত্রিকা যুক্ত বাংলার বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারণা চালাতে থাকে। পশ্চিম বাংলাকেন্দ্রিক বাঙালি অবাঙালি, ব্যবসায়ী, বণিক, পুঁজিপতিশ্রেণি এর বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করে। এমনকি ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবী শ্রেণিও যুক্ত বাংলার বিপক্ষে সোচ্চার ছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটিও সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বাংলা ভাগের পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করে। অপরদিকে জুন মাসের ৩ তারিখে লর্ড মাউন্ট ব্যাটন ভারত বিভক্তির ঘোষণায় বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের পরিকল্পনা করেন। জুন মাসের ২০ তারিখে বিধান সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে রায় দিলে বাংলা বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ভারত স্বাধীনতা আইনে পাঞ্জাব ও বাংলা ভাগের কথা বলা হয়। ১৯৪৭ -এর আইন অনুসারে ভারত ভাগ হয়। ১৪ই আগস্ট জন্ম নেয় পাকিস্তান নামে এক কৃত্রিম মুসলিম রাষ্ট্রের; আর ১৫ই আগস্ট জন্ম নেয় আরেকটি রাষ্ট্রের, যার নাম হয় ভারত। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অংশে পরিণত হয়– পরবর্তীকালে যা পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে। অপরদিকে, পশ্চিম বাংলা যুক্ত হয় ভারতের সঙ্গে। এভাবেই প্রস্তাবিত অখণ্ড স্বাধীন বাংলা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়।

একক কাজ ঃ যুক্ত বাংলার বিরোধীদের বিরোধিতার কারণ অনুসন্ধান কর।

বৃটিশ শাসন অবসান

ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যুদয়

বৃটিশ শাসন অবসানের পূর্ব কথা : ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দে ক্রিপস মিশন প্রস্তাব সব মহল প্রত্যাখ্যান করলে সমগ্র ভারতব্যাপী তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। রাজনীতিতেও নেমে আসে চরম হতাশা। পৃথিবীব্যাপী চলছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ। জার্মানির মিত্র রাষ্ট্র জাপানের ভারত আক্রমণ আশঙ্কায় ভারতীয়দের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। গান্ধীজি ভারতে ব্রিটিশ সরকারের উপস্থিতিকে এই আক্রমণের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়লে জাপানের

ভারত আক্রমণ পরিকল্পনার পরিবর্তন হতে পারে। এই চিন্তা করে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে তাঁর প্রেরিত প্রস্তাবে তিনি ইংরেজদের ভারত ছেড়ে যেতে বলেন। শুরু হয় কংগ্রেসের ভারত ছাড় আন্দোলন। গান্ধীজির ডাকে 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে জনগণ ঝাঁপিয়ে পড়ে। সমগ্রভারতে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রবল ব্রিটিশবিরোধী রূপ নেয়। ১৯৪২ সালের ৮ই আগস্ট বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী এক ঘোষণায় বলেন 'আমি অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই। এমনকি এই রাত্রির মধ্যেই, উষালগ্নের আগেই যদি তা সম্ভব হয়।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন করব। আর এ হবে আমাদের জীবনে শেষ লড়াই'।

কিন্তু ইংরেজ সরকার ঐ সময় কোনোভাবেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিল না। বরং সরকার এই আন্দোলন দমন করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। ঐ দিনই মধ্যরাতে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ- গান্ধীজি, আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরুসহ অনেকে গ্রেফতার হন। সরকার কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সব নেতা কারাবন্দী হন।

নেতৃবন্দের গ্রেফতারের খবরে অহিংস আন্দোলন সংহিস আন্দোলনে পরিণত হয়। নেতাদের মুক্তির দাবিতে সর্বত্র হরতাল, কলকারখানা, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট পালিত হতে থাকে। উত্তেজিত জনতা স্থানে স্থানে রেললাইন উপড়ে ফেলা, চলন্ত ট্রেনে ইট পাটকেল নিক্ষেপ, রেল স্টেশনে, সরকারি ঘর-বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো বেপরোয়া হয়ে উঠে। নেতৃত্বহীন আন্দোলন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সারা ভারতে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে অগ্রসর হতে থাকে। কোথাও কোথাও অস্থায়ী সরকার, কোথাও বা জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। ভয়াবহ ঘটনা ঘটে তমলুক থানা দখল করার সময়। মাতঙ্গিনী হাজরা নামে এক বৃদ্ধা জাতীয় পতাকা হাতে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।

এই আন্দোলনের সময় ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে কৃত্রিম সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ মানুষকে দিশেহারা করে তোলে। তাছাড়া দেশব্যাপী মারাত্মক মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতি, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি সব মিলিয়ে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ফলে হতাশ জনগণের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব তীব্র হতে থাকে।

একক কাজ ঃ মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের কারণ অনুসন্ধান কর।

যখন দেশের অভ্যন্তরে রাজনীতিতে চরম হতাশা বিরাজ করছে, ব্যর্থ হয়েছে ইংরেজ তাড়ানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা, তখন যুদ্ধ করে ইংরেজ বিতাড়নের জন্য বাঙালিদের নেতৃত্বে দেশের বাইরে গঠিত হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ বা Indian National Army (INA)। এই সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। এই বাহিনী গড়তে সাহায্য করেন আরেক বাঙালি বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ও ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা সুভাষ বসু কংগ্রেসে আপোষকামী রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন। প্রথম থেকেই স্বাধীনতা অর্জনের পদ্ধতির প্রশ্নে গান্ধীজির সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য ছিল। কিশোর বয়স থেকে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন সুভাষ বসু ছিলেন গান্ধীর অহিংস নীতির বিরোধী। ১৯৩৭ সালে গান্ধীর অনুমোদনে কংগ্রেসের সভাপতি হলেও গান্ধীই আবার দ্বিতীয় দফায় তাঁকে সভাপতি পদে মনোনয়ন দেননি। তিনি সুভাষ বসুকে এ পদে নির্বাচন করতে নিষেধ করেন। সুভাষ বসু এই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেন এবং গান্ধীর মনোনীত প্রার্থীকে হারিয়ে আবার সভাপতি নির্বাচিত হন। গান্ধীর প্রতি এই ধরনের চ্যালেঞ্জে জয়ী সুভাষ পরবর্তীতে কংগ্রেসের রাজনীতিতে গান্ধীর সহযোগিতা পেতে ব্যর্থ হন। হতাশ হয়ে সুভাষ বসু কংগ্রেস ছেড়ে ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন। তাঁর রাজনীতি আপোষহীন পথে অগ্রসর হতে থাকে। সুভাষ বসুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভীত ইংরেজ সরকার বারবার তাঁকে কারারুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত কারামুক্তি লাভ করে ১৯৪১ সালে সবার অলক্ষে সুভাষ বসু দেশ ত্যাগ করেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। তিনি প্রথম ইংরেজদের শত্রু ভূমি জার্মানিতে গমন করেন। সেখানে ভারতের স্বাধীনতার জন্য জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ এবং সেনাবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় রাজনীতিবিদ, যিনি বিদেশি শক্তির সাহায্য নিয়ে লড়াই করে মাতৃভূমি স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন। পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় ডুবোজাহাজে করে এক দুঃসাহসিক অভিযানের মাধ্যমে আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তিনি জাপানে আসেন। সেখানে অবস্থানরত বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর সহযোগিতায় জাপানে বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে আজাদ হিন্দু ফৌজ। ১৯৪৩ সালে তিনি এই বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ বছরই ভারতীয় ভূখণ্ডের আন্দামান

দ্বীপে গঠন করেন আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকার। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত এই সরকারের সেনাবাহিনী বিভিন্ন রণাঙ্গনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে। গড়ে তোলেন আজাদ হিন্দু ফৌজ এবং সুভাষ বসু তখন ছিলেন ইংরেজদের কাছে আতঙ্ক। সুভাষ বসু কর্তৃক সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতে ইংরেজ সরকারের ভিত কাঁপিয়ে দেয়। এই দুঃসাহসী বাঙালির নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ ১৯৪৪ সালে বার্মা হয়ে ভারত ভূমিতে পদার্পণ করে। কোহিমা-ইম্ফলের রণাঙ্গনে বীরত্ব ও সাফল্যের সঙ্গে লড়াই করে আজাদ হিন্দু ফৌজ এসব অঞ্চল দখল করে নেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এই রণাঙ্গনে জাপানি বাহিনী ইংরেজ বাহিনীর তীব্র আক্রমণ মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে পিছু হটলে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও পিছু হটতে হয়। ১৯৪৫ সালে জাপানের রেঙ্গুন ত্যাগের কারণে আজাদ হিন্দ ফৌজের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়। ব্যর্থ হয় এক দুঃসাহসী বাঙালি দেশপ্রেমিকের লড়াই করে মাতৃভূমির স্বাধীনতা উদ্ধারের প্রচেষ্টা। নেতাজি সুভাষ বসু সফল হলে ভিন্নভাবে লিখতে হতো ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। তখনি রচিত হতো বাঙালির দেশপ্রেম আর বীরত্বের আরেক গৌরবের ইতিহাস।

সুভাষ বসু প্রতিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ সরকার ছিল অসাম্প্রদায়িক। এই সরকার ও সেনাবাহিনীতে অনেক যোগ্য মুসলমান অফিসার ও সেনাসদস্য ছিলেন। তাঁর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাপ্রধান শাহনাওয়াজ ছিলেন মুসলমান। এই অসাম্প্রদায়িক চেতনাসমৃদ্ধ প্রগতিশীল বাঙালি নেতা নেতাজি সুভাষ বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নিরুদ্দেশ হয়ে যান। তাঁর অন্তর্ধান সম্পর্কে নানা কাহিনি প্রচলিত থাকলেও প্রকৃত সত্য এখনও গবেষণার বিষয়। ব্যর্থ হলেও নেতাজির অভিযান ভারতীয় স্বাধীনতাকামী জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও সাহসের সঞ্চার করেছিল। তিনি ব্রিটিশ-ভারতে দেশীয় সেনাসদস্যদের মধ্যে আনুগত্যের ফাটল ধরাতে যেমন সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি তাদের বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে প্রেরণা যুগিয়েছিলেন।

দলীয় কাজ ঃ দেশ স্বাধীনের জন্য নেতাজিকে কোন কোন দেশে যেতে হয় ধারাবাহিকভাবে তার তালিকা তৈরি কর।

আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতার পর ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে নৌ-বিদ্রোহ দেখা দেয়। এসব আলামত প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতীয়দের আয়ত্তে রাখা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ব্রিটিশ সরকার একের পর এক উদ্যোগ গ্রহণ করতে থাকে। ইতোপূর্বে যুদ্ধ চলাকালীন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে সিমলায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়াভেল এক পরিকল্পনা পেশ করেন, যা 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' নামে পরিচিত। কংগ্রেস-মুসলিম লীগের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের সাম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধির সংখ্যা নিয়ে তীব্র মতবিরোধের কারণে 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' ব্যর্থ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল জয়লাভ করে। এই পরিবর্তনের ধারা ভারতের রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলে। শ্রমিক দল ভারতের স্বাধীনতা দানের এবং ভারতীয়দের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইংল্যান্ডের নতুন প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৬ সালে ভারতে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। সাধারণ নির্বাচন সামনে রেখে নেতৃত্বে দ্বন্দ্বের ফলে প্রাদেশিক মুসলিম লীগ দুইটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। খাজা নাজিমুদ্দিন ছিলেন অবাঙালি ব্যবসায়ী ও রক্ষণশীলদের নেতা। অপরদিকে আবুল হাশিম এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ছিলেন প্রগতিশীল বাঙালিদের নেতৃত্বে। শেষ পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দীই বাংলার মুসলিম লীগের নেতা নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে মুসলমান তরুণ ছাত্রসমাজ মুসলিম লীগকে সমর্থন দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবিকে প্রধান নির্বাচনী কর্মসূচি করে মুসলিম লীগ প্রাদেশিক আইন সভায় অভুতপূর্ব বিজয় অর্জন করে। এই নির্বাচন এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে সুস্পষ্ট রায় ঘোষিত হয় এবং মুসলিম লীগ নিজেকে বাংলার মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র দল হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য এই নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তান মুসলিম লীগ গরিষ্ঠ ভোট পায়নি। অর্থাৎ বাঙালি মুসলমানের ভোটে পাকিস্তান প্রস্তাব জয়ী হয়েছিল। এই জয়ের পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

নির্বাচন-উত্তর উপমহাদেশের রাজনীতিতে ভিন্ন পরিস্থিতির সম্ভাবনা দেখা দেয়। বিচক্ষণ অ্যাটলি সরকার বুঝতে পারেন যে সম্মানজনকভাবে খুব বেশি দিন ব্রিটেনের পক্ষে ভারত শাসন করা সম্ভব হবে না। ফলে ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারত সচিব প্যাথিক লরেন্সের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ভারতে আসে। যাকে বলা হয় ক্যাবিনেট মিশন। এ সময় দিল্লিতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের কনভেনশন পাকিস্তান দাবি মেনে নিয়ে রাজনৈতিক সংকট সমাধানের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের প্রতি আহ্বান জানায়। ক্যাবিনেট মিশন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মে মাসে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পেশ করে।

মন্ত্রীমিশন বা ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় তিন স্তরবিশিষ্ট যুক্তরাষ্ট্র গঠনের বিষয় উল্লেখ করা হয়। যথা-

ক. কেন্দ্রে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা।

খ. ব্রিটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত ভারত ইউনিয়ন গঠন করা।

গ. হিন্দুপ্রধান গ্রুপ, মুসলমানপ্রধান গ্রুপ এবং বাংলা ও আসাম গ্রুপ- এ তিন ভাগে প্রদেশগুলোকে ভাগ করা এবং প্রত্যেক গ্রুপের জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করা। তবে শর্ত দেওয়া হয় যে এ, পরিকল্পনা গ্রহণ সার্বিকভাবে করতে হবে। এর অংশবিশেষ গ্রহণ করা যাবে না।

মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনায় পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য হলেও মুসলিম লীগ পরিকল্পনাটি গ্রহণ করে। কারণ মুসলিম লীগ মনে করে এই পরিকল্পনার মধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নিহিত আছে। কংগ্রেস এ পরিকল্পনায় এককেন্দ্রিক সরকারের অখণ্ড ভারত গঠনের প্রতিফলন দেখতে পায়। কংগ্রেস নিজস্ব ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রস্তাবটি গ্রহণে রাজি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলে মুসলিম লীগও তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে রাজনৈতিক সংকট সমাধানে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলো অকেজো হয়ে যায়।

বড়লাট ওয়েভেল মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস দলকে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানের আহ্বান জানান। কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি জহরলাল নেহেরু কর্তৃক মুসলিম লীগের স্বার্থবিরোধী বক্তব্যের প্রেক্ষিতে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদানের পূর্ব সিদ্ধান্ত বাতিল করে। কিন্তু বড়লাটের আহ্বানে নেহেরু সরকার গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর প্রতিবাদে মুসলিম লীগ ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' ঘোষণা করে। এই দিন ভয়াবহ দাঙ্গায় হাজার হাজার নিরীহ মানুষ নিহত হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের মারাত্মক অবনতি ঘটলে ব্রিটিশ সরকার ভারতীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের পূর্বে ভারতীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের দায়িত্ব পালনের জন্য লর্ড মাউন্টব্যাটেনকে ভারতের বড়লাট হিসেবে পাঠানো হয়।

লর্ড মাউন্টব্যাটেন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভারত বিভক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা থেকে দেশরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত নেতৃবৃন্দ দেশবিভাগে সম্মত হতে বাধ্য হন। ৩রা জুন মাউন্টব্যাটন ভারত বিভাগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি এও ঘোষণা করেন যে, ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হবে। অপরদিকে পাকিস্তান দাবি মেনে নেয়ায় মুসলিম লীগ সন্তোষ প্রকাশ করে।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৫ই জুলাই লন্ডনে কমন্স সভার এক ঘোষণায় ভারত-পাকিস্তান নামে দুইটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়। দুই দেশের সীমানা নির্ধারণের জন্য স্যার র‍্যাডক্লিফের নেতৃত্বে সীমানা নির্ধারণ কমিটি গঠন করা হয়। ৯ই আগস্ট র‍্যাডক্লিফ তাঁর সীমান্ত রোয়েদাদ সমাপ্ত করে ভাইসরয়ের কাছে জমা দেন, যা রহস্যজনক কারণে আলোর মুখ দেখেনি। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৮ই জুলাই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' প্রণয়ন করা হয়, যার ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ই আগষ্ট ভারত নামে দুইটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

দলীয় কাজ ঃ 'ভারত স্বাধীনতা আইন'-এর মাধ্যমে কেন দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়- এর যৌক্তিকতা উপস্থাপন কর।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা ভাগ করেন কে?

ক. লর্ড কর্ণওয়ালিস
খ. লর্ড কার্জন
গ. লর্ড চেমসফোর্ড
ঘ. লর্ড রীডিং

২. মাস্টারদা সূর্য সেন এর নেতৃত্বে গঠিত বিপ্লবী সংগঠনের কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল-

i. চট্টগ্রাম বিপ্লবী বাহিনী গঠন
ii. স্বাধীন চিটাগাঙ সরকার এর ঘোষণা
iii. চিটাগাঙ রিপাবলিকান আর্মি গঠন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ

নিশাপুর চা বাগানে চা-শ্রমিকরা তাদের কম মজুরির প্রতিবাদ করতে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করছিল। অবরোধ ভাঙচুর চালাতে থাকলে শ্রমিক নেতা কিরণ তাদের সহিংস আন্দোলন পরিত্যাগ করে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য আহ্বান জানান।

৩. শ্রমিক নেতা কিরণ কোন ব্যক্তির নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন?

ক. ক্ষুদিরাম
খ. মাস্টারদা সূর্যসেন
গ. মহাত্মা গান্ধী
ঘ. পুলিন বিহারী দাস

৪. উক্ত নেতার কর্মকাণ্ডের মধ্যে ছিল-

i. হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য দৃঢ়করণ
ii. নির্যাতনমূলক আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ
iii. সত্যাগ্রহ বন্দীদের মুক্তিদানের দাবি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১. সালেহপুর ইউনিয়নটি নদীর তীরে অবস্থিত। গত বছর বন্যায় ফসল ও রাস্তাঘাটের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আয়তনে বড় হওয়ায় ত্রাণ তৎপরতাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। উক্ত সমস্যা সমাধানকল্পে এই ইউনিয়নকে দুইটি আলাদা ইউনিটে ভাগ করা হয়।

ক. মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে কোথায় নির্বাসিত করা হয়?

খ. স্বত্ব বিলোপ নীতি বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বঙ্গভঙ্গের কোন কারণটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত কারণটিই কী বঙ্গভঙ্গের একমাত্র কারণ মনে কর? মতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. কেয়া ও কণা দুই বোন ঈদের কেনাকাটা করতে বাজারে যায়। কেয়া তার পছন্দের তালিকায় বিদেশি পণ্য রাখলেও কণা বিদেশি পণ্যকে পরিত্যাগ করে দেশি পণ্য কেনার পক্ষে মত দেয়। অবশেষে কণা তার বোন কেয়াকে দেশি পণ্য কেনার বিষয়টি বুঝাতে সক্ষম হয় এবং উভয়ে দেশি পণ্য ক্রয় করে বাসায় ফেরে।

ক. দিল্লির মুঘল সম্রাটের পদ বিলুপ্ত করেন কে?

খ. 'এনফিল্ড' রাইফেল সৈন্যদের বিদ্রোহী করে তুলল কেন?

গ. কোন আন্দোলনের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে কণা দেশি পণ্য কিনতে উৎসাহবোধ করেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর কেয়ার মতো মানসিকতা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়? যুক্তি দাও।

একাদশ অধ্যায়

ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ

ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি সংস্কৃতির স্বাধিকার আন্দোলন। পরবর্তীকালে এই আন্দোলন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্ম দেয়। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ এই আন্দোলন। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালির অধিকার হরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়। পুরো পাকিস্তানের মোট জনগোষ্ঠীর ৫৬ শতাংশের মুখের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সংখ্যালঘিষ্ঠ মাত্র ৩.২৭% জনগোষ্ঠীর ভাষা উর্দুকে তারা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চায়। শাসকগোষ্ঠী ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত উপেক্ষা করে উর্দু ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবী সমাজ প্রথমেই প্রতিবাদ মুখর হয়। তারা অন্যায় বৈষম্যমূলক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত। ১৯৫২ সালে এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে উঠে। পৃথিবীতে ভাষার জন্য প্রথম শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার এবং অনেকে। ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষা দেয়। যার প্রেরণায় দীর্ঘ সংগ্রামের পর জন্ম নেয় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি-বাংলাদেশ।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট এবং এর মর্যাদা বর্ণনা করতে পারব;
- নতুন রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
- যুক্তফ্রন্ট গঠন এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ মূল্যায়ন করতে পারব;
- ভাষা আন্দোলনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে আগ্রহী হব;
- রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে ভাব বিনিময়ে উৎসাহী হব এবং অপরকেও উৎসাহী করব।

ভাষা আন্দোলনের পটভূমি

১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট ভারত উপমহাদেশ বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভাষা, সংস্কৃতি কোনো কিছুরই মিল নেই। প্রায় এক হাজার মাইল ব্যবধানের পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) দুইটি ভূখণ্ডকে এক করা হয় শুধু ধর্মের ভিত্তিতে। ফলে পাকিস্তান নামক এই নতুন রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী প্রথমেই বাঙালিকে শোষণ করার কৌশল হিসেবে বাংলা ভাষার ওপর আঘাত হানে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে? এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বেই। সে সময় মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মতামত দেন। তখনই ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহসহ বাংলার বুদ্ধিজীবী, লেখকগণ এর প্রতিবাদ করেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর পরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে তমদ্দুন মজলিশ গঠিত হয়। এটিই ছিল ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন। এ সংগঠনের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভাষা আন্দোলনের প্রথম পুস্তিকা 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটিতে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য ৪৭-এর ডিসেম্বর মাসে গঠিত হয় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', যার আহ্বায়ক মনোনীত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নূরুল হক ভূঞা। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পাশাপাশি পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ববঙ্গ বুদ্ধিজীবী সমাজ, সাংবাদিক সংঘ বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। সব কিছুকে উপেক্ষা করে ডিসেম্বর মাসে করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য সংবিধান সভার কাছে সুপারিশ করে।

১৯৪৮ সালের প্রথম থেকেই শিক্ষিত বাঙালি সমাজ বাংলা ভাষার দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এ সময় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক সভায় নিম্নশ্রেণি থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাকে গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ২৩এ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দুতে কার্যক্রম শুরু হলে পূর্ব বাংলা কংগ্রেস পার্টির সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত এর প্রতিবাদ করেন এবং বাংলাকেও অধিবেশনের অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। কিন্তু, মুসলিম লীগের সকল সদস্য এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। এ ঘটনায় পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজ ব্যাপকভাবে প্রতিবাদ করতে থাকে। ২৬ ও ২৯এ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। ২রা মার্চ দেশের ছাত্রসমাজ বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বারের মতো 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করে। এবার আহ্বায়ক মনোনীত হন শামসুল আলম।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নতুন কমিটির আহ্বানে ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালিত হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করা। ধর্মঘটের পক্ষে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানসহ মিছিল করার সময় পুলিশের লাঠিচার্জে অনেকে আহত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, অলি আহাদ, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অনেকেই গ্রেফতার হন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩-১৫ই মার্চ আবার ধর্মঘট পালিত হয়। এবার শুধু ঢাকা নয়, দেশের সর্বত্র ধর্মঘট পালিত হয়। তীব্র আন্দোলনের মুখে ১৫ই মার্চ মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনায় বসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি, তদন্ত কমিটি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব আইন পরিষদে উত্থাপন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৯৪৮ সালের ১৯ই মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ২১এ মার্চ রমনার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এবং ২৪এ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য দেন। দুটি বক্তব্যেই তিনি বাংলা ভাষার দাবি অগ্রাহ্য করে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। উপস্থিত ছাত্ররা তীব্র প্রতিবাদে 'না না' ধ্বনি দিয়ে ওঠে। এ সময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে বক্তৃতাকালে আবার উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। ছাত্ররা 'না না' বলে প্রতিবাদ করে উঠে।

১৯৪৮ সালে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনে বাংলা ভাষা আরবি হরফে লেখার প্রস্তাব দেওয়া হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর প্রতিবাদ করেন। আরবি হরফে বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলা ভাষা সংস্কারের নামে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে 'পূর্ব বাংলা ভাষা কমিটি' গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রতিবাদ জানায়। ১৯৫০ সালের ১১ই মার্চ আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এ বছরের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদ কর্তৃক গঠিত মূলনীতি কমিটির সুপারিশে বলা হয়, উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। দেশজুড়ে প্রতিবাদ সভা-সমাবেশ চলতে থাকে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর হাতে নিহত হলে প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমুদ্দিন। ১৯৫২ সালে ঢাকায় খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্যে জিন্নাহ্‌র কথার প্রতিধ্বনি হলে ভাষা আন্দোলন নতুন মাত্রা ও সর্বাত্মক রূপ লাভ করে। এভাবে চূড়ান্ত পর্যায়ের সূচনা হয়।

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়

নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ১৯৫২ সালের ২৬এ জানুয়ারি পল্টন ময়দানে ঘোষণা দেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এর প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৩০এ জানুয়ারি সভা ও ছাত্র ধর্মঘটের আহ্বান করে। ৩১এ জানুয়ারি আওয়ামী মুসলিম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। এ সভায় একুশে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল, জনসভা ও বিক্ষোভ মিছিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এসময় হঠাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিন ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে সব ধরনের সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ মিছিল নিষিদ্ধ করেন। সরকারি এ ঘোষণা পাওয়া মাত্রই ঢাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্ররা কিছুতেই ১৪৪ ধারা মেনে নিতে পারেনি।

২০এ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের বৈঠক বসে। আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে এ সভায় ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্তে দ্বিমত দেখা দেয়। অধিকাংশ সদস্য প্রথমে ১৪৪ ধারা অমান্য করার পক্ষে ছিলেন না। কিন্তু, আবদুল মতিন, ওলি আহাদ, গোলাম মাহবুব প্রমুখ নেতা ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্তে অটুট থাকেন। অবশেষে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল ১১ টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় (বর্তমানে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের চত্বরে) ছাত্রদের সভা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী সমাবেশে যোগ দেয়। কতিপয় নেতা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার জন্য ছাত্রদের অনুরোধ করে। তবে ছাত্র নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্তে অটল থাকে। সভায় ছোট ছোট দলে ছাত্ররা মিছিল করে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্র-ছাত্রীরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান দিয়ে মিছিল করতে থাকলে পুলিশ তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

ছাত্র-ছাত্রীরাও পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে সমবেত হয়ে গণপরিষদের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুল জব্বার ঘটনাস্থলে শহিদ হন। আব্দুস সালাম ঐদিন গুলিবিদ্ধ হয়ে ৭ এপ্রিল শহিদ হন। সে সময় গণপরিষদের অধিবেশন চলছিল। গুলির খবর পেয়ে আবদুর রশীদ তর্কবাগীশসহ আইন পরিষদের কয়েকজন সদস্য অধিবেশন ত্যাগ করে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন।

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন ২২এ ফেব্রুয়ারি গণবিক্ষোভ শুরু হয়। জনতা শহিদদের জন্য শোক মিছিল বের করে। আবারও মিছিলের ওপর পুলিশ ও মিলিটারি লাঠি, গুলি ও বেয়োনেট ব্যবহার করে। এতে শফিউর রহমানসহ আরও কয়েকজন শহিদ হন এবং অনেকে গ্রেফতার হন। যেস্থানে পুলিশের গুলিতে শহিদ হয় সেখানে ছাত্ররা সারারাত জেগে ২৩এ ফেব্রুয়ারি একটি স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদমিনার নির্মাণ করে। পরে পুলিশ শহিদ মিনারটি ভেঙে দেয়। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে অস্থায়ী শহিদ মিনারের স্থলে শিল্পী হামিদুর রহমানের নকশা ও পরিকল্পনায় শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহিদ মিনারটি ভেঙে দিলে ১৯৭২ সালে সে নকশা অনুযায়ী বর্তমান শহিদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

তারপরেও ভাষা আন্দোলন অব্যাহত ছিল। প্রবল আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। জাতীয় পরিষদে বাংলা ভাষা বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের একপর্যায়ে এর সদস্য আদেলউদ্দিন আহমদের দেওয়া সংশোধনী প্রস্তাব অনুযায়ী উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বিল পাস করা হয়। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হয়।

ভাষা আন্দোলনে নারী

আটচল্লিশ ও বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে তৎকালীন এদেশের নারী সমাজের প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। মিছিলে, শ্লোগানে, সভাসমিতিতে তারাও পুরুষের পাশাপাশি সংগ্রাম করেছেন।

ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ, বিশেষ করে কামরুন্নেসা স্কুল এবং ইডেন কলেজ ছাত্রীদের ভূমিকা ছিল সংগ্রামী। মিছিল মিটিং-এ উপস্থিত থেকে নাদিরা চৌধুরীসহ আরও অনেকে পোস্টার, ফেস্টুন লিখনসহ এবং নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

ঢাকার বাইরেও নারী সমাজের ভূমিকা ছিল সক্রিয় এবং প্রতিবাদী। যশোরে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন হামিদা রহমান। বগুড়ার বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন রহিমা খাতুন, সালেহা খাতুন সহ অনেকে। ভাষা আন্দোলনে সিলেটের নারীদের ও ব্যাপক ভূমিকা ছিল। এ আন্দোলনে সংগ্রামী ভূমিকা রাখেন হাজেরা মাহমুদ, যোবেদা খাতুন চৌধুরী, শাহেরা বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, সৈয়দা নাজিরুন্নেছা খাতুন, রাবেয়া খাতুনসহ অনেকে। পোস্টার ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে আন্দোলন সচল রাখার তৎপরতা চালানোর সময় ১৯৪৯ সালের ১৩ই আগস্ট গ্রেফতার হন লিলি চক্রবর্তী। এসব সংগ্রামী ভূমিকার পাশাপাশি ঐ সময় বিভিন্ন স্থানে নারীরা ভাষা আন্দোলনকারীদের সহযোগিতা করেন। তাঁদের মধ্যে নিবেদিতা নাগ, সারা তৈফুর মাহমুদ, সাহেরা বানু উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি যাঁরা পূর্ববাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন বর্জন করেন তাদের মধ্যে আনোয়ারা খাতুন ছিলেন অন্যতম। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা ভাষার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে ছাত্রীরাও দুঃসাহসী ভূমিকা রাখেন। একুশে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙ্গায় যাঁরা সাহসী ভূমিকা রেখেছিলেন তারা হলেন শামসুন্নাহার, রওশন আরা, সুফিয়া ইব্রাহিমসহ অনেকে। তাছাড়া নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের নেত্রী মমতাজ বেগম গ্রেফতার হলে পুলিশ-জনতার মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়েছিল।

ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অনন্যসাধারণ ঘটনা। পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ, বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম প্রেরণা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছিল। মাতৃভাষা বাংলার প্রতি অবমাননা বাঙালির মনকে প্রবল নাড়া দিয়েছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানিদের হাতে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি কিছুই নিরাপদ নয়। এভাবেই বাঙালির মাঝে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বীজ বপিত হয়।

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের গুরুত্ব

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরের বছর থেকে প্রতিবছর একুশে দিনটি বাঙালির শহিদ দিবস হিসেবে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টা এক মিনিটে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীসহ সর্বস্তরের জনগণ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে ভাষা শহিদদের প্রতি পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। একুশের প্রভাতফেরি ও প্রভাতফেরির গান বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হয়। এদিন শহিদ দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে বাঙালি চেতনাকে লালন করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতি রক্তের বিনিময়ে মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষা করে। বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ ঘটনা হিসেবে আমাদের ভাষা ও শহিদ দিবস আজ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি লাভ করেছে। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিসে ইউনেস্কোর অধিবেশনে একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি থেকে এই দিনটি সারাবিশ্বে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

একক কাজ ঃ

১। ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিক গুরুত্ব চিহ্নিত কর।

২। শহিদ দিবসকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস বলার কারণসমূহ চিহ্নিত কর।

রাজনৈতিক তৎপরতা

১৯৪৭ সালে বাংলার বিদ্যমান রাজনৈতিক ভাবাদর্শ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির সময় পূর্ব বাংলায় প্রধানত তিনটি রাজনৈতিক দল বা ধারা বিদ্যমান ছিল। ১. ধর্মীয় আদর্শভিত্তিক রাজনৈতিক ধারার প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম লীগ, ২. অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও গণতান্ত্রিক ধারার দল জাতীয় কংগ্রেস, ৩. বিপ্লবী সাম্যবাদী ধারার কমিউনিস্ট পার্টি।

মুসলিম লীগ ও তার অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর নিখিল ভারত মুসলিম লীগের নতুন নামকরণ হয় পাকিস্তান মুসলিম লীগ। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের শাসক দল হিসেবে মুসলিম লীগের যাত্রা শুরু। শুরু থেকেই উর্দুভাষী পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবর্গের পকেট দলে পরিণত হয় মুসলিম লীগ। পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলনে বাঙালি নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টা, উদ্যোগ ও আত্মত্যাগ ভুলে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি মুসলিম লীগ নেতারা বাঙালির বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে, বাঙালির প্রতি চালায় দমননীতি। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশিমদের মতো মুসলিম লীগের ত্যাগী বাঙালি নেতারা উপেক্ষিত হন। শাসকদল হিসেবে মুসলিম লীগ শুরু থেকেই অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিকভাবে দেশ পরিচালনা করতে থাকে। ধীরে ধীরে মুসলিম লীগ জনবিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে।

১৯৪৭ সাল পরবর্তী পূর্ব বাংলায় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে। দ্বিমুখী ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে এসময় দলটি। একটি ধারা ছিল সোহরাওয়ার্দি-হাশিমপন্থী, অন্যটি ছিল খাজা নাজিমুদ্দীন-আকরাম খাঁপন্থী। প্রথম ধারাটি ছিল উদার, গণতান্ত্রিক, সংস্কারপন্থী এবং দ্বিতীয় ধারাটি ছিল রক্ষণশীল পশ্চিম পাকিস্তানিদের আজ্ঞাবহ দোসর। ফলে এ আন্তকোন্দল দলটিকে সাংগঠনিকভাবে দুর্বল করে দেয়। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংস্কারপন্থী ধারার নেতাদের সবসময় কোণঠাসা এবং দমন করার চেষ্টা করত।

মুসলিম লীগের এই ভ্রান্তনীতির কারণে দেশে মারাত্মক সংকট সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলার উন্নতির দিকে সামান্যতম দৃষ্টিপাত করত না। পূর্ব বাংলার প্রতি তাদের বৈষম্যমূলক আচরণ ক্রমেই প্রকট হতে থাকে। অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি- প্রতিটি ক্ষেত্রে এ বৈষম্য ছিল লক্ষণীয়। ১৯৪৮ সাল থেকে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগের জনসমর্থন দ্রুত কমতে থাকে।

নতুন নতুন রাজনৈতিক দল

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিম লীগ সরকারের অগণতান্ত্রিক আচরণ, দমননীতি, সীমাহীন বৈষম্য, বাংলা ভাষার অবমাননা ইত্যাদি কারণে মুসলিম লীগেরই অনেক নেতা মর্মাহত হন। মুসলিম লীগের বিরোধী পক্ষরা রাজনৈতিক দল গঠনে এগিয়ে আসেন। এসময় পূর্বের কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়াও পিপলস ফ্রিডম লীগ, গণ আজাদী লীগ, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, নেজামে ইসলাম, খিলাফত-ই-রাব্বানি পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ইত্যাদি সংগঠন গড়ে উঠে। তবে সবচেয়ে বড় পটপরিবর্তন ছিল খোদ মুসলিম লীগের মধ্যে ভাঙন। বাংলার মুসলিম লীগের সংস্কারপন্থী নেতারা মুসলিম লীগ ত্যাগ করে গড়ে তোলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ। এ রকম একটি প্রেক্ষাপটে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলায় মুসলিম লীগবিরোধী এক বা একাধিক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে উঠে।

আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ

দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম লীগের যারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ও সংস্কারপন্থী ছিল তাদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি মদদপুষ্ট প্রতিক্রিয়াশীল অপর অংশ নানাভাবে দমন নিপীড়ন চালাতে থাকে। দেশ শাসনে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশ জনগণ থেকে ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে। অন্যদিকে মুসলিম লীগের বঞ্চিত নেতাদের প্রতি জনসমর্থন বাড়তে থাকে। জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি, আবুল হাশিম, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীসহ অনেকে মুসলিম লীগের প্রচলিত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন এবং নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ঢাকায় সোহরাওয়ার্দি একটি বিরোধী দল গঠনের জন্য আলোচনায় বসেন। এরই ধারাবাহিকতায় পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগ বিরোধী নেতৃবৃন্দের সাথেও নতুন দল গঠন নিয়ে আলোচনা চলতে থাকে। নতুন দল গঠনের তৎপরতা ও প্রস্তুতির পর ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪এ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে কর্মী সম্মেলন হয়। ৩০০ জন শীর্ষ পর্যায়ের প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। সভায় সর্বসম্মতভাবে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মওলানা ভাসানীকে সভাপতি, শামসুল হককে সম্পাদক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ঢাকার আরমানিটোলায় ২৪এ জুন সদ্য গঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জন্মলগ্ন থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ দলটি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ৪২ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ সময়ে তাদের প্রধান দাবির মধ্যে ছিল রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি, একজনের এক ভোট, গণতন্ত্র, একটি সংবিধান প্রণয়ন, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বৈষম্য দূরীকরণ। বাংলার ইতিহাসে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রথম সফল বিরোধী দল। এ দলটি গঠনের মাধ্যমে বিরোধী রাজনীতিতে যে শূন্যতা ছিল তা পূরণ হয়। মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের কুশাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে অচিরেই দলটি জনগণের আস্থা অর্জনে সমর্থ হয়। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে জয়লাভে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এরপর মুসলিম লীগ একটি নামসর্বস্ব দলে পরিণত হয়।

জন্ম থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক চেতনায় বিশ্বাসী ছিল। ফলে ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নাম ধারণ করে এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য এর দ্বার খুলে দেওয়া হয়। ১৯৬৬ সালে 'ছয় দফা' দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ প্রকৃতই আওয়ামী বা জনগণের দলে পরিণত হয়। এরপর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পুরোটাই আওয়ামী লীগের হাতে চলে আসে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে দলটি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে জয় লাভ করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

যুক্তফ্রন্ট এবং প্রাদেশিক নির্বাচন (১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ)

১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচন ছিল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। মূলত এ নির্বাচন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক ও তার দোসরদের শোষণের বিরুদ্ধে এক 'ব্যালট বিপ্লব'। পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক বছরের মধ্যেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিভিন্ন উপদল, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ব্যর্থ শাসন, অঞ্চলভেদে বৈষম্যমূলক নীতি প্রভৃতির কারণে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল গঠন আবশ্যক হয়ে পড়ে। বিশেষ করে এ সময় পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনের চরম ব্যর্থতার ফলে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামি, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। পূর্ব থেকেই ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় নানা টালবাহানা করে নির্বাচনের তারিখ বারবার পিছিয়ে দেয়। অবশেষে সরকার পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ধার্য করে ১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চ।

যুক্তফ্রন্ট গঠনের পটভূমি এবং ২১ দফা কর্মসূচি

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ ছিল পুরাতন ও বড় দল। এছাড়া পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার পরিচালনা করত মুসলিম লীগ। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিম লীগকে পরাজিত করার কৌশল হিসেবে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করার পরিকল্পনা নেয়। এরই প্রেক্ষিতে ১৯৫৩ সালের ১৪ই নভেম্বর ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'যুক্তফ্রন্ট' গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। যুক্তফ্রন্ট মূলত চারটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত হয়। ১. মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী মুসলিম লীগ, ২. শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি, ৩. মওলানা আতাহার আলীর নেজাম-ই-ইসলামি পার্টি এবং ৪. হাজী দানেশের বামপন্থী গণতন্ত্রী দল। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল 'নৌকা'। আওয়ামী মুসলিম লীগের নির্বাচনী কর্মসূচির ৪২ দফার প্রধান প্রধান দাবি নিয়ে যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করা হয়। পূর্ব বাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে প্রণীত এই ২১ দফা কর্মসূচির মুখ্য রচয়িতা ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ। এই দফাগুলো সংক্ষেপে বর্ণিত হলো:

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত ও ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা।

৩. পাটশিল্পকে জাতীয়করণ করা।

৪. কৃষির উন্নতির জন্য সমবায় কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

৫. লবণের কারখানা স্থাপন করা।

৬. মোহাজের-শিল্পী-কারিগর শ্রেণির কর্মসংস্থান করা।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করে বন্যা ও দুর্ভিক্ষের অবসান করা।

৮. শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা।

৯. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা।

১০. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে ভেদাভেদ দূর করা এবং সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্য করা।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

১২. শাসন ব্যয় হ্রাস করা।

১৩. ঘুষ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালাকানুন বাতিল করা।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথক করা।

১৬. মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন 'বর্ধমান হাউসকে' বাংলা ভাষা গবেষণাগারে পরিণত করা।

১৭. '৫২'-এর ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ।

১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহিদ দিবস হিসেবে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা।

১৯. ১৯৪০ -এর লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব বাংলাকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান।

২০. আইন পরিষদের মেয়াদ কোনোভাবেই বৃদ্ধি না করা।

২১. আইন পরিষদের আসন শূন্য হলে তিন মাসের মধ্যে উপ নির্বাচন দিয়ে তা পূরণ করা।

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চের নির্বাচন ছিল পূর্ব বাংলায় প্রথম অবাধ ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনে শতকরা ৩৭.১৯ ভাগ ভোটার ভোট দেয়। ২রা এপ্রিল সরকারিভাবে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়। মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসন লাভ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন।

নির্বাচনের তাৎপর্য

১৯৫৪ সালের নির্বাচন ছিল মুসলিম লীগের অন্যায়, বৈষম্যমূলক, ব্যর্থ শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। বাঙালি জাতি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে বুঝিয়ে দেয় যে তারা পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে আর চায় না। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা, বিশেষ করে তরুণ নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা পূর্ব বাংলার ভবিষ্যত নেতৃত্ব তৈরির পথ সুগম করে। কারণ অনেক তরুণ নেতার কাছে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতৃত্বের পরাজয় ঘটে। এছাড়া যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আওয়ামী মুসলিম লীগের সর্বোচ্চ আসন লাভ ভবিষ্যতে তাদের পূর্ব বাংলায় বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত বহন করে। এ নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারার সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি এ নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও অবাঙালি নেতৃত্বের প্রতি বাঙালির মনে ব্যাপক অনাস্থা জন্মায়। তাঁরা বুঝতে পারে পশ্চিম পাকিস্তানি ও তাদের এ দেশীয় দোসরদের দ্বারা বাঙালির প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলাবাসী স্বায়ত্তশাসনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে।

নির্বাচন পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা গঠন

শেরেবাংলা এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট ১৪ সদস্যবিশিষ্ট মন্ত্রিসভা গঠন করে। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও তিনি অর্থ, রাজস্ব ও স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব নেন। অন্যান্য সদস্যের মধ্যে আবু হোসেন সরকার বিচার, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার, সৈয়দ আজিজুল হক শিক্ষা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি, সমবায় ও পল্লি উন্নয়ন বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন।

যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিসভা বাতিল ও পূর্ব বাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন

যুক্তফ্রন্টের নিরঙ্কুশ জয় শুরু থেকেই মুসলিম লীগ সুনজরে দেখেনি। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করে। এ সময় শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক কলকাতা সফরে দুই বাংলা নিয়ে আবেগপ্রবণ বক্তব্য দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাগভাজন হন। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটি ও বর্ধমান হাউসকে বাংলা ভাষার গবেষণা প্রতিষ্ঠান ঘোষণা দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় সরকার সুযোগ খুঁজতে থাকে যে কোনো অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বাতিল করতে। এমতাবস্থায় মে মাসে কেন্দ্রীয় কারাগারের সামনে কারা কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় জনগণের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং আদমজি জুট মিলে বাঙালি ও বিহারি শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক গোলযোগ হয়। ফলে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ বলে দায়ি করতে থাকে। একই সময় 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ ফজলুল হকের এক সাক্ষাৎকার বিকৃত করে প্রকাশিত হয় যে তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা চান। এতে মুসলিম লীগ সরকার তাঁকে রাষ্ট্রোদ্রোহী বলে ঘোষণা দেয়। অবশেষে কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২ (ক) ধারা বলে ১৯৫৪ সালের ৩০এ মে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করে পূর্ব বাংলায় গভর্নরের শাসন জারি করে। এ শাসন ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দের ২রা জুন পর্যন্ত বহাল থাকে। মাত্র ৫৬ দিনের শাসনের পর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার অবসান হয়। মূলত মুসলীম লীগ ও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রে এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে কোন্দলের কারণে ঘন ঘন সরকার বদল হতে থাকে। মাত্র চার বছরে সাত মন্ত্রিসভার পতন হয়। কেন্দ্রীয় সরকার তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করে। যুক্তফ্রন্টের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্তের ফলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি।

একক কাজ ঃ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ভূমিকা চিহ্নিত কর।

১৯৫৬ সালের সংবিধান

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালিত হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম নেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন পর্যায়ে দ্রুত সংবিধান রচনার দাবি উঠে। পূর্ব বাংলা থেকে এ দাবি ছিল আরও জোরালো। পূর্ব বাংলার জনদাবিই ছিল নতুন সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যেন অর্জিত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব বাংলাকে উপনিবেশে পরিণত করতে চাইল। প্রথম অবস্থায় নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে পাকিস্তান গণপরিষদ গঠন করা হয়। এই গণপরিষদের দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে কাজ করা এবং নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা। কিন্তু শাসকগোষ্ঠীর অনীহায় গণপরিষদের কাজ ব্যাহত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ কর্তৃক একটি মূলনীতি কমিটি গঠন করা হয়। এ মূলনীতি কমিটিতে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ছিল নগণ্য। সময়ক্ষেপণ করে মূলনীতি কমিটি ১৮ মাস পরে তার সুপারিশ ও প্রতিবেদন পেশ করে। এ কমিটির সুপারিশে পূর্ব বাংলার জনগণকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হলে পূর্ব বাংলায় ব্যাপক প্রতিবাদ উঠে এবং তারা কমিটির সুপারিশকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর মূলনীতি কমিটি ১৯৫২ সালে দ্বিতীয় এবং ১৯৫৩ সালে তৃতীয় প্রতিবেদন প্রকাশ করে। কিন্তু সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি অমীমাংসিত রয়ে যায়। অবশেষে ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে গভর্নর জেনারেল পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। পশ্চিম ও পূর্ব অংশের নেতারা একটি সমঝোতায় আসতে সক্ষম হন। তারই ভিত্তিতে ১৯৫৬ সালের সংবিধান রচিত হয়। এবং এটি দুই বছর পর্যন্ত কার্যকরীছিল। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করলে সংবিধান স্থগিত করা হয় এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তানে সাংবিধানিক শাসনের অবসান ঘটে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ঃ

১. কার নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের প্রথম সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিশ' গঠিত হয়?

ক. ড. কাজী মোতাহার হোসেন খ. অধ্যাপক আবুল কাশেম

গ. জনাব আবুল মনসুর আহমদ ঘ. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

২. ১৯৪৮ সালে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়-

i. ভাষা আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপদানের জন্য

ii. পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্তর্ভুক্তির জন্য

iii. আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রতিবাদ জানাতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও iii ঘ. ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

টেলিভিশনে লোকজ গানের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। মিথিলা বেশ আগ্রহ নিয়ে অনুষ্ঠানটি দেখছিল। কিন্তু, তার ছোট ভাই মিঠুন কেবলই চ্যানেল পরিবর্তন করে ইংরেজি কার্টুন দেখতে চেষ্টা করছিল। মিঠুনের মতে ঐসব গানের শ্রোতা হচ্ছে গ্রামের লোক। তার বোনের এসব গানপ্রীতি বেমানান লাগে।

৩. মিথিলা কোন্ আন্দোলনের চেতনায় অনুপ্রাণিত?

ক. অসহযোগ আন্দোলন খ. খিলাফত আন্দোলন

গ. ভাষা আন্দোলন ঘ. স্বাধিকার আন্দোলন

৪. উক্ত চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে মিথিলা হতে পারেন-

i. দেশপ্রেমিক

ii. জাতীয়তাবাদী

iii. প্রতিবাদী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ঃ

১. সবুজনগর অঞ্চলের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন প্রভাবশালী দলের নেতাকে মোকাবেলা ও পরাজিত করার জন্য ছোট ছোট দল একতাবদ্ধ হয়। তারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্য একটি নির্বাচনী ইশতেহার প্রকাশ করে। জনগণ উক্ত জোটের উপর সার্বিক আস্থা রেখে তাদের পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। এর অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে নির্বাচনে জোটের নেতৃবৃন্দ বিপুল ভোটে জয়ী হন এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতা চরমভাবে পরাজিত হন।

ক. আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন?

খ. 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গড়ে তোলা হয় কেন?

গ. সবুজনগর অঞ্চলের ছোট দলগুলো স্বাধীনতাপূর্ব কোন নির্বাচন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে একতাবদ্ধ হয়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ক্ষমতাসীন ও প্রভাবশালী হলেই নির্বাচনে জয়ী হওয়া যায় না' –পাঠ্যপুস্তকে পঠিত অভিজ্ঞতার আলোকে উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

২. পলাশ তার বন্ধু ডেভিডের জন্মদিনে মোবাইল ফোনে মেসেজে ইংরেজি অক্ষরে 'SHUVO JONMODIN' কথাটি লিখে পাঠায়। পাশ্চাত্য ভাবধারায় বেড়ে ওঠা ডেভিড তার বন্ধুর কাজটিকে সমর্থন করেনি। সে ইংরেজিতে জন্মদিনের প্রচলিত মেসেজে 'HAPPY BIRTHDAY' আশা করেছিল।

ক. ১৯৪৮ সালের ২৪এ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন?

খ. ১৯৪৯ সালের পূর্ববাংলা ভাষা কমিটি কেন গঠিত হয়?

গ. পলাশের মানসিকতায় কোন আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর ডেভিডের চিন্তা-চেতনা বাংলা ভাষা বিকাশের অন্তরায়? যুক্তি দাও।

দ্বাদশ অধ্যায়

সামরিক শাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন (১৯৫৮ - ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দ)

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শাসনব্যবস্থায় একধরনের স্বৈরতান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এছাড়া এর সাথে যুক্ত হয় সেনাবাহিনীর প্রভাব। পাকিস্তানের রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ ক্রমেই বাড়তে থাকে। সেনাবাহিনী শাসন ক্ষমতা দখল করার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ১৯৫৬ সালের ২৩এ মার্চ জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। তার সময়কালে সামরিক বাহিনী রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব রাখতে শুরু করে। ইস্কান্দার মির্জা নানাভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাঁধা সৃষ্টি করেন। তার ষড়যন্ত্রে কয়েকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পতন হয়। এদিকে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক পার্টির দ্বন্দ্ব চরমে উঠে। একপর্যায়ে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে বিরোধী দল কৃষক-শ্রমিক পার্টির আক্রমণে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী মাথায় আঘাত পেয়ে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর ফলে সৃষ্ট গোলযোগ ইস্কান্দার মির্জার পক্ষে সেনা শাসন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ তৈরি করে দেয়।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে সৃষ্ট পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের প্রেক্ষাপট এবং এর ফলাফল বর্ণনা করতে পারব;
- তৎকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে ৬ দফার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ১১ দফা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারব;
- ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষিত ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব;
- দেশের স্বার্থ ও অধিকার আদায়ে সচেতন হব।

১৯৫৮ সালের সামরিক শাসন

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা মালিক ফিরোজ খানের সংসদীয় সরকার উৎখাত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। তিনি দেশের সংবিধান বাতিল করেন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ ভেঙে দেন এবং মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিয়োগ করা হয় সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে। মেজর জেনারেল ওমরাও খান পূর্ব বাংলার সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত হন। এর কিছুদিনের মধ্যে ২৭এ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান ইস্কান্দার মির্জাকে অপসারণ করে নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন।

আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পর পাকিস্তানের শাসন ও রাজনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেন। তিনি প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরিত্যাগ করে এক অদ্ভুত ও নতুন নির্বাচন কাঠামো প্রবর্তন করেন।

তাঁর এই নির্বাচনের মূলভিত্তি ছিল 'মৌলিক গণতন্ত্র'। মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে একধরনের সীমিত গণতন্ত্র, যাতে কেবল নির্দিষ্টসংখ্যক লোকের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের অধিকার ছিল। ১৯৫৯ সালে মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তনের আদেশ জারি করা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি চার স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন থেকে উচ্চ পর্যন্ত স্তরগুলো ছিল: (১) ইউনিয়ন পরিষদ (গ্রামে) এবং টাউন ও ইউনিয়ন কমিটি (শহরে), (২) থানা পরিষদ (পূর্ব বাংলায়), তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা পরিষদ, (৪) বিভাগীয় পরিষদ। এই পরিষদগুলোতে নির্বাচিত ও মনোনীত উভয় ধরনের সদস্য থাকত।

মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় পাকিস্তানের উভয় অংশে ৪০০০০ করে মোট ৮০০০০ মৌলিক গণতন্ত্রী নিয়ে দেশের নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়। নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা মৌলিক গণতন্ত্রী বা বিডি মেম্বার ছিল। জনগণের মৌলিক গণতন্ত্রী নির্বাচন করা ছাড়া কোন দায়িত্ব ছিল না। বিডি মেম্বার ছিল প্রকৃত নির্বাচক। তারাই প্রেসিডেন্ট, জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচন করতেন। এই মৌলিক গণতন্ত্রীদের আস্থা ভোটে আইয়ুব খান ১৯৬০ সালে পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এছাড়া তিনি সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও লাভ করেন। ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ নতুন সংবিধান ঘোষণা করা হয় এবং ৮ই জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়।

একক কাজ ঃ আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্রের একটি ধারণা কাঠামো প্রস্তুত কর

সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন

১৯৬২ সালের ৩০এ জানুয়ারি সোহরাওয়ার্দিকে দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। এ খবর পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ছাত্ররা সরকারবিরোধী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১লা ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ধর্মঘট ডাকে এবং মিছিল বের করে। একনাগাড়ে ৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্মঘট চলে। এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে। ৭ই ফেব্রুয়ারি সরকার অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়। ছাত্রদের ওপর পুলিশের ব্যাপক ধরপাকড় ও নির্যাতন শুরু হয়। ১লা মার্চ আইয়ুব খান নতুন সংবিধান ঘোষণা দিলে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষোভ-সমাবেশ ও ক্লাস বর্জন করে। ছাত্রদের সংবিধান বিরোধী এ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, রাজনীতিবিদদের অনেকে সমর্থন ব্যক্ত করেন। আইয়ুব খান ও পূর্ব বাংলার গভর্নর মোনায়েম খান ছাত্রদের ওপর কঠোর দমন নীতি চালায়।

১৯৬২ সালের আগস্ট মাসে শরিফ কমিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ পেলে ছাত্র আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। এ প্রতিবেদনের সুপারিশে ছাত্রদের ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে কঠোর আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন 'বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন' নামে পরিচিত। ১৫ই আগস্ট থেকে ১০ই সেপ্টেম্বর প্রতিদিন বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ই সেপ্টেম্বর হরতাল পালনকালে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন নিহত এবং কয়েক শত আহত হয়। এ আন্দোলনের ফলে শরিফ কমিশনের সুপারিশ স্থগিত হয়। এই আন্দোলনের ফলে ছাত্ররা আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়।

১৯৬২ সালের ৮ই জুন সামরিক আইন স্থগিত করা হলে দলীয় রাজনীতির অধিকার ফিরে আসে। আইয়ুব খান নিজেই কনভেনশন মুসলিম লীগ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এসময় সোহরাওয়ার্দি সকল রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে আইয়ুব বিরোধী মোর্চা গঠনের আহ্বান জানান। ফলে আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও নূরুল আমিনের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মিলে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা এন.ডি.এফ গঠিত হয়। এ ফ্রন্টের উদ্দেশ্য ছিল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া। খুব তাড়াতাড়ি এ ফ্রন্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯৬৩ সালের ডিসেম্বরে সোহরাওয়ার্দি ইন্তেকাল করেন। ১৯৬৪ সালের শুরুতেই আওয়ামী লীগ এন.ডি.এফ. থেকে বেরিয়ে আসে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। তাঁর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নতুন যাত্রা শুরু হয়। এর ফলে এন.ডি.এফ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৬৫ সালের ২রা জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আইয়ুব খানবিরোধী একক প্রার্থী দেওয়ার জন্য আবার আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দল মিলে একটি জোট বা COP (Combined Opposition Party) গঠন করে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর বোন ফাতেমা জিন্নাহকে কপ-এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়। নির্বাচনে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পূর্ব থেকেই আইয়ুব খান নিজের অনুকূলে নিয়ে আসেন। জনগণ ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা প্রকাশ করে। কিন্তু নির্বাচনে আইয়ুব খান জয়ী হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন হয়। সেখানেও আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলিম লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান জন্ম নিলে কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে তাদের মাঝে বৈরিতার সূত্রপাত হয়। ভারত ও পাকিস্তান- উভয়ই কাশ্মীরকে তাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করত। ১৯৪৭ সালেই তাদের মাঝে কাশ্মীর নিয়ে প্রথম যুদ্ধ বাধে। কিন্তু জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে তার অবসান হয়। কাশ্মীরকে নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধে ১৯৬৫ সালে। আইয়ুব খানের দীর্ঘদিনের ইচ্ছা ছিল ভারত আক্রমণ করে কাশ্মীর দখল করা। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীরী নেতা শেখ আবদুল্লাহকে গ্রেফতার করা হলে ভারতের কাশ্মীরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। আইয়ুব এ সুযোগ গ্রহণ করেন। প্রথমে সশস্ত্র গেরিলাদের কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করিয়ে গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করেন। অবশেষে ৬ আগস্ট পাকিস্তান বাহিনী ভারত আক্রমণ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের শুরু থেকেই ভারতীয় বাহিনী প্রাধান্য দেখিয়ে লাহোরের দিকে এগিয়ে যায়। পাকিস্তানিদের এই চরম দুর্দিনে বাঙালি সেনারা অসীম সাহসের সাথে যুদ্ধ করে লাহোর রক্ষা করে। পাকিস্তানের শোচনীয় অবস্থার মুখে পাশ্চাত্য শক্তি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপে ১৭ দিনের মাথায় যুদ্ধ বন্ধ হয়। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে ভারত ও পাকিস্তানের মাঝে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এর মধ্য দিয়ে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের অবসান হয়।

এ যুদ্ধের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী চেতনা প্রবল ভাবে জাগ্রত হয়। কারণ যুদ্ধে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ছিল না। অরক্ষিত এ অঞ্চল যেকোনো সময় ভারতের আক্রমণের শিকার হতে পারত। এমনকি এ সময় প্রশাসনিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের যোগযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বাঙালি সেনারা জীবন বাজি রেখে লাহোর রক্ষা করলেও আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেননি। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় গোটা পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন পূর্ব পাকিস্তানে খাদ্যসংকট দেখা দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম অত্যধিক বেড়ে যায়। ফলে সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ভরশীলতাসহ পূর্ব পাকিস্তানের দুর্বলতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়, যার প্রতিফলন দেখা যায় ছয় দফা আন্দোলনে।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। কিন্তু, লাহোর প্রস্তাবের মূলনীতি অনুযায়ী পূর্ব বাংলা পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়নি। দীর্ঘ ২৪ বছর পূর্ব বাংলাকে স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হয়।

এসময় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করে। এরই প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ পূর্ব বাংলায় স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মের পর থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করে পশ্চিম পাকিস্তানের মুখাপেক্ষী করে রাখা হয়। লাহোর প্রস্তাবে পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হলেও পাকিস্তানি শাসকরা প্রথম থেকেই এ বিষয়ে অনীহা প্রকাশ করে। গণতন্ত্রকে উপেক্ষা করে স্বৈরতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সামরিকতন্ত্রের মাধ্যমে তারা দেশ শাসন করতে থাকে। তারা পূর্ব পাকিস্তানের ওপর উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করে সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শোষণ চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সমৃদ্ধি ঘটায়। বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উপর দমন, নিপীড়ন চালিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিবেশ অচল করে রাখে। বারবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ বাংলার জাতীয় নেতাদের অন্যায়ভাবে জেলে বন্দী করে রাখে। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানের মন্ত্রিসভায় বাঙালি প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল খুবই কম। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার জন্য পাকিস্তানি শাসকরা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন দিতে অনীহা প্রকাশ করে। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচিত সরকারকে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করে। পরবর্তী মন্ত্রিসভাগুলোকে বারবার ভেঙে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য অচল করে রাখে। অবশেষে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেয়।

প্রশাসনিক বৈষম্য

পাকিস্তানের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মূল চালিকাশক্তি ছিল সিভিল সার্ভিস কর্মকর্তাগণ। ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের মন্ত্রণালয়গুলোতে শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তার ৯৫৪ জনের মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ১১৯ জন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২০০০ কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালির সংখ্যা ছিল মাত্র ২৯০০। ১৯৪৭ সালে করাচিতে রাজধানী হওয়ায় সরকারি অফিস-আদালতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ব্যাপক হারে চাকরি লাভ করে। বলার অপেক্ষা রাখে না পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় সকল উচ্চপদে পশ্চিম পাকিস্তানিদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। সরকারের সব দপ্তরের সদর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে বাঙালির পক্ষে সেখানে গিয়ে চাকরি লাভ করা সম্ভব ছিল না। ১৯৫৬ সালে পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেওয়ায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বাঙালি ছাত্রদের সাফল্য সহজ ছিল না।

সামরিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক শাসনের আরেকটি ক্ষেত্র ছিল সামরিক বৈষম্য। সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল অতি নগণ্য। প্রথম থেকেই সামরিক বাহিনীর শীর্ষ পদ পাঞ্জাবিরা দখল করে রেখেছিল। তারা বাঙালিদের সামরিক বাহিনী থেকে দূরে রাখার নীতি গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনীর নিয়োগের ক্ষেত্রে যে কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তাতে ৬০% পাঞ্জাবি, ৩৫% পাঠান এবং মাত্র ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশ ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারণ করা হয়। বাঙালির দাবির মুখে সংখ্যা কিছুটা বাড়লেও তা ছিল নগণ্য। ১৯৫৫ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, সামারিক বাহিনীর মোট ২২১১ জন কর্মকর্তার মধ্যে বাঙালি ছিল মাত্র ৮২ জন। ১৯৬৬ সালে সামরিক বাহিনীর ১৭ জন শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ১ জন ছিল বাঙালি। আইয়ুব খানের শাসনামলে মোট বাজেটের ৬০% সামরিক বাজেট ছিল। এর সিংহভাগ দায়ভার বহন করতে হতো পূর্ব পাকিস্তানকে, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার প্রতি অবহেলা দেখানো হতো।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক ভয়াবহ বৈষম্যের শিকার হয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। এ কারণে পূর্ব পাকিস্তান কখনও অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। প্রাদেশিক সরকারের হাতে মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। কেন্দ্রের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের সকল আয় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বিমা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে সহজেই সকল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেত। পূর্ব পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল। উদ্বৃত্ত আর্থিক সঞ্চয় পশ্চিম পাকিস্তানে জমা থাকত বিধায় পূর্ব পাকিস্তানে কখনও মূলধন গড়ে ওঠেনি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সকল পরিকল্পনা প্রণীত হতো কেন্দ্রীয় সরকারের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে। সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি না থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা পূর্ব পাকিস্তানকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করত। জন্মলগ্ন থেকে পাকিস্তানে তিনটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়। প্রথমটিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ১১৩ কোটি ও ৫০০ কোটি রুপি, দ্বিতীয়টিতে বরাদ্দ ছিল ৯৫০ কোটি রুপি এবং ১৩৫০ কোটি রুপি। তৃতীয়টিতে পূর্ব ও পশ্চিমের জন্য বরাদ্দ যথাক্রমে ৩৬% ও ৬৩%। রাজধানী উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বেশিরভাগ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য। ১৯৫৬ সালে করাচির উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয় ৫৭০ কোটি টাকা, যা ছিল সরকারি মোট ব্যয়ের ৫৬.৪%। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের মোট সরকারি ব্যয়ের হার ছিল ৫.১০%। ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত ইসলামাবাদ নির্মাণের জন্য ব্যয় করা হয় ৩০০ কোটি টাকা, আর ঢাকা শহরের জন্য ব্যয় করা হয় ২৫ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানের কাঁচামাল সস্তা হলেও শিল্প-কারখানা বেশিরভাগ গড়ে উঠেছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে কিছু শিল্প গড়ে উঠলেও তার অধিকাংশের মালিক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি। ফলে শিল্প ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে নির্ভরশীল থাকতে হতো পশ্চিম পাকিস্তানের উপর। পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বর্ণ এবং টাকা-পয়সা নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে কোনো বাঁধা ছিল না। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান থেকে স্বর্ণ ও টাকা-পয়সা পূর্ব পাকিস্তানে আনার উপর সরকারের বিধিনিষেধ ছিল।

শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষা ক্ষেত্রেও বাঙালিরা বৈষমের শিকার হয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তানিরা মনে-প্রাণে চেয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি যেন শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে থাকে। অথচ তারা পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষা বিস্তারে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার উন্নয়নের কোন চেষ্টাই তারা করেনি। এছাড়া বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে শিক্ষার মাধ্যম করা বা আরবি ভাষায় বাংলা লেখার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থায় আঘাত হানতে চেয়েছিল। শিক্ষা খাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম বৈষম্য দেখানো হয়। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে শিক্ষা খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ২০৮৪ মিলিয়ন রুপি এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৭৯৭ মিলিয়ন রুপি। পাকিস্তানের সর্বমোট ৩৫টি বৃত্তির ৩০টি পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান এবং মাত্র ৫টি বরাদ্দ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য।

সামাজিক বৈষম্য

রাস্তাঘাট, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুবিধা ভোগ করত। সমাজকল্যাণ ও সেবামূলক সুবিধা বেশিরভাগ পশ্চিম পাকিস্তানিরা পেত। ফলে সামগ্রিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত ছিল।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

দুই অঞ্চলের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬%। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল হাজার বছরের পুরনো। অপরদিকে ৪৪% জনসংখ্যার পশ্চিম পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষা, জাতি ও সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। উর্দুভাষী ছিল মাত্র ৩.২৭%। অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ভাষা ও সুসমৃদ্ধ বাঙালি সংস্কৃতিকে মুছে ফেলার চক্রান্তে লিপ্ত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা। প্রথমেই তারা বাংলা ভাষাকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করে এবং বাংলা ভাষাকে আরবি বর্ণে লেখানোর ষড়যন্ত্র শুরু করে। বাঙালি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত, নাটক, সাহিত্য। বাঙালি সংস্কৃতিতে আঘাত হানার জন্য রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রচনাবলি নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। পহেলা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদযাপনকে হিন্দু প্রভাব বলে উল্লেখ করে সেখানেও বাধা দানের চেষ্টা করা হয়।

দলীয় কাজ ঃ সামরিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যের লেখচিত্রে প্রকাশ কর।

ছয় দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ

পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল, ছয় দফা দাবি আদায়ের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বৈষম্যের হাত থেকে রক্ষা করা। মূলত ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ অবসানের পর পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি সরকারের চরম অবহেলা ও সীমাহীন বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু সোচ্চার হন। ১৯৬৬ সালের ৫-৬ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধীদলীয় নেতারা একটি সম্মেলনের আহ্বান করেন। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু লাহোর পৌঁছান। সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক 'ছয় দফা' প্রস্তাব পেশ করলে সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ তা প্রত্যাখ্যান করেন। বঙ্গবন্ধু সম্মেলন বর্জন করেন এবং ছয় দফা সাংবাদিকদের সামনে প্রকাশ করে ঢাকায় ফিরে আসেন। একুশে ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুর নামে 'আমাদের বাঁচার দাবি: ছয়-দফা কর্মসূচি' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। দফাগুলো ছিল নিম্নরূপ:

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে হবে। এটি হবে সংসদীয় পদ্ধতির যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা। প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা হবে সার্বভৌম।

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অন্যান্য বিষয় থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

৩. ক. দেশের দুই অঞ্চলের জন্য সহজে বিনিময় যোগ্য দুটি মুদ্রা চালু থাকবে। মুদ্রা লেনদেনের হিসাব রাখার জন্য দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকবে। মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

ঢাকার রাজপথে ছয়দফার পক্ষে মিছিল

অথবা

খ. দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে, তবে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে, যাতে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে মুদ্রা ও মূলধন পাচার হতে না পারে। একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে এবং দুইটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

৪. সকল প্রকার কর ও শুল্ক ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। আদায়কৃত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এ দ্বারা ফেডারেল সরকার ব্যয় নির্বাহ করবে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রা ও বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলোর হাতে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে প্রদেশগুলো যুক্তিযুক্ত হারে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা মিটাবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রদেশগুলো নিজস্ব মিলিশিয়া বা আধা সামরিক বাহিনী গঠন ও পরিচালনা করতে পারবে।

১৩ই মার্চ, ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটিতে ছয় দফা গৃহীত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু ছয় দফার পক্ষে জনমত গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন স্থানে বক্তব্য দেন। তিনি ছয় দফাকে 'আমাদের বাঁচার দাবি' আখ্যায়িত করেন। ফলে ছয় দফার পক্ষে দ্রুত ব্যাপক জনমত গড়ে উঠে। আইয়ুব সরকার তাতে আতঙ্কিত হয়ে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় শুরু করে। আইয়ুব খান এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে এসে বিভিন্ন জনসভায় ছয় দফাকে রাষ্ট্রদ্রোহী ও পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি বলে আখ্যা দেন। দিনে দিনে ছয় দফার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেলে আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুকে ১৯৬৬ সনের ৯ই মে গ্রেফতার করে। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে ৭ই জুন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। হরতালের সময় মিছিলে পুলিশের গুলিতে অনেক লোক প্রাণ হারায়। এ ঘটনার প্রতিবাদে ৮ই জুন প্রাদেশিক পরিষদে বিরোধী দল ওয়াকআউট করে। ১৯৬৮ সালে বঙ্গবন্ধুকে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলায় অভিযুক্ত করে ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু করে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থানের মুখে সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নির্বাচনের মূল ইস্তেহার। এ নির্বাচনে ছয় দফার পক্ষে নিরঙ্কুশ

বিজয় অর্জিত হয়। তথাপি ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। দীর্ঘ নয় মাস মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য), ১৯৬৮

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্য ক্রমেই বাড়ছিল। জনমানুষের সাথে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অধিক সম্পৃক্ততা তাঁকে পূর্ব পাকিস্তানের জননেতায় পরিণত করেছিল। তাঁর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড রুদ্ধ করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান সরকার বারবার তাঁকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে। তারপরও বঙ্গবন্ধুকে এ ভূখণ্ড স্বাধীন করার প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখা যায়নি। বিভিন্ন সময় বঙ্গবন্ধুর সাথে নানা পেশার, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর তরুণ বাঙালি সদস্যদের যোগাযোগ হয়। একপর্যায়ে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের দিকে আকৃষ্ট হন। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন একদল সেনাসদস্য নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে দেখা করেন। তাঁদের সাথে বঙ্গবন্ধুর সশস্ত্র আন্দোলন নিয়ে মতবিনিময় হয়। ১৯৬৩ সালে বঙ্গবন্ধু গোপনে ত্রিপুরা গমন করেন। সেখানে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় তৎকালীন কংগ্রেস নেতা ও পরবর্তীকালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহের সাথে তাঁর বৈঠক হয়। সেখানে তিনি শচীন্দ্রলালের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুকে বার্তা পাঠিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনে সহযোগিতা কামনা করেন। উল্লেখ্য ১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন জনমানুষের দাবিতে পরিণত হয়। এদিকে সামারিক বাহিনীতে বিদ্যমান বৈষম্যের কারণে কয়েকজন বাঙালি অফিসার ও সেনাসদস্য গোপনে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য সংগঠিত হতে থাকেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে। সমগ্র পাকিস্তানে দেড় হাজার বাঙালিকে গ্রেফতার করা হয়। এ ষড়যন্ত্রের জন্য বঙ্গবন্ধুকে প্রধান আসামি হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়। তখন বঙ্গবন্ধু জেলে বন্দী ছিলেন। এ মামলাটি দায়ের করা হয় ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের অভিযোগ ছিল বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাতে ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তাদের গোপন বৈঠক হয়। সেখানে ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা করা হয়। এ জন্য মামলাটির নাম হয় 'আগরতলা মামলা'। সরকারি নথিতে মামলার নাম হলো 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'।

১৯৬৬ সালের ৯ই মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে সামরিক আইনে জেলগেট থেকে আবার গ্রেফতার করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এ মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন ৩৫ জন। বঙ্গবন্ধুর সাথে অভিযুক্ত অন্য ৩৪ জন হলেন লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, স্টুয়ার্ড মুজিবুর রহমান, এল.এস. সুলতান উদ্দিন আহম্মেদ, নূর মোহাম্মদ, আহমেদ ফজলুর রহমান সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ, এ.বি.এম. আবদুস সামাদ, হাবিলদার দলিল উদ্দিন হাওলাদার, রুহুল কুদ্দুস সিএসপি, ফ্লাইট সার্জেন্ট ফজলুল হক, ভূপতি ভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী), বিধান কৃষ্ণ সেন, সুবেদার আবদুর রাজ্জাক, হাবিলদার মুজিবুর রহমান, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুর রাজ্জাক, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এ.বি.এম. খুরশিদ, খান শামসুর রহমান সিএসপি, রিসালদার এ.কে.এম. শাসসুল হক, হাবিলদার আজিজুল হক, মাহফুজুল বারি, সার্জেন্ট সামসুল হক, মেজর ডা. শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মো. আবদুল মোতালেব, ক্যাপ্টেন শওকত আলী, ক্যাপ্টেন খন্দকার নাজমুল হুদা, ক্যাপ্টেন এ.এস.এম. নুরুজ্জামান, ফ্লাইট সার্জেন্ট আবদুল জলিল, মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী, লেফটেন্যান্ট এম.এম.এম. রহমান, সুবেদার এ.কে.এম. তাজুল ইসলাম, মো. আলী রেজা, ক্যাপ্টেন ডা. খুরশিদ উদ্দিন আহম্মেদ ও লেফটেন্যান্ট আবদুর রউফ।

আগরতলা মামলার বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯এ জুন বেলা এগারোটায় কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের একটি বিশেষ কক্ষে মামলার শুনানি শুরু হয়। সাক্ষির সংখ্যা ছিল সরকার পক্ষে ১১ জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২২৭ জন। প্রখ্যাত আইনজীবী আবদুস সালাম খানের নেতৃত্বে অভিযুক্ত আইনজীবীদের নিয়ে একটি ডিফেন্স টিম গঠন করা হয়। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যে প্রবাসী বাঙালিরা ব্রিটেনের স্যার টমাস উইলিয়াম এমপিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আইনজীবী হিসেবে প্রেরণ করে। পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রধান কৌঁসুলি ছিলেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদের ও অ্যাডভোকেট জেনারেল টি. এইচ. খান। ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি

ছিলেন এস এ রহমান। অপর দুই বিচারপতি ছিলেন এম আর খান ও মুকসুমুল হাকিম। ২৯এ জুলাই ১৯৬৮ সালে মামলার শুনানি পুনরায় শুরু হয়। স্যার টমাস উইলিয়াম ৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট আবেদন দাখিল করেন।

বিচারকার্য চলার সময় পাকিস্তানের উভয় অংশে আইয়ুববিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও আগরতলা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জোরদার হয়। ধীরে ধীরে পূর্ব পাকিস্তানের গণ-বিক্ষোভ ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে এসে গণ-অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ কয়েকটি রাজনৈতিক দল নিয়ে ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি (DAC) গঠন করা হয়। এরই মধ্যে ১৯৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ হয়ে পড়লে ১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকাবাসী প্রচন্ড ক্রোধে গর্জে উঠে। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে জনতা রাজপথ প্রদক্ষিণ করে। ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান উত্তাল হয়ে উঠে। পরিস্থিতি শান্ত করতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯এ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আহ্বান করেন। সেখানে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বৈঠকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত ছিলেন। আইয়ুব সরকার বঙ্গবন্ধুর যোগদানের জন্য তাঁকে প্যারলে মুক্তিদানের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মাওলানা ভাসানীসহ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সরকারি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করার দাবি জানায়। অবশেষে আইয়ুব সরকার পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে নতিস্বীকার করে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। বঙ্গবন্ধুসহ মামলার সকল অভিযুক্ত ২২এ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে মুক্তি লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর মুক্তি উপলক্ষে পরদিন ২৩এ ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে একটি সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সেই বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

আগরতলা মামলার গুরুত্ব

বাঙালিদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার স্ফুরণে এই মামলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যে উদ্দেশ্যে আইয়ুব সরকার আগরতলা মামলা দায়ের করেছিল তা আদৌ সফল হয়নি, বরং এটি আইয়ুব সরকারের জন্য বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়। এ সময়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বে মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী এগিয়ে আসেন এবং বাঙালি স্বার্থের মুখপাত্র ও আত্ম অধিকার প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবিসংবাদিত নেতা হিসাবে স্বীকৃত হন।

১১ দফা আন্দোলন

১৯৬৮-৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী গণ-আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এ সময়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ হলে আন্দোলনের গতি কিছুটা স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ছাত্ররা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, যা গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারি ডাকসু (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র-সংসদ) কার্যালয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া ও মেনন গ্রুপ) এবং ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে ডাকসুর তৎকালীন সহসভাপতি তোফায়েল আহমেদের নেতৃত্বে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন কর হয়।

এ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১১ দফা দাবি নিয়ে গণ-অভ্যুত্থানের ডাক দেয়। এ কর্মসূচি শুধু ছাত্রদের নয়, আপামর জনগণের আন্দোলনে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। ১১ দফা দাবির মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দাবির মধ্যে ছিল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ, শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি প্রদান, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, জরুরি আইন, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক আইন প্রত্যাহার, নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ, অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তি ইত্যাদি।

১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের গণ-অভ্যুত্থান

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন দানা বাঁধে তা একসময় ছড়িয়ে পড়ে শহর ও গ্রামের শ্রমিক-কৃষক ও সাধারণ মানুষের মাঝে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গড়ে

উঠে এক দুর্বার আন্দোলন, যা উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দুই অংশের মানুষ প্রথমবারের মতো একসাথে আন্দোলনে নামে। পাকিস্তান জন্মের পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি জাতিগত নিপীড়ন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠে। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান সৃষ্টিতে সেগুলো প্রত্যক্ষ প্রভাব রেখেছিল। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তীকালের সবচেয়ে বড় আন্দোলন।

১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসের ছাত্র অসন্তোষ মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। ৬ই ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশন ও পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি যৌথ কর্মসূচি হিসাবে পল্টন ময়দানে একটি জনসভার আয়োজন করে। জনসভার পর একটি বিরাট মিছিল গভর্নর হাউস ঘেরাও করে। সেখানে মিছিলকারীদের সাথে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হলে মওলানা ভাসানী ঢাকা শহরে হরতাল আহ্বান করেন। ৮ই ডিসেম্বর প্রধান বিরোধী দলগুলোর ডাকে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১০ই ডিসেম্বর আওয়ামী লীগ 'নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস' পালন করে। ২৯এ ডিসেম্বর ঘেরাও আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯৬৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া ও মেনন গ্রুপ), পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ডাকসুর নেতৃবৃন্দ মিলে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফার সাথে মিলিয়ে আরও কয়েকটি দাবি নিয়ে ১১ দফা দাবি পেশ করে। অচিরেই ১১ দফা দাবিকে আপামর বাঙালি সমর্থন প্রদান করে। উনসত্তরের উত্তাল সময়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এই ১১ দফা দাবি ছিল খুবই সময়োপযোগী। ফলে দ্রুত এ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলগুলোর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তানের ৮টি রাজনৈতিক দল মিলে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক) নামক মোর্চা গঠন করে এবং ৮ দফা দাবি পেশ করে।

এরপর থেকে 'ডাকসু' ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণ-আন্দোলন গড়ে উঠে। ডাকসু-এর আহ্বানে ১৪ই জানুয়ারি সমগ্র পাকিস্তানে হরতাল পালিত হয়। ১৮ই জানুয়ারি পুলিশি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ধর্মঘট পালন করে। ধর্মঘট চলাকালীন পুলিশের সাথে ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। ২০এ জানুয়ারি নির্যাতনের প্রতিবাদে ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল পালন করে। হরতাল পালনকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান পুলিশের গুলিতে নিহত হন। আসাদের হত্যার প্রতিবাদে ২২, ২৩ ও ২৪ তারিখে ব্যাপক কর্মসূচি ঘোষিত হয়। ২৪ তারিখে সারা দেশে হরতাল চলাকালে সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক ঢল নামে। মানুষের অংশগ্রহণে আন্দোলন যেন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়।

পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ ছাত্রনেতা আসাদ

আবারও পুলিশের গুলিতে নবম শ্রেণির ছাত্র কিশোর মতিউর নিহত হয় এবং অসংখ্য মানুষ আহত হয়। এরপর ক্ষিপ্ত জনতা সরকারি পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান ও মর্নিং নিউজ অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। ঢাকা শহর সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ২৪এ জানুয়ারির পর থেকে লাগাতার আন্দোলন ও হরতালে বহু মানুষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত ও আহত হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হককে নৃশংসভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়। জহুরুল হকের হত্যার প্রতিবাদে ১৬ই ফেব্রুয়ারি আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতির বাসভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিকেলে এক জনসভায় মওলানা ভাসানী ঘোষণা

দেন, 'দুমাসের মধ্যে ১১ দফা বাস্তবায়ন ও রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। প্রয়োজন হলে ফরাসি বিপ্লবের মতো জেল ভেঙে মুজিবকে মুক্ত করে আনব।' অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ঢাকায় কারফিউ জারি করে। ১৮ই ফেব্রুয়ারি সেনাবাহিনী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়োনেট চার্জ করে হত্যা করে।

১৮ই ফেব্রুয়ারির পর থেকে আন্দোলন আরও বেগবান হলে দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি ঘটে। অবশেষে আইয়ুব খান বিরোধী দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করলে নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করেন। আইয়ুব খান বুঝতে পারেন, আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও অভিযুক্তদের মুক্তি না দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। গণ- অভ্যুত্থানের চাপে তিনি একুশে ফেব্রুয়ারি ঘোষণা দেন, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হবেন না।

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির পর ঊনসত্তরের গণ-আন্দোলন নতুন রূপ লাভ করে। ২৩এ ফেব্রুয়ারির সংবর্ধনা সভায় বঙ্গবন্ধু ১১ দফা দাবির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং ৬ দফা ও ১১ দফা বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতি দেন। ২৬এ ফেবুয়ারি আইয়ুব খানের সাথে গোলটেবিল বৈঠকে ৬ দফা ও ১১ দফার প্রশ্নে অটল থাকেন। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা বারবার ব্যর্থ হতে থাকে। পুরো দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। মার্চ মাসে সেনাবাহিনীর গুলিতে ৯০ জন নিহত হয়। অবশেষে ১০ই মার্চের বৈঠকে আইয়ুব খান সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। ২২এ মার্চ আইয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খানকে অপসারণ করেন। তাতেও গণ-আন্দোলন থামানো যায় নি। ২৫এ মার্চ আইয়ুব খান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে আইয়ুববিরোধী গণঅভ্যুত্থান সফলতা অর্জন করে। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে গ্রাম ও শহরের কৃষক ও শ্রমিকদের মাঝে শ্রেণি চেতনার উন্মেষ ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পায়। বাঙালি জাতীয়তাবাদ পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :

১. কে পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন?

ক. মুহম্মদ আলী জিন্নাহ খ. ইস্কান্দার মির্জা

গ. আইয়ুব খান ঘ. মালিক ফিরোজ খান

২. আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম কারণ-

i. দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সোহরাওয়ার্দিকে গ্রেপ্তার

ii. ছাত্রদের উপর পুলিশি নির্যাতন

iii. আইয়ুব খান কর্তৃক নতুন সংবিধান ঘোষণা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অগ্রণী ক্লাবের সভাপতির একরোখা মনোভাব ও অসহযোগিতামূলক কার্যক্রমে অসন্তোষ প্রকাশ করেন ক্লাবের সদস্যগণ। মারুফ সাহেবের নেতৃত্বে সদস্যগণ তাঁদের দাবি-দাওয়া সভাপতির নিকট পেশ করেন। সভাপতি ও তাঁর পক্ষের লোকজন বিষয়টিকে অযৌক্তিক মনে করে প্রত্যাখ্যান করেন। ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মারুফ সাহেব ও তার অনুসারী সদস্যবৃন্দ সোচ্চার হন।

৩. মারুফ সাহেবের গৃহীত পদক্ষেপে কোন্ ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়?

ক. ছয় দফা দাবি উত্থাপন
খ. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট গঠন
গ. আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন
ঘ. ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি গঠন

৪. উক্ত ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই-

i. আইয়ুব সরকার আতঙ্কিত হয়ে পড়ে
ii. বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়
iii. বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের পথে ধাবিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. ii ও iii
গ. i ও iii
ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১.

বিষয়	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা	১১৯ জন	৯৫৪ জন
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তা	২৯০০ জন	৪২০০০ জন
গেজেটেড কর্মকর্তা	১৩৩৮ জন	৩৭০৮ জন
নন গেজেটেড কর্মকর্তা	২৬৩১০ জন	৮২৯৪৪ জন

ক. ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে কাকে COP এর পক্ষে প্রেসিডেন্ট প্রার্থী করা হয়?

খ. মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামো কীরূপ ছিল?

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত ছকে পাকিস্তানি আমলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কোন্ ধরনের বৈষম্য প্রদর্শন করা হয়েছে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর উক্ত বৈষম্যই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের একমাত্র কারণ? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

২. রফিক একটি চলচিত্র দেখছিল। ছবিতে একটি অঞ্চলের জনগণের সংগ্রামের ঘটনা দেখাচ্ছিল। ঐ অঞ্চলের জনগণের সাহস, বুদ্ধি ও সম্পদ থাকা সত্ত্বেও সরকারের একপেশে নীতির কারণে সংসদে তাদের কোন প্রতিনিধি নেই। তারা চাকরি, শিক্ষা ও অর্থনীতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত। তাদের বঞ্চনা ও শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসেন এক আপোষহীন নেতা। তিনি জণগণের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, পরিচালনার ক্ষমতা প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য দেশের সাথে সম্পর্ক, সর্বজনীন ভোটের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক আইন সভা গঠন, রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা– ইত্যাদি উক্ত অঞ্চলের হাতে দেওয়ার দাবি জানান।

ক. কার মধ্যস্থতায় তাসখন্দ শহরে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ-বিরতি সাক্ষরিত হয়?

খ. মতিউর হত্যার প্রেক্ষাপট কী ছিল?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার দাবিনামায় বঙ্গবন্ধুর কোন কর্মসূচির প্রতিফলন ঘটেছে- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কী মনে কর উক্ত দাবিনামা বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল? যুক্তি দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাকিস্তানের সামরিক শাসক যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের উপর একের পর এক নিপীড়নমূলক আচরণ করে তখনই এদেশের জনগণ তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। যার পরিণতি ছিল ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান। এ অভ্যুত্থানে ২৫এ মার্চ আইয়ুব খান পদত্যাগ করলে তাঁর উত্তরসূরী জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দেন। তিনি ঘোষণা করেন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। যার প্রেক্ষিতে ১৯৭০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করলেও পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি করে। একপর্যায়ে তারা ক্ষমতা ধরে রাখতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এবং শেষ পর্যায়ে এদেশের নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ শত্রুর দখলমুক্ত হয়।

এই অধ্যায় শেষে আমরা–

- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় অস্থায়ী সরকারের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারব;
- মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- স্বাধীনতা ও বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশ– বিষয়টি বিশ্লেষণ করতে পারব;
- জাতীয় পতাকা তৈরি এবং এর ব্যবহার কৌশল বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নির্ধারণের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হব;
- জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষায় সচেতন হব;
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণে আগ্রহী হব;
- বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের ঘটনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব;
- স্বাধীনতা দিবসে ছবি অঙ্কন করে প্রদর্শন করতে পারব।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন এবং পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ

ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ১৯৭০ সালের ছাব্বিশে মার্চ এক বেতার ভাষণে পরবর্তী নির্বাচন ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে সর্বপ্রকার বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে পুনরায় রাজনৈতিক তৎপরতার অনুমতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি ৫ই অক্টোবর জাতীয় পরিষদ ও ২২এ অক্টোবর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হলেও শেষ পর্যন্ত তা পিছিয়ে ৭ই ডিসেম্বর এবং ১৭ই ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। তবে ১২ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের কিছু অঞ্চলে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হওয়ায় ঐ সব অঞ্চলে ১৯৭১ সালের ১৭ই জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

আইনগত কাঠামো আদেশ

ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ২৮এ মার্চ জাতির উদ্দেশে এক ভাষণে নির্বাচন-সংক্রান্ত আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষণা করেন। সেখানে তিনি মূলত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যসংখ্যা কত হবে, ভোটদানের প্রক্রিয়া কী হবে, কত দিনের মধ্য নির্বাচিত পরিষদ সংবিধান রচনা করবে এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বিশেষ কিছু দিক তুলে ধরেন। তাঁর ঘোষণার বিশেষ দিকগুলো ছিল:

১. পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে সাবেক প্রদেশগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে। এগুলো ১লা জুলাই ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠিত হবে।

২. ১৩ জন মহিলা প্রতিনিধি নিয়ে ৩১৩ আসনের জাতীয় পরিষদ হবে, আর ৬২১ জন সদস্য নিয়ে হবে পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ।

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসন বণ্টন

অঞ্চল	জাতীয় পরিষদ			প্রাদেশিক পরিষদ		
	সাধারণ	মহিলা	মোট	সাধারণ	মহিলা	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯	৩০০	১০	৩১০
পশ্চিম পাকিস্তান	১৩৮	৬	১৪৪	৩০০	১১	৩১১

৩. নির্বাচনে এক ব্যক্তি এক ভোট নীতি গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের আইন ও অর্থনীতিবিষয়ক দায়িত্ব এবং ক্ষমতা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্ধারণ করবেন।

৪. ভোটার তালিকা ১৯৭০ সালের জুনের মধ্যে তৈরি হবে।

৫. সংবিধান রচনার জন্য পরিষদের প্রথম অধিবেশন থেকে ১২০ দিনের সময় ধার্য করে দেন। এ সময়ের মধ্যে কাজ সমাধা করতে ব্যর্থ হলে পরিষদ ভেঙ্গে নতুন নির্বাচনের কথা উল্লেখ করা হয়। একই সঙ্গে বলা হয়, সংবিধান রচনা এবং সংবিধানকে সত্যায়িতকরণ পর্যন্ত সামরিক শাসন বহাল থাকবে। নির্বাচনের নির্দেশনাবলির পাশাপাশি সংবিধানের ভিত্তি সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। আইনগত কাঠামো আদেশের ২০ নং ধারায় সংবিধানের মূল ছয়টি নীতি বেঁধে দেয়া হয়। যথা ঃ

ক. ফেডারেল পদ্ধতির সরকার;

খ. ইসলামি আদর্শ হবে রাষ্ট্রের ভিত্তি;

গ. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন;

ঘ. মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে;

ঙ. নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিভিন্ন এলাকার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বৈষম্য দূর করতে হবে;

চ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

ইয়াহিয়া খানের আইনগত কাঠামো আদেশে মূলত সার্বভৌম পার্লামেন্টের বদলে একটি দুর্বল পার্লামেন্টের রূপরেখা দেওয়া হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলো এর সমালোচনা করে। তারা এ আদেশের অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাদ দেওয়ার দাবি জানায়।

নির্বাচন ব্যবস্থাপনা

১৯৬৯ সালের ২রা জুলাই ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের বিচারক বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা হয়। এ নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক কাজ ছিল একটি সর্বজনীন ভোটার তালিকা প্রস্তুত করা। এ তালিকার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভোটারের সংখ্যা ছিল ৩,১২,১৪,৯৩৫ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ২,৫২,০৬,২৬৩ জন। এ ভোটার তালিকায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী অধিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল

১৯৭০ সালে নির্বাচনে সমমনা দলগুলো আওয়ামী লীগের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে নির্বাচন করতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেও দলীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একককভাবে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেন। ফলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো পৃথক পৃথকভাবে প্রার্থী মনোনীত করে। মোট ৭৮১ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নেন। জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের ছিল ১৬২ জন প্রার্থী এবং তাদের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ছিল নিখিল পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমিয়াতুল উলেমা ও নেজামে ইসলামি (৪৫), ইসলামি গণতন্ত্রী দল (৫), জামায়াত-ই-ইসলামি পাকিস্তান (৬৯), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (৮১), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কনভেনশন- ৯৩), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল- ৫০), পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাইয়ুম- ৬৫) প্রভৃতি।

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ আওয়ামী লীগ মোট ১৬৭টি আসন লাভ করে জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আবার পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ মোট ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। সে সময় জাতীয় পরিষদের সদস্যদের এমএনএ এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের এমপিএ বলা হতো। ভোটের ফলাফল মূল্যায়নে দেখা যায়, মোট প্রদত্ত ভোটের মধ্যে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ৭৫.১০% এবং প্রাদেশিক পরিষদে ৭০.৪৮% ভোট পায়। নির্বাচনের এমন ফলাফল পূর্ব পাকিস্তানকে একটি পৃথক অঞ্চল এবং বাঙালি জাতিকে একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে।

'৭০ এর নির্বাচনের সাফল্যে সহকর্মী পরিবেষ্টিত বঙ্গবন্ধু

জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় এ দলের নেতৃত্বে সরকার গঠন হওয়া ছিল ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু, পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি আরম্ভ করেন। তিনি ৩রা মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় ১লা মার্চ স্থগিত ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র, শ্রমিক, সরকারি- বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বিভিন্ন স্থানে জনতা পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণ করে। সংঘর্ষে বহুলোক নিহত ও আহত হয়। ঐদিন ছাত্রলীগের নেতারা 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। এ সংগঠনের উদ্যোগে ২রা মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। এদিনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এক ছাত্র সমাবেশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩রা মার্চ ছাত্রলীগ পল্টন ময়দানে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সেখানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সমাবেশে ছাত্রলীগ ৫ দফা প্রস্তাব গ্রহণ করে যা স্বাধীনতার ইশতেহার নামে চিহ্নিত করা হয়। এতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়। এছাড়া, ৪ঠা ও ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধবেলা হরতাল পালনের ঘোষণা দেয়া হয়।

ছাত্রদের এ ইশতেহারের প্রতি সমর্থন জানিয়ে শ্রমিক, কর্মকর্তা-কর্মচারী তথা আপামর জনসাধারণ সক্রিয়ভাবে হরতাল পালন করে। ঢাকা বেতার ও টেলিভিশন শিল্পীরা অনুষ্ঠান বর্জন করে। ছাত্র-শিক্ষক, আইনজীবীগণ তাদের কর্মস্থল ত্যাগ করে আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এ তিন দিনের হরতালে ঢাকাসহ সমগ্র দেশে আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। বিভিন্ন স্থানে পুলিশের গুলিতে বহু লোক আহত ও নিহত হয়। ইয়াহিয়া খান এ পরিস্থিতিতে ভীত- সন্ত্রস্ত হয়ে অগত্যা ৬ই মার্চ বেতার ভাষণে ২৫এ মার্চ পুনরায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন। তবে, তার ঘোষণা বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ

মানুষকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও সে ঘোষণায় আস্থা রাখতে পারেন নি। ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) সামরিক শাসনবিরোধী বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনসভার আয়োজন করা হয়।

নির্বাচনের গুরুত্ব

বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব অনেক। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পর এটিই ছিল সবচেয়ে অবাধ ও নিরপেক্ষ একমাত্র জাতীয় নির্বাচন। ১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রে যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আসছিল, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তার বিজয় অর্জিত হয়। এছাড়া পূর্বাঞ্চলের জনগণ স্বায়ত্তশাসনের যে দাবি করে আসছিল তা পশ্চিমাঞ্চলের সরকার অবৈধ বলে ঘোষণা করে। এ নির্বাচনের ফলাফলে ছয় দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির বৈধতা প্রমাণিত হয়। সর্বোপরি ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় আসলে তিনি তা না করে নিরীহ বাঙালির উপর সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দেন। শুরু হয় বাংলার মানুষের মুক্তির সশস্ত্র সংগ্রাম, যার পরিণতিতে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র জন্ম নেয়।

বিতর্ক অনুষ্ঠান : স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

১৯৭০ সালের নির্বাচনে সামরিক সরকার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায়, পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। সারা দেশে নানারকম উদ্বেগ, উত্তেজনার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ ছিল জাতির জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানের সমাবেশে লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল নামে। বঙ্গবন্ধু এ সমাবেশে যে ভাষণ দেন তা বিশ্বের ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে। ২৫এ মার্চ আহূত জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদানের জন্য বঙ্গবন্ধু চারটি দাবি তাঁর ভাষণে উপস্থাপন করেন। এগুলো

১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার;
২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নেওয়া ;
৩. গণহত্যার তদন্ত করা এবং;
৪. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ

এর বাইরে আরও বেশ কিছু দাবি বঙ্গবন্ধুর ভাষণে উত্থাপন করা হয়। তিনি বাংলাদেশের সকল অফিস-আদালত ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এ সমাবেশে সামরিক সরকারের কড়া নজর ছিল। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হবে। তাই কৌশলগত কারণে প্রত্যক্ষভাবে ঘোষণা না দিয়ে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়। ঘোষণায় তিনি বলেন, 'আমার অনুরোধ, প্রত্যেক মহল্লায়, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' তিনি মুক্তি সংগ্রামের জন্য সকলকে প্রস্তুত হওয়ার আদেশও দেন এবং দেশকে শত্রুমুক্ত করতে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের আহ্বান জানান। তাঁর এ ভাষণ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে 'বজ্রকণ্ঠ' নামে প্রচারিত হয়, যা বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পরদিন থেকে সারা দেশে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। তাঁর নির্দেশ অনুসারে দেশের স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত, কল-কারখানা সব বন্ধ হয়ে যায়। বিক্ষুব্ধ জনতা পাকিস্তানবাহিনীর সদস্যদের বিভিন্ন স্থানে প্রতিরোধ করতে থাকে। খাজনা-ট্যাক্স আদায় বন্ধ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। ১০ই মার্চ সরকার এক সামরিক আদেশ জারি করে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মস্থলে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু এর পরও পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত রাখে। ১৩ই মার্চ সরকার পুনরায় সামরিক আইন জারি করে। ১৪ই মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো একটি অবাস্তব প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার ফর্মুলা দেন। তবে বঙ্গবন্ধু এসব কথায় গুরুত্ব না দিয়ে ঐ দিনই ৩৫ দফাভিত্তিক দাবিনামা জারি করেন। সেখানে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য জনসাধারণকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দেয়া হয়।

বঙ্গবন্ধুর আদেশ জারির পর থেকে শুধু সেনাবাহিনী ছাড়া সর্বত্র আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অবস্থার গভীরতা উপলব্ধি করে ইয়াহিয়া খান ১৫ই মার্চ ঢাকা সফরে আসেন। এখানে তিনি বঙ্গবন্ধুর সাথে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু আলোচনার জন্য রাজি হলেও অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেননি। ১৬ই মার্চ থেকে ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনা শুরু হয়। এরপর ২২এ মার্চ হঠাৎ জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকা আসেন এবং আলোচনায় অংশ নেন। এরমধ্যে ১৯এ মার্চ পাকিস্তানি সৈন্যরা জয়দেবপুরে নিরীহ মানুষের ওপর হামলা চালালে এর প্রভাব মুজিব-ইয়াহিয়া আলোচনাকে প্রভাবিত করে। মূলত এসময় আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। ২৩এ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে এদেশের ঘরে ঘরে পাকিস্তানের পতাকার বদলে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়। ২৪এ মার্চ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সংকট সমাধানের শেষ চেষ্টা করেন। কিন্তু আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ২৫এ মার্চ ইয়াহিয়া খান গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। তার আগে তিনি সামরিক বাহিনীকে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দিয়ে যান। ফলে ২৫এ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির ওপর নেমে আসে চরম আঘাত। সেদিন রাতে পাকিস্তানি সেনারা বহু বাঙালিকে নির্বিচারে হত্যা করে।

২৫ মার্চের গণহত্যা

১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ মধ্যরাতে বাঙালির তথা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি কলঙ্কজনক অধ্যায়ের সূচনা হয়, যা কালরাত্রি নামে পরিচিত। সে সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র, নিরীহ, স্বাধীনতাকামী সাধারণ জনগণের উপর হামলা করে এবং নির্বাচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তান তাদের এ অভিযানের নাম দেয় 'অপারেশন সার্চ লাইট'। ২৫এ মার্চে এ হামলা হলেও মূলত মার্চের প্রথম থেকেই এর পরিকল্পনা করা হয়। একদিকে ১৬ই মার্চ থেকে বঙ্গবন্ধুর সাথে সমঝোতা বৈঠক শুরু হয়, আর অন্যদিকে ইয়াহিয়া গোপনে আলোচনার নামে কালক্ষেপণ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য, গোলাবারুদ এনে পূর্ব বাংলায় সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ১৭ই মার্চ টিক্কা খান, রাও ফরমান আলী 'অপারেশন সার্চলাইট' বা বাঙালির ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড পরিচালনার নীলনকশা তৈরি করে। ১৯এ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ শুরু হয়। এ কারণে

১৯৭১ সালের ২৫ এ মার্চের গণহত্যা

জয়দেবপুরে সংঘর্ষ বাধে। ২০এ মার্চ সরকার অস্ত্র জমা দেয়ার নির্দেশ জারি করে। ঐ দিন জেনারেল ইয়াহিয়া খান তার সামরিক উপদেষ্টা হামিদ খান, জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল পিরজাদা, জেনারেল ওমর প্রমুখকে নিয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক প্রস্তুতিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেন। এ সময় প্রতিদিন ৬টি থেকে ১৭টি পর্যন্ত পি.আই.এ ফ্লাইট বোয়িং ৭০৭ বিমান সৈন্য ও রসদ নিয়ে ঢাকা আসে এবং অসংখ্য সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হয়ে আসা জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে অপেক্ষা করে। ২৪এ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরে এম.ভি সোয়াত থেকে অস্ত্র ও রসদ খালাস শুরু হয়। সব প্রস্তুতি শেষে ২৫এ মার্চ গণহত্যার জন্য বেছে নেয়া হয়। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ঢাকা শহরের মূল দায়িত্ব দেয়া হয়।

সে দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে আক্রমণ শুরু হয় গভীর রাতে। জহুরুল হক হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলে চালায় হত্যা ও পাশবিক নির্যাতন। একইভাবে গণহত্যা চলেছিল পুরনো ঢাকায়, কচুক্ষেত, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, মিরপুর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে, রায়ের বাজার, গণকটুলি, ধানমণ্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান প্রভৃতি স্থানে। দেশের অন্যান্য জায়গায়ও পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার ঘোষণা

গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এজন্যই ছাব্বিশে মার্চ আমাদের মহান স্বাধীনতা দিবস। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাবাণী শোনামাত্রই চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। শুরু হয় পাকিস্তানি সেনাদের সঙ্গে বাঙালি পুলিশ, আনসার ও সাধারণ মানুষের এক অসম লড়াই যা বাংলাদেশের ইতিহাসে মহান মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে, যাতে বিশ্ববাসী ঘোষণাটি বুঝতে পারেন। স্বাধীনতা ঘোষণার বাংলা অনুবাদঃ

> "ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছ, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।"
>
> (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, অক্টোবর ২০১১ পৃঃ ১৫৩)।

স্বাধীনতার এ ঘোষণা বাংলাদেশের সকল স্থানে তদানীন্তন ইপিআর এর ট্রান্সমিটার, টেলিগ্রাম ও টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে প্রচার করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ছাব্বিশে মার্চ দুপুরে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এম. এ. হান্নান চট্টগ্রামের বেতার কেন্দ্র থেকে একবার এবং সন্ধ্যায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে দ্বিতীয়বার প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা এবং এর প্রতি বাঙালি সামরিক, আধাসামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর সমর্থন ও অংশগ্রহণের খবরে স্বাধীনতাকামী জনগণ উজ্জীবিত হয়। ২৭এ মার্চ উক্ত বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান পুনরায় বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

দলীয় কাজ ঃ

১। স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়বস্তু তৈরি করো।

২। বাঙালিরা কেন স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করে, তার কারণ অনুসন্ধান করে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠন

১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা শুরু হলে প্রাথমিকভাবে পূর্ব প্রস্তুতি ও সাংগঠনিক তৎপরতা ছাড়াই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ১০ই এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার। এ সরকার শপথ গ্রহণ করে ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলায়। শপথ অনুষ্ঠানে বিপুলসংখ্যক দেশি-বিদেশি সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সরকারের

প্রধান ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর নাম অনুসারে বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করা হয় মুজিবনগর এবং অস্থায়ী সরকারও পরিচিত হয় মুজিবনগর সরকার নামে। এ সরকার গঠনের মাত্র দুই ঘণ্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে বোমাবর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয়। তখন মুজিবনগর সরকারের সদর দপ্তর কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে স্থানান্তরিত হয়।

চিত্র : বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)

বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার)

রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
উপ-রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকারবলে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ)
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমদ
অর্থমন্ত্রী	এম. মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, কৃষি মন্ত্রী	এ.এইচ.এম কামরুজ্জামান
পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমদ
প্রধান সেনাপতি	কর্ণেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানী
চিফ অব স্টাফ	লে. কর্ণেল (অব.) আবদুর রব
ডেপুটি চিফ অব স্টাফ	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে খন্দকার

বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এসব বিভাগের মাধ্যমেই যুদ্ধকালে সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় প্রশাসন পরিচালিত হয়।

মুজিবনগর সরকারের অধীনে প্রশাসন ও যুদ্ধ :

১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে বিজয়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য দ্বারা মুজিবনগর সরকার গঠন করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা এবং বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি করা ছিল এ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাঙালি কর্মকর্তাদের নিয়ে সরকার প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করেন। এতে মোট ১২টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ছিল। এগুলো হচ্ছে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, অর্থ-শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়, সাধারণ প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিভাগ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ, প্রকৌশল বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, যুব ও অভ্যর্থনা শিবিরের নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ইত্যাদি। মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরে (কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, স্টকহোম) বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন করে। এসব মিশন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করে। সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত নিয়োগ দেয়। তিনি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে

জনমতসৃষ্টি ও বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সমর্থন আদায়ের জন্য কাজ করেন। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য সামরিক, বেসামরিক জনগণকে নিয়ে একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১০ই এপ্রিল সরকার ৪টি সামরিক জোনে বাংলাদেশকে ভাগ করে ৪ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে। ১১ই এপ্রিল তা পুনর্গঠিত করে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। এ ছাড়া বেশ কিছু সাব-সেক্টর এবং তিনটি ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়। এসব সেক্টরে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত বাঙালি সেনা কর্মকর্তা, সেনাসদস্য, পুলিশ, ইপিআর, নৌ ও বিমানবাহিনীর সদস্যগণ যোগদান করেন। প্রতিটি সেক্টরেই নিয়মিত সেনা, গেরিলা ও সাধারণ যোদ্ধা ছিল। এরা মুক্তিযোদ্ধা বা মুক্তিফৌজ নামে পরিচিত ছিল। এসব বাহিনীতে দেশের ছাত্র, যুবক, নারী, কৃষক, রাজনৈতিক দলের কর্মী -সমর্থক, শ্রমিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশ নিয়েছিল। বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ শেষে যোদ্ধাগণ দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সামরিক ছাউনি বা আস্তানায় হামলা চালায়। মুক্তিযুদ্ধে সরকারের অধীন বিভিন্ন বাহিনী ছাড়াও বেশ কয়েকটি বাহিনী দেশের অভ্যন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠেছিল। এ সব সংগঠন স্থানীয়ভাবে পাকিস্তানি বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। যেমনঃ টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনীর কথা স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দেশকে পাকিস্তানিদের দখলমুক্ত করার জন্য রণক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছেন, অনেকে আহত হয়েছেন, অনেকে দেশের জন্যে প্রাণ দিয়েছেন।

দলীয় কাজ ঃ মুজিবনগর অস্থায়ী সরকারের কার্যক্রম চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশ

ছাব্বিশে মার্চ থেকে ষোলই ডিসেম্বর বাংলাদেশ জুড়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী নির্যাতন, গণহত্যা আর ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল। 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামে ঢাকায় যে গণহত্যা শুরু করে, এর প্রধান লক্ষ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ এদেশের ছাত্রসমাজ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি যারা অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী আর সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়। কারণ, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বিশ্বাস করত, পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন-সংগ্রামের পেছনে হিন্দুদের হাত রয়েছে, আর এদের ইন্ধন যোগায় ভারত।

যদিও ২৫এ মার্চ 'জিরো আওয়ারে' পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু করার কথা, তথাপি রাত সাড়ে এগারটার দিকে সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে যায় পূর্ব নির্ধারিত গন্তব্যে। ঢাকাসহ সারা দেশে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ব্যাপক অভিযান শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হল এবং বহু শিক্ষকের আবাসিক ভবনে আক্রমণ করে এবং অনেককে হত্যা করে। রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানার ইপিআর হেড কোয়ার্টারসহ রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় ট্যাংক, কামান, মেশিনগান দিয়ে হামলা করে। শুরু হয় ইতিহাসের নিকৃষ্টতম গণহত্যার। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ জনতা ঢাকার রাজপথে ব্যারিকেড দেওয়ার চেষ্টা করে। অসীম সাহস নিয়ে ইপিআর ও পুলিশ বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনী অনায়াসে ভেঙে ফেলে এই প্রতিরোধ।

পুরনো ঢাকার নওয়াবপুর, তাঁতি বাজার, শাখারি বাজার এলাকায় বসবাসকারী হিন্দু জনগোষ্ঠীর ওপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্ষোভ যে বেশি ছিল তা এখানকার নিষ্ঠুর গণহত্যা, নির্যাতন আর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বোঝা যায়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে হিন্দুমাত্রই আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং হিন্দুরা হচ্ছে 'পবিত্র' পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকিস্বরূপ। আর এদের পেছনে রয়েছে ভারতের আনুকূল্য ও সমর্থন। এমনি অন্ধবিশ্বাস থেকে গণহত্যা আর নারী নির্যাতনের ভিতর দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর তীব্র হিন্দু বিদ্বেষ, আক্রোশ আর ভয়ংকর ঘৃণার প্রকাশ ঘটে। আকস্মিক আক্রমণে নিরীহ, অসহায় নগরবাসী আত্মরক্ষার কোনো সুযোগই পায়নি।

সরকারবিরোধী আন্দোলনের কারণে পাকিস্তানি বাহিনীর রোষানলে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অধ্যাপক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, ড. মুনীরুজ্জামানসহ শত শত ছাত্রকে হত্যা করা হয়। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা দুইদিন পর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে মারা যান। পুরনো ঢাকায় বিশেষ করে শাখারিবাজার, তাঁতি বাজারের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার অবস্থা ছিল ভয়াবহ। ঢাকাবাসী দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারেনি তাদের জন্য কী বর্বর, নৃশংস, পৈশাচিক আক্রমণ অপেক্ষা করছে। ঢাকা শহর পরিণত হয় মৃত্যুপুরীতে। চারদিকে কেবল আর্তনাদ, অসহায় মানুষের হাহাকার।

কেবল রাজধানী ঢাকা শহর নয়, বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ৩০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছিল। আড়াই লাখের অধিক মা-বোন পাকিস্তানিদের পাশবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। পরিকল্পিতভাবে এদেশকে মেধাশূন্য করার জন্য তারা বরেণ্য সাহিত্যিক, শিল্পী, কবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলীকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

নির্যাতন, হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুন্ঠন ইত্যাদি অপরাধ কর্মে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করেছে রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও কথিত শান্তি কমিটি। পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সহযোগী এদেশীয় ব্যক্তিবর্গ এককথায় স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি হিসেবে পরিচিত। প্রধানত, জামাতে ইসলামি, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামি, পূর্ব পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের সমর্থকরা মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করে। এই দলগুলো মানবতাবিরোধী অপরাধেও অংশগ্রহণ এবং সহযোগিতা করেছে।

স্বাধীনতাবিরোধীদের অপতৎপরতা

রাজাকার (রেজাকার) বাহিনী গড়ে তুলেছিল পাকিস্তান সরকার। ১৯৭১ সালের জুন মাসে লেঃ জেনারেল টিক্কা খান 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স' জারি করেন। শুরুতে আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়। পরে পাকিস্তানপন্থী অনেকে এই বাহিনীতে যোগ দেয়। এই বাহিনী গঠনে জেনারেল নিয়াজির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

রাজাকারদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল এক সপ্তাহ। রাজাকারদের ট্রেনিং দিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী। দখলদার বাহিনীর দোসর হিসেবে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। রাজাকার বাহিনী ছাড়াও আলবদর নামে আরও একটি ভয়ঙ্কর বাহিনী ছিল। জামায়াতে ইসলামির ছাত্র সংগঠন ইসলামি ছাত্রসঙ্ঘের সদস্যদের নিয়ে আল-বদর বাহিনী গড়ে তোলা হয়। অন্যান্য ইসলামি ছাত্রসংগঠনের নেতা-কর্মীদের নিয়ে আল-শামস বাহিনী গঠিত হয়। বাঙালি বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রধান দায়িত্ব ছিল আল-বদর বাহিনীর ওপর। তাই এই বাহিনী ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও হিংস্র প্রকৃতির। আল-বদর বাহিনীর প্রধান ছিল বর্তমান জামায়াত ইসলামির আমির মতিউর রহমান নিজামি। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় প্রথম যে সংগঠনের জন্ম হয় তা হলো 'শান্তি কমিটি'। রাজধানী ঢাকাসহ সারা দেশে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং জামায়াত ইসলামি, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামায়াত ওলামায়ে ইসলাম, মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের উৎসাহ ও অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে শান্তি কমিটি বিস্তার লাভ করে। অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যায় এই সংগঠন দখলদার বাহিনীর বিশ্বস্ত সহচর ছিল। কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি খাজা খয়েরুদ্দিনকে আহ্বায়ক করে 'ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটিতে জামায়াতে ইসলামির নেতা গোলাম আযম, মৌলভি ফরিদ আহম্মদ, এএসএম সোলায়মানসহ অনেকে ছিল।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনী 'পোড়া মাটি নীতি' অনুযায়ী বাংলাদেশের সব সম্পদ-প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে। যে কারণে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকান-পাট, ঘর-বাড়ি, হাসপাতাল, মসজিদ, মন্দির কোনো কিছুই তাদের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তাদের লক্ষ্য ছিল এই ভূখণ্ডের মানুষদের হত্যা করে কেবল ভূমির দখল নেওয়া। পাক বাহিনীকে এ সমস্ত মানবতাবিরোধী অপকর্মে সহায়তা করেছে এদেশীয় কিছু দালাল চক্র।

একক কাজ ঃ পাকিস্তানি বাহিনীর দোসর ছিল কারা? তারা পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে সংগঠিত হয়ে গণহত্যা ও নির্যাতনে কী ভূমিকা রেখেছিল এর ওপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রস্তুত কর।

মুক্তিযুদ্ধ ও বিভিন্ন সংগঠন

দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রামের ফসল মহান মুক্তিযুদ্ধ। স্বাভাবিক কারণেই মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে নানা মতভেদ লক্ষ করা যায়। বাম রাজনৈতিক দলগুলোর বড় অংশ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকলেও একটি অংশ বিরুদ্ধে ছিল। অন্যদিকে, পাকিস্তানি আদর্শে বিশ্বাসী ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলো কেবল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে তাই নয়, তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে অত্যাচার, নির্যাতন ও গণহত্যায় সহযোগিতা করেছে এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতায় প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছে। মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দল হলো আওয়ামী লীগ। বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করে গঠিত প্রথম বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট যোগ্যতা,

দক্ষতা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে। ১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সমমনা বাম রাজনৈতিক দলসমূহ নিয়ে আওয়ামী লীগ একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করে। এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী (ন্যাপ-ভাসানী), মণি সিং (বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি), মনোরঞ্জন ধর (বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস), অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ (ন্যাপ-মুজাফফর) এবং আওয়ামী লীগ থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ। তবে পিকিং পন্থী হিসেবে পরিচিত মোহাম্মদ তোয়াহার নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি এবং পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মতিন-আলাউদ্দিন) মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে।

মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক

পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা এদেশের জনগণকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ করেছে। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, নারী, শিক্ষক, কবি, সাংবাদিক, চিকিৎসক, শিল্পীসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ মুক্তির সংগ্রামে শামিল হয়।

ছাত্র-ছাত্রী

মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল ছাত্র। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়ে তোলায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ছাত্ররা। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাশাপাশি স্কুলপড়ুয়া কিশোরও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে। তারা যুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে যায়। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী বাংলাদেশ সরকার ছাত্র-যুবকদের জন্য প্রশিক্ষণ ও অস্ত্রের সংস্থান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাত্র তিন সপ্তাহের প্রশিক্ষণ আর হালকা অস্ত্র নিয়ে অসীম সাহস, মনোবল আর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে মুক্তিসেনার দল।

স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্র-ছাত্রীরা

কৃষক

মুক্তিযুদ্ধে কৃষকদের অবদান ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। স্বাধীনতা লাভের জন্য যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন তারা। শত্রুর বিরুদ্ধে পরিচালিত প্রতিটি আক্রমণে তারা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ। ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির হিসাব তাঁদের কাছে গুরুত্ব পায়নি। একটাই লক্ষ্য–যেকোনো মূল্যে স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

নারী

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই দেশের প্রতিটি অঞ্চলে যে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, তাতে নারীদের বিশেষ করে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। দেশকে স্বাধীন করতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরও গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। নারীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে মিছিল, মিটিং ও গণসমাবেশ করে পাকিস্তানবাহিনীর অত্যাচার আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন।

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীরা

যুদ্ধের নয় মাসে কয়েক লক্ষ মা-বোন পাক বাহিনীর অত্যাচারের শিকার হয়। তাঁদেরকে বঙ্গবন্ধু কন্যার ন্যায় মমতায় সম্বোধন করেছেন 'বীরাঙ্গনা' বলে। এর বাইরে বিশালসংখ্যক নারী মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে, সেবা দিয়ে, নানাভাবে সহায়তা করেছেন। এমনকি প্রত্যক্ষ যুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণের দৃষ্টান্তও কম নয়। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ দুইজন নারী 'বীর প্রতীক' খেতাব অর্জন করেন। একজন তারামন বিবি, অন্যজন ডাক্তার সিতারা বেগম। সারা দেশে আরও অনেক নারী মুক্তিযোদ্ধা বিভিন্ন রণাঙ্গনে পাকিস্তান বাহিনীর মোকাবেলা করেছেন।

গণমাধ্যম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম। সংবাদপত্র ও স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ছাব্বিশে মার্চ চট্টগ্রাম বেতারের শিল্পী ও সংস্কৃতিকর্মীরা স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র চালু করেন। পরে এটি মুজিবনগর সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। স্বাধীনবাংলা বেতার কেন্দ্র সংবাদ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বগাথা রণাঙ্গনের নানা ঘটনা ইত্যাদি দেশ ও জাতির সামনে তুলে ধরে সাধারণ মানুষকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত করে; মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস যুগিয়ে বিজয়ের পথ সুগম করে। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের প্রচার সেলের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে।

প্রবাসী বাঙালি

প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। বিভিন্ন দেশে তারা মুক্তিযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ে পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট ছুটে গিয়েছেন, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেছেন, পাকিস্তানকে অস্ত্র গোলাবারুদ সরবরাহ না করতে আবেদন করেছেন। এক্ষেত্রে, ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনে তারা কাজ করেছেন।

শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী

মুক্তিযুদ্ধের মূল নিয়ামক শক্তি ছিল জনগণ। তথাপি, যুদ্ধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে শিল্পী-সাহিত্যিক- বুদ্ধিজীবী, বিভিন্ন সংস্কৃতি কর্মীর অবদান ছিল প্রশংসনীয়। এমনকি নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও নানাভাবে

মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছেন। পত্রপত্রিকায় লেখা, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে খবর পাঠ, দেশাত্মবোধক গান, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান, কবিতা পাঠ, নাটিকা, কথিকা, এম আর আকতার মুকুলের অত্যন্ত জনপ্রিয় 'চরমপত্র' এবং 'জল্লাদের দরবার' ইত্যাদি অনুষ্ঠান মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। এসব অনুষ্ঠান রণক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের মানসিক ও নৈতিক বল ধরে রাখতে সহায়তা করেছে, সাহস জুগিয়েছে, জনগণকে শত্রুর বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় করেছে। সুরকার আলতাফ মাহমুদ, সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন, সেলিনা পারভীন, চিকিৎসক ডা. ফজলে রাব্বি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক গিয়াস উদ্দিন আহমদসহ অগণিত গুণীজনকে হত্যা করেছে পাকিস্তানি বাহিনী। তাঁদের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে এদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে, হয়েছে স্বাধীন।

জনসাধারণ

সাধারণ জনগণের সাহায্য সহযোগিতা ও স্বাধীনতার প্রতি ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার ফলেই মাত্র নয় মাসের যুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক দোসর ব্যতীত সবাই কোনো না কোনোভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছে, শত্রুর অবস্থান ও চলাচলের তথ্য দিয়েছে, খাবার ও ওষুধ সরবরাহ করেছে, সেবা দিয়েছে ও খবরাখবর সরবরাহ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ জনগণের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জনগণও অংশগ্রহণ করেন। অনেকে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংখ্যা ছিল অধিক। এদের রক্তের বিনিময়ে আমাদের এই স্বাধীন মানচিত্র, লাল সবুজ পতাকা।

স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অবদান অপরিসীম। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবর্গ বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। নানা অত্যাচার নিপীড়ন সহ্য করেছেন। রাজনীতিবিদগণ স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত জীবনবাজি রেখে রাজনৈতিক তৎপরতা চালিয়ে গেছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল নেতৃত্বে ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর সারা জীবনের কর্মকাণ্ড, আন্দোলন সংগ্রাম নিবেদিত হয়েছে বাঙালির জাতীয় মুক্তির লক্ষ্যে। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি ১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। '৪৮ ও '৫২ র ভাষা আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ছিলেন ভাষা আন্দোলনের প্রথম কারাবন্দিদের মধ্যে অন্যতম। কী সংসদ, কী রাজপথ, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে তাঁর কণ্ঠ ছিল সর্বদা সোচ্চার। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতিদান, ১৯৫৮ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, ১৯৬৬ সালে 'আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা' কর্মসূচি পেশ ও ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন, '৬৯ এর গণ অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা ও স্বাধীনতা অর্জনে একচ্ছত্র ভূমিকা পালন করেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের মধ্যে ১২ বছর তিনি কারাগারে কাটিয়েছেন। ২৫শে মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সশস্ত্র আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়লে ছাব্বিশে মার্চ ১৯৭১ সালে প্রথম প্রহরে (২৫শে মার্চ রাত ১২টার পর) তিনি সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সংগ্রামের পথ ধরে ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি

মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছেন। তাঁর নামেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ও মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি। তাঁর বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন স্বাধীনতার মহানায়ক ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি।

তাজউদ্দিন আহমদ

মুক্তিযুদ্ধের সময় তাজউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। তিনি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ সহচর। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত মুজিবনগর সরকারের (১০ই এপ্রিল, ১৯৭১ সাল) প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন এই মহান নেতা। ১৯৭১ সালের ১১ই এপ্রিল তিনি বেতার ভাষণে মুজিবনগর সরকার গঠনের কথা প্রচার করেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় তিনি সফলভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত উপদেষ্টা কমিটির তিনি আহ্বায়ক ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত।

তাজউদ্দিন আহমদ

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন আওয়ামী লীগের অন্যতম শীর্ষ নেতা। তিনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন মুজিবনগর সরকারের উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে বেগবান ও সফল করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের একজন অন্যতম সংগঠক ও পরিচালক।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ নেতা এবং বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন খাদ্য, বস্ত্র, অস্ত্র প্রশিক্ষণের অর্থের সংস্থান প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল। তিনি সফলভাবে এ দায়িত্ব পালন করেন।

ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী

এ.এইচ. এম. কামরুজ্জামান

এ.এইচ. এম. কামরুজ্জামান

এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান আওয়ামী লীগের আর একজন শীর্ষ নেতা। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি সরকারের স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী ছিলেন। সে সময়ে তিনি ভারতে আশ্রয় নেয়া লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর জন্য ত্রাণ সংগ্রহ, ত্রাণশিবিরে ত্রাণ বিতরণ এবং পরবর্তী সময়ে শরণার্থীদের পুনর্বাসন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে পালন করেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা অর্জনে তাঁর অবদান অপরিসীম।

অন্যান্য নেতৃবৃন্দ

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্বাধীনতা অর্জনে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তিনি ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (১৯৬৮-৬৯খ্রিষ্টাব্দ) থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির ব্যাপারে গড়ে ওঠা আন্দোলন ও '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে অবস্থান করে বিভিন্ন দেশের প্রতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থন আদায় ও পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। এছাড়া অধ্যাপক মোজাফফার আহমেদ (ন্যাপ-মোজাফফার) ও কমিউনিস্ট পার্টির কমরেড মনি সিংহ মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য গঠিত 'উপদেষ্টা কমিটিতে' এ তিন নেতা সদস্য ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধে বিশ্বজনমত ও বিভিন্ন দেশের ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নারকীয় তাণ্ডব বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয়। পাকিস্তানি বাহিনী ও স্বাধীনতাবিরোধী এদেশীয় দোসরদের দ্বারা সংঘটিত লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে বিশ্ব বিবেক জাগ্রত হয়। বিভিন্ন দেশ নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে। ২৫এ মার্চের কালরাত এবং পরবর্তী সময়ের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে বিশ্বজনমত সোচ্চার হয়ে ওঠে। গোটা বিশ্বের জনগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সমর্থন জানায়।

ভারতের ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি সমর্থন জানায় প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত। ১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চের কালরাতের বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও পরবর্তী নয় মাস ধরে পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী যে নারকীয় গণহত্যা, লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ভারত তা বিশ্ববাসীর নিকট সার্থকভাবে তুলে ধরে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তিনিই প্রথম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আন্তর্জাতিক পরিসরে পরিচিতি করে তোলেন তাঁর নিরলস কর্ম তৎপরতার ভেতর দিয়ে।

ভারতের জনগণ ও সরকার প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতে বিমান হামলা চালায়। পাকিস্তানের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এবং ভারত সরকার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে 'যৌথ কমান্ড' গঠন করে। ভারত ৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি প্রদান করে। ভারতের বহু সৈন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ হারায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা ঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের পর সর্বাধিক অবদান রাখে অধুনা বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমান রাশিয়া)। পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশে গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ,

নারী-নির্যাতন বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রপ্রধান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। তিনি ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশের জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্যও বলেন। সোভিয়েত পত্রপত্রিকা, প্রচারমাধ্যমগুলো বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর নির্যাতনের কাহিনি ও মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি প্রচার করে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়তা করে। জাতিসংঘে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধবন্ধের প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন 'ভেটো' (বিরোধিতা করা) প্রদান করে বাতিল করে দেয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে কিউবা, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পূর্ব-জার্মানিসহ তৎকালীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন জানায়।

গ্রেট ব্রিটেনের ভূমিকা ঃ ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে ব্রিটেনের প্রচার মাধ্যম বিশেষ করে বিবিসি এবং লন্ডন থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বাঙালিদের উপর পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর নির্মম নির্যাতন, প্রতিরোধ, বাঙালিদের সংগ্রাম, ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের করুণ অবস্থা, পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা এবং মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি সম্পর্কে বিশ্ব জনমতকে জাগ্রত করে তোলে। ব্রিটিশ সরকারও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপারে খুবই সহানুভূতিশীল ছিল। উল্লেখ্য লন্ডন ছিল বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারের প্রধানকেন্দ্র। তাছাড়া লন্ডনে জন্মগ্রহণকারী বিখ্যাত সংগীতশিল্পী জর্জ হ্যারিসন মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বিশ্বজনমত সৃষ্টি ও দানসহায়তা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে ৪০,০০০ লোকের সমাগমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডভিত্তিক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ব্রিটেন ছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও কানাডার প্রচার মাধ্যমগুলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সাহায্য করে।। ইরাক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন জানায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ, প্রচারমাধ্যম, কংগ্রেসের অনেক সদস্য এ দেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সোচ্চার ছিল। তবে বিশ্বের কোনো কোনো দেশ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল।

জাতিসংঘের ভূমিকা ঃ বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা জাতিসংঘের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান যখন বাঙালি নিধনে তৎপর, তখন জাতিসংঘ বলতে গেলে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে নি।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঃ

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই ভারত আমাদের নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। বিশেষভাবে ১৯৭১ সালের ২১এ নভেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী মিলে 'যৌথ কমান্ড' গঠন ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পাকিস্তান ৩রা ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করলে যুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। ৬-১৬ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে ভারতের সেনা, নৌ, বিমানবাহিনীও পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয়।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ

যৌথ বাহিনীর সুপরিকল্পিত আক্রমণে আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের পূর্বেই হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর নৈতিক পরাজয় ঘটে। অবশেষে ১৯৭১ সালের ষোলই ডিসেম্বর বিকেল চারটা একুশ মিনিটে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) পাকিস্তানের ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লেঃ জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজি প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্যসহ বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার। ত্রিশ লক্ষ শহিদ, কয়েক লক্ষ মা-বোনের সীমাহীন কষ্ট, নিপীড়ন আর ত্যাগের বিনিময়ে এই মহান স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হয়েছে। বিশ্বের মানচিত্রে সগৌরবে স্থান করে নিয়েছে স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র– গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলাদেশ হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের মধ্যে প্রথম দেশ, যে দেশ সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী দ্বারা পূর্ব বাংলার জনগণ সর্বপ্রকার অত্যাচার, শোষণ, বৈষম্য, নিপীড়নের শিকার হয়েছে। কিন্তু, এ ভূখণ্ডের সংগ্রামী মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ১৯৭১ সালের ষোলই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রধান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার যে ডাক দেন এবং ছাব্বিশে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার যে ঘোষণা প্রদান করেন এবং ষোলই ডিসেম্বর তা বাস্তবে পূর্ণতা পায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে। ফলে মুক্তিযুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায় বাঙালির শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী চেতনার বহিঃপ্রকাশ। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী এ অঞ্চলের বাঙালি এবং এ ভূখণ্ডে বসবাসকারী অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর জনগণ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্নপূরণ হলো। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের নিপীড়িত, স্বাধীনতাকামী জনগণকে অনুপ্রাণিত করে।

বাংলাদেশ নামের ইতিহাস

আমরা জানি, আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। তবে, সংবিধান অনুযায়ী নাম হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। এই নামেরও একটা ইতিহাস আছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, দেশের নামের সঙ্গে ভূখণ্ডের সীমানার সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর নানা সময়ে এর সীমানার ও বদল হয়েছে।

প্রাচীনকালে আমাদের বাংলাদেশ নানা জনপদে বিভক্ত ছিল। তা এই গ্রন্থের শুরুর দিকে আলোচনা করা হয়েছে। মহাভারতে এবং গ্রিক ঐতিহাসিক টলেমির লেখায় 'বাংলা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তার অনেক পরে ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে শামসউদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্বপ্রথম বাংলার তিনটি প্রধান কেন্দ্র লখনৌতি বা লক্ষণাবর্তী (গৌড়), সাতগাঁও (রাঢ়) ও সোনারগাঁও (বঙ্গ)-কে একত্র করে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর স্বাধীনতা ২০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। ইলিয়াস শাহের উপাধি ছিল 'শাহ-ই-বাঙ্গালা', 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান', 'সুলতান-ই-বাঙ্গালা'। আর তখন থেকে সমগ্র বাংলা অঞ্চল 'বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিতি লাভ করে। রাজধানী হলো সোনারগাঁও। মুঘল আমলে সম্রাট আকবরের সময় থেকে বাংলার পরিচয় হয় 'সুবাহ বাংলা' নামে। তবে, ইউরোপীয়রা বিশেষভাবে পর্তুগিজরা 'বেঙ্গালা' নামে অভিহিত করেছে এই অঞ্চলকে এবং ইংরেজরা বলত 'বেঙ্গল'।

ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বাংলা নামে পৃথক প্রদেশ করা হয়। বাংলার অধীনে ছিল বিহার, উড়িষ্যা এবং ছোটনাগপুর। পরবর্তীতে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের আসাম নিয়ে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে নতুন প্রদেশ গঠন করা হয়। আন্দোলনের মুখে ৬ বছর পরে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করে ইংরেজ সরকার। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ শাসনের অবসান হলে পশ্চিম বঙ্গ ভারতে আর পূর্ব বঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান আমলেও আজকের বাংলাদেশ 'পূর্ব বঙ্গ' নামেই পরিচিত ছিল। পাকিস্তান সরকার পূর্ব বঙ্গ পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ করলে বঙ্গবন্ধু এর বিরোধিতা করেন। বঙ্গবন্ধু বলেন, বাংলা নামের দীর্ঘ ইতিহাস-ঐতিহ্য আছে। তাই বাংলার নাম পরিবর্তনের পূর্বে গণভোটের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের মতামত গ্রহণ করতে হবে। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ।

জাতীয় পতাকার ইতিহাস

বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা আমাদের অহংকার আর গৌরবের প্রতীক। অনেক রক্ত আর ত্যাগের বিনিময়ে লাল-সবুজের এই পতাকা এদেশের জনগণ অর্জন করেছে। জাতীয় পতাকার সবুজ আয়তক্ষেত্র বাংলাদেশের সবুজ প্রকৃতির প্রতীক, আর বৃত্তের লাল রং মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের রক্তের প্রতীক।

মুক্তিযুদ্ধের সময় জাতীয় পতাকা

কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্যবহৃত পতাকায় লাল বৃত্তে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কিত ছিল। মানচিত্র খচিত পতাকার মাধ্যমে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই ভূখণ্ডে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। মানচিত্র খচিত এই পতাকা আমাদের সংগঠিত, একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকা ডিজাইন করেছেন শিবনারায়ণ দাস। তিনি ছিলেন তৎকালীন কুমিল্লা ছাত্রলীগের সেক্রেটারি। সে সময়ের প্রভাবশালী ছাত্রনেতাদের নিয়ে গঠিত 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ' শিবনারায়ণ দাসকে পতাকা তৈরির দায়িত্ব দেয়। ১৯৭০ সালের ৬ই জুন গভীর রাতে অত্যন্ত গোপনভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জহুরুল হক হলের ১১৮ নম্বর কক্ষে পতাকা তৈরির কাজ সম্পন্ন করেন শিবনারায়ণ দাস।

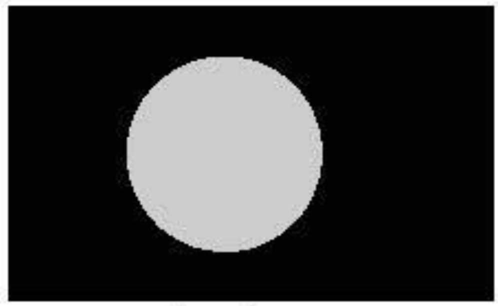

বর্তমান জাতীয় পতাকা

১৯৭১ সালের অগ্নিঝরা মার্চে যখন উত্তাল সারা দেশ, সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের পশ্চিম দিকের গেটে শিবনারায়ণ দাসের ডিজাইনকৃত বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা ২রা মার্চ, ১৯৭১ সালে প্রথমবারের মতো উত্তোলন করেন ছাত্রনেতা আ.স.ম. আব্দুর রব। এ যেন বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার পূর্বেই পাকিস্তান রাষ্ট্রকে প্রত্যাখ্যানের শামিল। বঙ্গবন্ধুর ডাকে ইতোমধ্যে সারা দেশে শুরু হয়েছে অসহযোগ আন্দোলন। ২৩এ মার্চ পাকিস্তানের প্রজাতন্ত্র দিবসে ঘটে গেল অভাবনীয় ঘটনা। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন শহরে পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানো হলো। বহু বাড়ি-ঘরে উড়ানো হলো বাংলাদেশের পতাকা। পাকিস্তানের প্রত্যাখ্যাত পতাকা আর ফিরে আসতে পারে নি। ত্রিশ লক্ষ শহিদ জীবন দিয়েছেন বাংলাদেশের পতাকার মর্যাদা রক্ষার জন্য। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালে পটুয়া কামরুল হাসানকে দায়িত্ব দেন জাতীয় পতাকার ডিজাইন চূড়ান্ত করার। পটুয়া কামরুল হাসানের হাতেই আমাদের জাতীয় পতাকা বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

জাতীয় পতাকা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। জাতীয় পতাকার সম্মানের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্মান-মর্যাদা অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে এই পতাকার সম্মান রক্ষা করা আমাদের পবিত্র কর্তব্য।

একক কাজ : 'জাতীয় পতাকা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক'-এর পেছনের যুক্তিগুলো চিহ্নিত কর।

জাতীয় সংগীতের ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'–সংগীতটি আমাদের জাতীয় সংগীত। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ সরকার বাংলাকে বিভক্ত করে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি নতুন প্রদেশ সৃষ্টি করে। এরই প্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ সংগীত রচনা করেন। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে স্বদেশি আন্দোলনের সময় এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) বিরোধী রাজনীতিবিদ, স্বদেশি কর্মী ও বিপ্লবীরা বাঙালি জনগণকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যম হিসেবে গানটি প্রচার করে। গানটি ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারি ঢাকায় এক বিশাল জনসভায় এবং পরে ৩রা মার্চ ছাত্রলীগ ও শ্রমিক লীগ আয়োজিত জনসভায় পুনরায় গাওয়া হয়। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের প্রাক্কালে গানটি গাওয়া হয়। মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার এই গানটিকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে গানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত পরিবেশিত হয়। স্বাধীনতার পর সাংবিধানিকভাবে (অনুচ্ছেদ ৪.১)

'আমার সোনার বাংলা' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতরূপে ঘোষিত হয়। গানের প্রথম ১০ লাইন কণ্ঠ সংগীত এবং প্রথম ৪ লাইন যন্ত্র সংগীত হিসেবে পরিবেশনের বিধান রাখা হয়।

বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত :

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে-
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো-
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো,
মরি হায়, হায় রে–
মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি॥

জাতীয় সংগীত পরিবেশনের আনুষ্ঠানিকতা

ক. স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও শহিদ দিবসের মতো বিশেষ দিনগুলোতে সম্পূর্ণ জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হবে।

খ. রাষ্ট্রপতি/প্রধানমন্ত্রী যেসব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন, সেসব অনুষ্ঠানে তাঁদের আগমনের ও প্রস্থানের সময় সম্পূর্ণ জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হবে।

গ. কোনো বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মানে গার্ড অব অনার প্রদানকালে রাষ্ট্রপতিকে অভিবাদন প্রদানের সময় পূর্ণ জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হবে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে প্রথমে অতিথি দেশের জাতীয় সংগীত এবং পরে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হবে। কিন্তু অতিথি সরকার প্রধান হলে কেবল প্রথম চার লাইন পরিবেশিত হবে।

ঘ. বাংলাদেশে বিদেশি দূতাবাসগুলোর সরকারি অনুষ্ঠানে কেবল প্রথম চার লাইন পরিবেশিত হবে। অনুষ্ঠানে প্রথমে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত এবং পরে সংশ্লিষ্ট দেশের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হবে।

ঙ. রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও কূটনৈতিক মিশন আয়োজিত অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান, বিশেষ অনুষ্ঠান ও জনসভায় অনুমোদিত বিধি অনুযায়ী জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হবে।

জাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ নাম না-জানা শহিদদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নির্মিত জাতীয় স্মৃতিসৌধ। এটি ঢাকা শহর থেকে ৩৫ কি:মি: উত্তর-পশ্চিমে সাভারে অবস্থিত। স্থপতি মঈনুল হোসেনের নকশা অনুযায়ী জাতীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। সাতটি জোড়া ত্রিভুজাকার দেয়ালের মাধ্যমে ছোট থেকে বড় হয়ে ধাপে ধাপে সৌধটি ১৫০ ফুট উচ্চতায় পৌঁছেছে। সমগ্র স্মৃতিসৌধ প্রাঙ্গণের সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন উপাদান

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

ব্যবহার করা হয়েছে। স্মৃতিস্তম্ভের মূল বেদীতে যেতে হলে বেশ দীর্ঘ উঁচু-নিচু পথ, পেভমেন্ট ও একটি কৃত্রিম লেকের উপর নির্মিত সেতু পার হতে হয়। এই সবকিছুই আসলে আমাদের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের প্রতীক। পাশেই রয়েছে গণকবর, যাঁদের অমূল্য জীবনের বিনিময়ে এদেশ শত্রুমুক্ত হয়েছে। মূল স্মৃতিসৌধে সাত জোড়া দেয়াল, মূলত বাঙালির গৌরবময় সংগ্রামের প্রতীক। এই রাজনৈতিক ঘটনাগুলো হলো ১৯৫২, ১৯৫৪, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৬, ১৯৬৯ এবং ১৯৭১। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই সাতটি গুরুত্বপূর্ণ সালের মধ্যেই আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস নিহিত। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত ঘটনার ফলেই পরাধীনতার শৃংখল ভেঙে বাঙালি স্বাধীনতা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আর জাতীয় স্মৃতিসৌধ বারবার আমাদের সেই মহান শহিদদের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ১৯৭২ সালের জাতীয় স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ শুরু হয়। ১৯৮২ সালে তিনটি পর্যায়ে তা সম্পন্ন হয়। বাঙালির অহংকার, গৌরব আর মর্যাদার প্রতীক এই স্মৃতিসৌধ।

অপরাজেয় বাংলা

বাঙালির প্রতিবাদী মনোভাব ও মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াকু চেতনার মূর্ত প্রতীক অপরাজেয় বাংলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে ৬ ফুট উঁচু বেদির ওপর নির্মিত। মূল ভাস্কর্যের উচ্চতা ১২ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট ও ব্যাস ৬ ফুট। বাংলাদেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রসমাজের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ– প্রতিটি সংগ্রামে ছাত্রদের গৌরবময় ত্যাগকে স্মরণীয় করার জন্য অপরাজেয় বাংলা নির্মাণ করা হয়। মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এটি নির্মাণ করেন। ১৯৭৩-১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এই ভাস্কার্যের নির্মাণকাজ চলে। এই ভাস্কর্যে অসমসাহসী তিনজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধার অবয়ব অপূর্ব দক্ষতায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুইজন তরুণ রাইফেল হাতে শত্রুর মোকাবেলায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আর ঔষধের ব্যাগ কাঁধে তরুণী মুক্তিযোদ্ধাদের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ। অপরাজেয় বাংলা বাংলাদেশের ছাত্রসমাজের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

অপরাজেয় বাংলা

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

মহান মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বকারী মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুরে এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। স্মৃতিসৌধে ২৪টি পৃথক ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল বৃত্তাকারে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বশেষ উচ্চতায় স্থির হয়েছে। ২৪টি ত্রিভুজাকৃতির দেয়াল হলো ২৪ বছরের পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতীক। ১৯৪৭ সাল থেকে এদেশের জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার আদায়ে ক্রমে সংগঠিত হয়েছে। একপর্যায়ে দৃঢ় মনোবল আর সংকল্প নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছে। কারণ এখানেই শপথ নিয়েছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। স্থপতি হলেন তানভীর করিম।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

বাঙালি জাতিকে মেধাশূন্য করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের সময় অগণিত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে মানবতাবিরোধী এই বর্বর কাজে সহায়তা করেছে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চূড়ান্ত পরাজয়ের দুইদিন পূর্বে ১৪ই ডিসেম্বর অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। তাঁদের স্মৃতি অমর করে রাখার জন্য ঢাকার মিরপুরে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়। এর স্থপতি ছিলেন মোস্তফা আলী কুদ্দুস। ১৯৭২ সালে এই স্মৃতিসৌধের নির্মাণকাজ শেষ হয়।

বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

শিখা চিরন্তন

মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী বীর শহিদদের অমর স্মৃতি চির জাগরূক রাখার জন্য ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ১৯৯৭ সালের ছাব্বিশে মার্চ শিখা চিরন্তন স্থাপিত হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে এই স্থান থেকেই 'মুক্তির সংগ্রাম ও স্বাধীনতা সংগ্রামের' ডাক দিয়েছিলেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ষোলই ডিসেম্বর পাকিস্তান দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল এই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে শিখা চিরন্তন স্থাপন করা হয়।

শিখা চিরন্তন

রায়েরবাজার বধ্যভূমি

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে অগণিত বধ্যভূমি ও গণকবর। তখন রায়েরবাজার এলাকাটি ছিল বেশ নিরিবিলি। জনবসতি খুব একটা চোখে পড়ত না। কালুশাহ পুকুরপাড় থেকে গোল মসজিদ পর্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় তিন কিলোমিটার। মার্চ মাস থেকেই রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। এখানে মানুষকে শুধু হত্যা করা হয়েছে তা নয়, অগণিত লাশ এনে ফেলা হয়েছে এই বধ্যভূমিতে। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস এখানকার ইটখোলার রাস্তা দিয়ে লোকজন হাঁটাচলার সাহস করত না।

রায়েরবাজার বধ্যভূমি

১৯৭১ সালের ১৮ই ডিসেম্বর রায়েরবাজার বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া যায়। সেদিন এই বধ্যভূমির বিভিন্ন গর্ত থেকে প্রচুর গলিত ও বিকৃত লাশ উদ্ধার করা হয়। এখানে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এদের মধ্যে অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিকিৎসকের লাশই অধিক ছিল। বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডে আলবদর ও রাজাকাররা প্রধান ভূমিকা পালন করে। রায়েরবাজারে উদ্ধারকৃত লাশগুলো এতটাই বিকৃত হয়ে পড়ে যে পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। তবে যে কয়েকজনের পরিচয় জানা সম্ভব হয়েছে, তাঁরা হলেন- অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, সাংবাদিক সেলিনা পারভীন, ডাঃ ফজলে রাব্বি, চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ আলীম চৌধুরী প্রমুখ।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কতটি আসন পেয়েছিল?

ক. ১৬৭ খ. ১৯৮

গ. ২৬৭ ঘ. ২৯৮

২. 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়েছিল-

i. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করায়

ii. জাতীয় পরিষদের আহূত অধিবেশন স্থগিত করায়

iii. বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের ভর্তি ফি বৃদ্ধি করায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে জনগণের যৌক্তিক মুক্তিসংগ্রামে 'খ' রাষ্ট্র 'ক' রাষ্ট্রের অত্যাচারিত ও আশ্রয়হীন মানুষকে আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসা দিয়ে সাহায্য করে এবং তাদের দুঃখ দুর্দশার কথাও বিশ্বের কাছে তুলে ধরে।

৩. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কোন রাষ্ট্রের ভূমিকা উদ্দীপকের 'খ' রাষ্ট্রের ভূমিকার মতো ছিল?

ক. চীন খ. ভারত

গ. নেপাল ঘ. মায়ানমার

৪. উক্ত রাষ্ট্রের গৃহীত কর্মকাণ্ডের ফলে-

i. স্বাধীনতা লাভ ত্বরান্বিত হয়

ii. মানবাধিকার রক্ষিত হয়

iii. বহি:র্বিশ্বে বাংলাদেশের নির্যাতনের চিত্র প্রকাশিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. গণতন্ত্রের পথিকৃৎ আব্রাহাম লিঙ্কন একটি স্মরণীয় নাম। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত বুদ্ধি, বাগ্মিতা তাঁকে বিশ্বের আদর্শ চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। এভাবে, একজন মেহনতী মানুষ নিজের প্রতিভায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদলাভে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি স্বার্থান্ধ মানুষের পাশবিকতার হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দিয়েছিলেন। পৃথিবীর গণতন্ত্র ও মুক্তিকামী মানুষের জন্য তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'Government of the people, by the people, for the people' আজও এ উক্তি তাঁকে অমর করে রেখেছে।

ক. মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রীর নাম কী ছিল?

খ. 'অপারেশন সার্চ লাইট' বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত আব্রাহাম লিঙ্কনের চরিত্র ও কর্মকাণ্ডে তোমার পঠিত বিষয়বস্তুতে কার প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'গ'-এর উত্তরের উক্ত নেতার বলিষ্ঠ ও আপোষহীন নেতৃত্বে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি– মূল্যায়ন কর।

চতুর্দশ অধ্যায়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল (১৯৭২-১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দ)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১-সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ১৯৭১-এর ছাব্বিশে মার্চ প্রথম প্রহরেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ঢাকা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন। পাকিস্তান সরকার তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে সামরিক আদালতে বিচারকাজ শুরু করে। প্রহসনের বিচারে তাঁর বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় দেয়া হয়। ১৯৭১ সালের ষোলই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পরেও বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কি-না তাও দেশের মানুষ জানত না। বঙ্গবন্ধুর জন্য উদ্বেগ, উৎকণ্ঠায় নিমজ্জিত ছিল সারা দেশের মানুষ। অধীর অপেক্ষা, কবে আসবেন মহান নেতা, অবশেষে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে এলেন। এই অধ্যায়ে বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা -

- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারব;
- সংবিধান প্রণয়নের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বঙ্গবন্ধুর শাসনকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বর্ণনা করতে পারব;
- জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব;
- দেশের সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব।

বঙ্গবন্ধুর দেশে ফেরা (স্বদেশ প্রত্যাবর্তন)

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফেরার আগে বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানি বাহিনীর বিশেষ বিমানে লন্ডন নিয়ে যাওয়া হয়। অতঃপর ব্রিটিশ রাজকীয় কমেট বিমানে দিল্লি হয়ে তিনি ঢাকায় আসেন। ঢাকায় মহান নেতাকে জানানো হয় অভূতপূর্ব অভিনন্দন। ভালোবাসায় সিক্ত হলেন বঙ্গবন্ধু। নিজে কাঁদলেন, জনতাকেও কাঁদালেন। অবিসংবাদিত নেতার প্রতি জনগণের আবেগময় অভিনন্দন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। পুরাতন বিমানবন্দর থেকে রমনা রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ জনতা উপস্থিত হয় প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য।

রেসকোর্স (সোহরাওয়ার্দি উদ্যান) ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষণীয় ও নীতিনির্ধারণী বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, নবীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট বক্তব্য দেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা।'

১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা

মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশের সরকারব্যবস্থার ধরন কী হবে, এই সম্পর্কে তখনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিনই ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভায় দীর্ঘ আলোচনার পর 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারির মাধ্যমে দেশে

সংসদীয় পদ্ধতির সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১২ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের নিকট প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। একই দিনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

এই ব্যবস্থা সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর গভীর আস্থার পরিচয় বহন করে। ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকার পরিচালিত হয়। এই সরকার মাত্র তিন বছর সাত মাস তিন দিন দায়িত্ব পালনের সুযোগ পায়। এই স্বল্পতম সময়ে তিনি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ থেকে দেশকে গড়ে তোলা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে বহির্বিশ্বে সম্মানজনক ভাবমূর্তি নির্মাণে অনন্য সাধারণ অবদান রাখেন।

যুদ্ধের পর কীভাবে দেশ গড়ে তোলা হলো

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের অবস্থা ছিল ভয়াবহ। আক্ষরিক অর্থে শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করে বঙ্গবন্ধু সরকার। পাকিস্তান বাহিনীর 'পোড়ামাটি' নীতির কারণে বাংলাদেশ ভূখণ্ড এক বিধ্বস্ত জনপদে পরিণত হয়। প্রশাসন, ভৌত অবকাঠামো সবকিছুই ছিল বিপর্যস্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত ও ভুটান ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত হতাশাজনক। বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারবে কি না সে বিষয়ে সংশয় দেখা দেয়।

নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার, আলবদর, আলশামস গণহত্যা, নারী নির্যাতনের পাশাপাশি সম্পদ বিনষ্টের এক ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল। সারা দেশে প্রায় ৪৩ লক্ষ বসতবাড়ি, ৩ হাজার অফিস ভবন, ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৬ হাজার হাইস্কুল ও মাদ্রাসা, ৯ শত কলেজ ভবন ও ১৯ হাজার গ্রামীণ হাট-বাজার জ্বালিয়ে দেয়।

পরিকল্পিতভাবেই পাকিস্তানিবাহিনী যোগাযোগব্যবস্থাও ধ্বংস করে দেয়। ২৭৪টি ছোট-বড় সড়ক সেতু ও ৩০০টি রেল সেতু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। রেলওয়ে ইঞ্জিন, বগি ও রেল লাইনেরও ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। মাইন পুঁতে রাখার কারণে নৌবন্দরগুলো ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। চূড়ান্ত পরাজয়ের পূর্বে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাংকসমূহে রক্ষিত কাগজের নোটগুলো জ্বালিয়ে দেয়। গচ্ছিত স্বর্ণ লুট করে নিয়ে যায়। ফলে ব্যাংকগুলো তহবিলশূন্য হয়ে পড়ে।

পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের কঠিন দায়িত্ব নিয়ে কাজ শুরু করে সরকার। প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়ায় রেডক্রস সোসাইটি এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটির মাধ্যমে জেলা থেকে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। বছরের শুরুতে পুনর্বাসন কার্যক্রমের জন্য সরকারি হিসেবে মাসিকভিত্তিক এক চাহিদাপত্র তৈরি করা হয়। এতে প্রতি মাসে খাদ্যের প্রয়োজন ছিল দুই লক্ষ থেকে আড়াই লক্ষ টন, সিমেন্টের চাহিদা এক লক্ষ টন, ঢেউটিন লাগবে পঞ্চাশ হাজার টন, কাঠের প্রয়োজন পঞ্চাশ হাজার টন এবং ওষুধসহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা ছিল দুই লক্ষ টন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সরকারপ্রধান হিসেবে ১৪ই জানুয়ারি, ১৯৭২ প্রথম সংবাদ সম্মেলনে সরকারের জরুরি কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনের পাশাপাশি বিশ্বের সকল রাষ্ট্র, স্বাধীনতাপ্রিয় মানুষ ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে সাহায্য প্রদানের উদার আহ্বান জানান।

দলীয় কাজ ঃ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক এদেশে কী ক্ষতিসাধন হয়েছিল তার উপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি কর।

উন্নয়ন, পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

কৃষির উন্নয়ন

স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনগণের জীবিকা ছিল কৃষির ওপর নির্ভলশীল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকেরও বেশি আসত কৃষিখাত থেকে। তাই বঙ্গবন্ধু কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন। যেমন,

ক) ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফসহ পূর্বের সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফ করে দেন।

খ) একটি পরিবার সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা নির্ধারণ করেন।

গ) বাইশ লাখের অধিক কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধু মানবসম্পদের উন্নয়নে শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সরকারের দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যে তিনি স্বাধীন দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. মুহাম্মদ কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে ১৯৭২ সালের ২৬এ জুলাই শিক্ষা কমিশন গঠন করেন।

শিক্ষার উন্নয়ন

শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু জরুরি ভিত্তিতে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ৯০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল পুনর্নির্মাণ করেন। প্রথমবারের মতো সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করেন। এর ফলে এসব স্কুলে কর্মরত ১ লক্ষ ৬৫ হাজার শিক্ষককের চাকরিও সরকারি করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময় শিক্ষকদের পাওনা ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেন। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করেন।

সড়ক, রেল ও বিমান যোগাযোগের উন্নয়ন

মুক্তিযুদ্ধের সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল ব্রিজ-সেতু জরুরি ভিত্তিতে পুনর্নির্মাণ শুরু হয়। ১৯৭৪ সালের মধ্যে দেশের যোগাযোগব্যবস্থা একটা সন্তোষজনক অবস্থায় উন্নীত হয়। ঢাকা-আরিচা সড়কের বড় বড় সেতুসহ ৯৭টি নতুন সড়ক সেতু নির্মাণ করা হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত অন্যান্য রেল সেতু ও চালু হয়। যমুনা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৪ঠা নভেম্বর যমুনা সেতুর প্রাথমিক সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় রুটে বিমান চালু, তেজগাঁও বিমানবন্দর ব্যবহার উপযোগী করার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হয়। ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চের মধ্যে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম, সিলেট, যশোর ও কুমিল্লার বিমান যোগাযোগ কার্যকর হয়। ঢাকা-লন্ডন রুটে ১৯৭৩ সালের ১৮ই জুন প্রথম ফ্লাইট চালু হয়।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা

নবীন রাষ্ট্র হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, দারিদ্র্য হ্রাস, প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫%-এ উন্নীত করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং ক্রমান্বয়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হয়।

কাজ ঃ যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে কী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

সংবিধান প্রণয়ন ১৯৭২

পটভূমি

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ দলিল। এই দলিল লিখিত বা অলিখিত হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধান একটি লিখিত দলিল। দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ আর রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের জনগণ এই সংবিধান লাভ করে। উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারত ও পাকিস্তান ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন করে। দুই বছরে ভারত সংবিধান প্রণয়নে সফল হলেও পাকিস্তানের সময় লেগেছে নয় বছর, তাও তা কার্যকর হয়নি। অপরপক্ষে মাত্র নয় মাসে সদিচ্ছা, আন্তরিকতা আর জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সৎ থেকে বিশ্বের অন্যতম সংবিধান প্রণীত হয়েছে বঙ্গবন্ধুর সরকারের নেতৃত্বে।

বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭২ সালের ২৩এ মার্চ 'গণপরিষদ আদেশ' জারি করে। এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬এ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নই ছিল গণপরিষদের একমাত্র কাজ।

এই আদেশ জারির মধ্য দিয়ে সংবিধান প্রণয়নের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়। আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি বঙ্গবন্ধুকে গণপরিষদের দলীয় নেতা নির্বাচন করে। গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১০ই এপ্রিল। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণপরিষদের প্রথম স্পিকার নির্বাচিত হন শাহ আবদুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচিত হন মোহাম্মদ উল্লাহ। দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। ড. কামাল হোসেন এই কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। কমিটির সদস্যসংখ্যা ছিল ৩৪। কমিটি ১৯৭২ সালের ১১ই অক্টোবরের মধ্যে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কাজ শেষ করেন। ১৯এ অক্টোবর থেকে সংবিধান বিল সম্পর্কে গণপরিষদে সাধারণ আলোচনা শুরু হয়। দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ-আলোচনার পর ১৯৭২ এর ৪ঠা নভেম্বর সংবিধান বিল গণপরিষদে পাস হয়। ১৯৭২-এর ১৬ই ডিসেম্বর প্রথম বিজয় দিবসে সংবিধান কার্যকর হয়। গণপরিষদে সংবিধানের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেন, 'এই সংবিধান শহিদের রক্তে লিখিত, এ সংবিধান সমগ্র জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে বেঁচে থাকবে।'

সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১৯৭২-এর সংবিধান ছিল একটি লিখিত দলিল। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় সংবিধান রচিত হয়। তবে, বাংলাকে মূল ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা, ১১টি ভাগ, ১৫৩টি অনুচ্ছেদ এবং ৪টি তফসিল ছিল।

সংবিধানের প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ, দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ, তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ, চতুর্থ ভাগে নির্বাহী বিভাগ, পঞ্চম ভাগে জাতীয় সংসদ, ষষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগ, সপ্তম ভাগে নির্বাচন, অষ্টম ভাগে মহাহিসাব নিরীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রক, নবম ভাগে কর্ম কমিশন, দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন ও একাদশ ভাগে বিবিধ বিষয়াবলি আলোচনা করা হয়েছে।

১. **সর্বোচ্চ আইন ঃ** গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো বাংলাদেশের সংবিধান। তাই সংবিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না। সংবিধানে ঘোষণা করা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। কেবল সংবিধানের অধীনে থেকে জনগণের পক্ষে সে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে।

২. **রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঃ** সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে চারটি আদর্শকে গ্রহণ করা হয় । এ প্রসঙ্গে সংবিধানে উল্লেখ করা হয়– '... যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহিদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল জাতীয়বাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।'

ক. **জাতীয়তাবাদ ঃ** পাকিস্তান আমলের ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাতিল হয়ে যায়। এর বিপরীতে ভাষা ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্ম। অসাম্প্রদায়িক চেতনা হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি।

খ. **সমাজতন্ত্র ঃ** বঙ্গবন্ধু তাঁর রাজনৈতিক জীবনে সব সময় সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির কথা বলেছেন। দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য সংগ্রাম করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের একটা বড় অংশ ছিল নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান। স্বাধীনতার পর দেশের মানুষের স্বপ্ন ছিল সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মৌলিক চাহিদা পূরণে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে। তাই সংবিধানে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। মূলত শোষণহীন সমাজ গঠনের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু করাই ছিল এর লক্ষ্য।

গ. **গণতন্ত্র ঃ** পাকিস্তান রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে এই অঞ্চলের জনগণ ১৯৪৭ থেকেই কোনো গণতান্ত্রিক অধিকার পায়নি। সংবিধানে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি হবে একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। রাষ্ট্রে প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালিত হবে।

ঘ. **ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ** সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ছিল সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করা। কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান না করা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। রাষ্ট্র কোনো ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে না। প্রতিটি নাগরিকের ধর্মীয় অধিকার ও আচার-অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেবে রাষ্ট্র।

৩. **মৌলিক অধিকার ঃ** নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কিছু অধিকারের নিশ্চয়তা থাকা জরুরি। যেন ব্যক্তি স্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করতে না পারে। তাই সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহকে অলঙ্ঘনীয় ও পবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

৪. **এককেন্দ্রিক সরকার ঃ** এই সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বাংলাদেশে কোন প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্য নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে সারা দেশের প্রশাসন পরিচালিত হয়।

৫. **মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ঃ** সংবিধানে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদকে সংসদের নিকট দায়ি থাকতে হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক প্রধান। তবে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত থাকে।

৬. **এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ ঃ** সংবিধানে এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের ব্যবস্থা করা হয়। সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে ৩০০ জন সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা আসনে ১৫ জন সদস্য নিয়ে আইন পরিষদ গঠিত হবে। আইন পরিষদ জাতীয় সংসদ বলে অভিহিত হবে।

৭. **দুষ্পরিবর্তনীয় :** এই সংবিধান সংশোধন সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির মতো সহজ নয়। সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোট প্রয়োজন হবে। সংবিধান সংশোধনী বিল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পেশ করা হবে। ৭ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি বিলে সম্মতি দেবেন। ৭ দিন অতিক্রান্ত হলে সম্মতি দিয়েছেন বলে ধরে নেয়া হবে।

৮. **স্বাধীন বিচার বিভাগ :** সংবিধানে একটি স্বাধীন নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকের মাধ্যমে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে রাষ্ট্র। সংবিধানের বিধান অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতি স্বাধীনভাবে বিচারকাজ পরিচালনা করবেন।

৯. **সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ :** সংবিধানের মূলনীতির সঙ্গে মিল রেখে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। ধর্মের নামে কেউ যেন বিভেদ তৈরি করতে না পারে সে বিষয়ে সংবিধানে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বঙ্গবন্ধু সরকারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হলো স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উন্নতমানের এবং সুলিখিত দলিল এই সংবিধান। সদ্য স্বাধীন দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে সংবিধানের বিধানাবলির মধ্যে। নবীন রাষ্ট্রের পথচলার ক্ষেত্রে মূলনীতিসমূহ আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করেছে।

দলীয় কাজ : ১৯৭২ সালের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করে এ সংবিধান সম্পর্কে তোমাদের মতামত পোস্টারে লিখে উপস্থাপন কর।

বৈদেশিক সম্পর্ক

তৃতীয় বিশ্বের সদ্য স্বাধীন একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পররাষ্ট্রনীতির ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি দেশে ফিরে আসার পূর্বে ভারত ও ভুটান ছাড়া আর কোন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়নি বাংলাদেশ। পাকিস্তান ও তার মিত্রদের বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণায় বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র তখনও বিভ্রান্ত। অন্যদিকে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য-সহযোগিতা লাভ জরুরি হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও মেধা দিয়ে উপলব্ধি করেছেন যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে দুইটি বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে।

প্রথমত : স্বীকৃতি আদায়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

দ্বিতীয়ত : দেশ পুনর্গঠনে বিদেশি সাহায্য-সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

নবীন রাষ্ট্রটির পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারকের ভূমিকায় ছিলেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। তিনি সব সময় স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির কথা বলেছেন। তিনি পররাষ্ট্রনীতির দিক-নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার সুইজারল্যাণ্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।' ১৯৭২ সালের সংবিধানে পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখায় বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা হলো, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান এবং সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়। সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের পক্ষে থাকবে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের জন্য স্বীকৃতি আদায়ের কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিল না। কারণ, পাকিস্তানের বৈরি প্রচারণায় মুসলিম বিশ্বসহ চীন বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করত। বঙ্গবন্ধুর সফল নেতৃত্বে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র ও জাতিসংঘসহ প্রায় সকল আন্তর্জাতিক সংস্থার স্বীকৃতি লাভ করে। সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে যোগদান করে।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৫এ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ দেন। ফলে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলা ভাষা লাভ করে নতুন মর্যাদা। বঙ্গবন্ধুর শাসনকালে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়নি। দেশ দুইটি হলো চীন ও সৌদি আরব। দুইটি দেশের সঙ্গেই সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে বঙ্গবন্ধু আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। চীন ধীরে ধীরে বাংলাদেশ বিষয়ে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতে শুরু করে। স্বীকৃতি না দিলেও চীন বাণিজ্যিক চুক্তি করে এবং বন্যার্তদের জন্য বাংলাদেশে সাহায্য প্রেরণ করে।

জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ

অন্যদিকে বাংলাদেশ ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ লাভের মধ্য দিয়ে বিরাট সংখ্যক মুসলিম দেশের সমর্থন অর্জন করে। যদিও সৌদি আরব স্বীকৃতি দেয়নি। তথাপি, কূটনৈতিক যোগাযোগের ফলে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর কাছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সুতরাং, ঘটনাপ্রবাহের বিবেচনায় বলা যায়, চীন ও সৌদি আরবের স্বীকৃতি কেবল সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র।

বঙ্গবন্ধু সরকার বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থকে সবার উপরে স্থান দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করায় ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে ভারত সরকার বিমান, জাহাজ থেকে শুরু করে খাদ্যশস্য, পেট্রোলিয়াম ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সাহায্য ও অনুদান হিসেবে প্রদান করে। ১৯৭২ এর জুন মাস পর্যন্ত প্রাপ্ত বিদেশি সাহায্যের শতকরা ৬৭.০১ ভাগ প্রদান করে ভারত। বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারতীয় সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশকে বড় ধরনের মানবিক বিপর্যয় থেকে বাঁচানো সম্ভব হতো না। তৃতীয় বিশ্বের বিদেশি সাহায্য গ্রহণকারী একটি রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও ভারত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে বিপুল পরিমাণ সাহায্য প্রদান করে।

কিন্তু বাংলাদেশের চাহিদা ছিল আরও ব্যাপক। ভারতের সাধ্যের মধ্যে এই চাহিদা পূরণ সম্ভব ছিল না। অধিক অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য সরকারকে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। পরবর্তীতে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য পুঁজিবাদী ও মুসলিম দেশগুলোর ওপর অধিক নির্ভর করতে হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করায় বঙ্গবন্ধু সরকার প্রথম দিকে মার্কিন সাহায্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। বঙ্গবন্ধু সরকার দেশের স্বার্থে পুঁজিবাদী ও মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তারপরও বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৩০টি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন করে। এ ছাড়া জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদসহ ১৪টি আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ লাভ করে।

বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৩

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ। বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয়। স্বাধীনতা লাভের স্বল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সরকার সাধারণ নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গণতন্ত্রের পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করে। জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩০৬, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ২টি, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা ৬টি আসনে জয়লাভ করেন। বঙ্গবন্ধুর ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় নির্বাচনী ফলাফল স্বাভাবিক বলেই জনগণ গ্রহণ করে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭৩-এর ১৬ই মার্চ নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন

১৯৭৫ সালের ২৫এ জানুয়ারি দেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। রাষ্ট্রপতি সকল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েন। এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিপরিষদ ও জাতীয় সংসদের কোনো ক্ষমতা ছিল না। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন আনা হয়। এই সংশোধনী অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। তিনি ইচ্ছানুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী এবং অন্যান্য সরকারি বিভাগের কর্মকর্তা নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারবেন। এছাড়া বাংলাদেশের জন্য জাতীয়ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কর্তৃত্বও রাষ্ট্রপতিকে প্রদান করা হয়। জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের পর অন্যান্য রাজনৈতিক দল বাতিল ও বেআইনি ঘোষণা করা হবে। ১৯৭৫ সালের ২৪এ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অন্যান্য রাজনৈতিক দল ভেঙে দিয়ে 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল) নামে একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের চেয়ারম্যান হলেন বঙ্গবন্ধু এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন এম. মনসুর আলী।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকারব্যবস্থার পরিবর্তন নানা বিতর্কের জন্ম দেয়। এই ব্যবস্থার বিপক্ষে বলা হয়, এর ফলে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা খর্ব হয়, রাষ্ট্রপতিকে অসীম ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং একক রাজনৈতিক দল গঠন করে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। বঙ্গবন্ধু নতুন সরকার পদ্ধতির সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তিনি সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। দেশের আর্থ-সামাজিক ও আইনশৃঙ্খলার জরুরি পরিস্থিতি

মোকাবেলায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী অনিবার্য হয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল। উল্লেখ্য, বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে একক রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার নজির রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে নতুন সরকার পুরোপুরি কাজ করার পূর্বেই ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়। সুতরাং এই ব্যবস্থার ভালো-মন্দ দিক সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা বা অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব হয়নি।

১৫ই আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ড

১৫ই আগস্ট, ১৯৭৫ বাংলাদেশের ইতিহাসে কলঙ্কময় একটি দিন। ঘাতকরা এই দিন জাতির পিতা ও পাঁচ পরিবারের সদস্যদের নির্মম ও নৃশংসভাবে হত্যা করে। শিশু রাসেলকেও বাঁচতে দেয়নি ঘাতকের বুলেট। বর্বর হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠা খুনিরা ছিল সেনাবাহিনীর বিপথগামী কিছু সদস্য। পর্দার অন্তরালে ছিল সামরিক ও বেসামরিক ষড়যন্ত্রকারীরা। ১৫ই আগস্ট নির্মম হত্যাকাণ্ডের তারাই ছিল সুবিধাভোগী। দেশি-বিদেশি অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী বঙ্গবন্ধুকে সাবধান করেছিলেন। রাষ্ট্রপতির এমন অরক্ষিত বাড়িতে বসবাস মোটেই নিরাপদ নয়। ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে তিনি কখনো শঙ্কিত ছিলেন না। অবিচল আস্থায় বলতেন, 'আমাকে কোনো বাঙালি মারবে না।'

১৫ই আগস্ট, সেদিন ভোরের আলো তখনও ভালোভাবে ফুটে ওঠেনি। আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে ঢাকা। জাতির পিতা সপরিবারে ঘুমিয়ে আছেন ধানমন্ডির ৩২ নং সড়কের ৬৭৭ নং বাড়িতে। ঘাতকের দল ট্যাংক, কামান, মেশিনগানসহ অত্যাধুনিক মারণাস্ত্র নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। টার্গেট বঙ্গবন্ধু, তাঁর পরিবার এবং আত্মীয়-পরিজনকে হত্যা করা। আনুমানিক ভোর সাড়ে ৫টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে আক্রমণ শুরু হয়। মেজর মহিউদ্দিন, মেজর হুদা, মেজর পাশা, মেজর নূরের নেতৃত্বে ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ঘেরাও করে ফেলে।

জোর করে খুনির দল বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে প্রবেশ করল। তখন ভোরের আলো অনেকটা পরিষ্কার। গোলাগুলির শব্দে আতঙ্কিত ধানমন্ডির অধিবাসীরা। নীলনকশা অনুযায়ী খুনিচক্র ঝাঁপিয়ে পড়ল জাতির পিতার পরিবারের ওপর।

চিৎকার, হট্টগোল আর গুলির শব্দে ঘুম ভাঙে বঙ্গবন্ধু পরিবারের। একে একে হত্যা করে প্রতিটি সদস্যকে। শিশু রাসেলও রেহাই পায়নি। একজন ঘাতক শেখ রাসেলকে ঘরে উপরতলা থেকে নিচে নিয়ে আসে। ভয়ে কাতর, বিহ্বল হয়ে পড়ে ৮ বছরের শিশু রাসেল। মায়ের কাছে যাবার জন্য কাঁদতে শুরু করে। নিষ্ঠুর ঘাতক রাসেলকে উপরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। স্টেইনগান থেকে বঙ্গবন্ধুর বুক লক্ষ্য করে গুলি করে ঘাতকের দল। তাঁর বুকে ১৮টি গুলির আঘাত পাওয়া যায়। হত্যা করা হয় বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেল। পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজি জামাল, সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আবদুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মনি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মনি, বেবি সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে বঙ্গবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার ভিত্তি নির্মাণে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। তারপরও বাংলাদেশের রূপকার, এদেশের সব মানুষের অতিপ্রিয় নেতাকে এভাবে জীবন দিতে হলো। এমনি করুণ, নির্মম, হৃদয়বিদারক হত্যার নজির বিশ্ব ইতিহাসে নেই বললে চলে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার ষড়যন্ত্রে দেশি-বিদেশি চক্র এবং সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ জড়িত ছিল। খুনি চক্রের নেতৃত্বে ছিল খন্দকার মোশতাক আহমদ। বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের কারণে বিশ্বের চোখে আমরা কৃতঘ্ন জাতিতে পরিণত হয়েছি। ক্ষমতা দখলকারীরা বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর কীর্তি মুছে ফেলার চেষ্টা করে। তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। কারণ বাংলাদেশ থেকে বঙ্গবন্ধুকে বিচ্ছিন্ন করে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। কবি অন্নদাশঙ্কর রায় কয়েকটি পঙ্‌ক্তির মধ্য দিয়ে সে কথাই বলেছেন,

'যতকাল রবে পদ্মা যমুনা
গৌরী মেঘনা বহমান,
ততকাল রবে কীর্তি তোমার
শেখ মুজিবুর রহমান।'

একক কাজ ঃ বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ড বাঙালি জাতির জন্য নিকৃষ্টতম কলঙ্কিত অধ্যায়–উদ্ধৃতির যথার্থতা নিরূপণ করে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

খন্দকার মোশতাকের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল

বঙ্গবন্ধু নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে চরম নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি হয়। খুনিচক্রের সহায়তায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে খন্দকার মোশতাক আহমদ। অবৈধ ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য তখন প্রথম স্বাধীন দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের কত তারিখে গ্রেফতার হন?
   ক. ২৫এ মার্চ   খ. ২৬এ মার্চ
   গ. ২৭এ মার্চ   ঘ. ২৮এ মার্চ

২. বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব কেন পালন করেন?
   ক. সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন বলে   খ. দেশ পুনর্গঠনের জন্য
   গ. রাজাকারদের শাস্তি দেওয়ার জন্য   ঘ. স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনা করতে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'ক' রাষ্ট্রের রমেশ, আবদুল্লাহ, লিন্ডা গোমেজ ও অমল বড়ুয়া সবাই তাদের পূজা, ঈদ, বড় দিন ও বৌদ্ধ পূর্ণিমা ইত্যাদি অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে ধুমধাম করে পালন করে। এসব অনুষ্ঠান উদযাপনে রাষ্ট্র কাউকে কোনো বিশেষ পৃষ্ঠপোষকতা দেয় না।

৩. 'ক' রাষ্ট্রে ১৯৭২ এর সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশ পেয়েছে?
   ক. গণতন্ত্র   খ. ধর্মনিরপেতা
   গ. জাতীয়তাবাদ   ঘ. সমাজতন্ত্র

৪. এ বৈশিষ্ট্য মানুষকে দেয়
   ক. ধর্মীয় স্বাধীনতা   খ. অর্থনৈতিক স্বাধীনতা
   গ. সামাজিক স্বাধীনতা   ঘ. সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা

সৃজনশীল প্রশ্ন:

১. রাসেলের বিদেশি বন্ধু রবার্ট বাংলাদেশে এসে মুগ্ধ। এদেশের সবুজ প্রকৃতি তার খুব পছন্দ হয়। তবে রবার্টের খুব কষ্ট লেগেছে বড় বড় দালানের পাশে নোংরা বস্তি দেখে। তাদের দেশে মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ইত্যাদির চাহিদা পূরণে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। তাদের সংবিধানের মূল লক্ষ শোষণহীন সমাজ গঠন। রাসেল বলে, আমাদের সংবিধানে মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা আছে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হয়। জনগণের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে। তবে রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

ক. বঙ্গবন্ধু কবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ?

খ. বঙ্গবন্ধু কেন সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন?

গ. রবার্ট এর দেশে ৭২ এর সংবিধানের কোন বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করা যায় ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রাসেলের কথায় ৭২ এর সংবিধানের আংশিক বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে'- মূল্যায়ন কর।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সামরিক শাসন ও পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ (১৯৭৫- ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ)

খোন্দকার মোশতাক : ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায়

১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী খোন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেন। প্রায় তিন মাসের মতো ক্ষমতায় ছিলেন মোশতাক। দীর্ঘদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে রাজনীতি করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আস্থা ও বিশ্বাসভাজনদের অন্যতম ছিলেন মোশতাক। তিনিই বঙ্গবন্ধুর সাথে জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করলেন। তিনিই এদেশের ইতিহাসে জন্ম দিয়েছেন কলঙ্কিত অধ্যায়।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- সামরিক শাসনের সূত্রপাত এবং পরবর্তী রাজনৈতিক ঘটনার বর্ণনা করতে পারব;
- প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাসন আমলের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো বর্ণনা করতে পারব;
- ১৯৮২ সালের সামরিক শাসন এবং তৎপরবর্তী ঘটনায় সৃষ্ট পরিস্থিতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে পারব;
- এরশাদ সরকারের প্রশাসনিক সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনগুলো ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ১৯৯০ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি এবং ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বাংলাদেশে গণতন্ত্রের তাৎপর্য এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব প্রদর্শন করব।

মোশতাকের স্বল্পকালীন শাসনকাল বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে আনে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমস্ত অর্জন মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয় এবং পাকিস্তানের ভাবধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠা শুরু হয়। ক্ষমতা দখল করে পাঁচ দিনের মাথায় মোশতাক স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সামরিক আইন জারি করেন। ১৫ই আগস্ট জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি শুরু করলেন, 'বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম' দিয়ে আর শেষ করলেন, 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' বলে। ভাষণে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডকে ঐতিহাসিক প্রয়োজন আখ্যায়িত করে বলেন, '... দেশবাসী এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে অব্যক্ত বেদনায় তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছিল। দেশের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন সকল মহলের কাম্য হওয়া সত্ত্বেও বিধান অনুযায়ী তা সম্ভব না হওয়ায় সরকার পরিবর্তনের জন্য সামরিক বাহিনীকে এগিয়ে আসতে হয়েছে। সশস্ত্র বাহিনী পরম নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব সম্পন্ন করে সামনে সম্ভাবনার এক স্বর্ণদ্বার উন্মোচন করেছেন।' এটি ছিল মোশতাকের জাতিকে বিভ্রান্ত করার প্রথম প্রয়াস।

সামরিক বাহিনীর কিছু অবসরপ্রাপ্ত ও বরখাস্তকৃত নিম্ন ও মধ্য পর্যায়ের অফিসারের ষড়যন্ত্রকে মোশতাক সমগ্র সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান হিসেবে বর্ণনার চেষ্টা করেন। আর এই নিষ্ঠুর বর্বর হত্যাকাণ্ডকে তিনি সম্ভাবনার স্বর্ণদ্বার বলে অভিহিত করেন। মোশতাক নানা ভয়ভীতি দেখিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কেউ কেউ উৎসাহী ছিলেন না, এমন নয়। তবে, জীবনের ভয় দেখিয়েও মোশতাক জাতীয় চার নেতাসহ অনেককে বশীভূত করতে পারেননি। ১৭ই আগস্ট গ্রেফতার হন প্রধানমন্ত্রী মনসুর আলী। ২২এ আগস্ট গ্রেফতার হন তাজউদ্দিন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম।

কামরুজ্জামান, আব্দুস সামাদ আজাদ, কোরবান আলীসহ প্রায় ২০ জন নেতাকে ২৩এ আগস্ট গ্রেফতার করা হয়। আরও অসংখ্য নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়, যারা মোশতাকের নেতৃত্ব মানতে রাজি হন নি। মোশতাকের এ ঘৃণ্য ও অনৈতিক প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছে। কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, কামরুজ্জামান ও মনসুর আলীকে ৩ নভেম্বর নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। কারাগারের ভেতরে ঢুকে নির্মমভাবে জাতীয় চার নেতাকে যারা হত্যা করল তাদের গ্রেফতার করা হলো না; কোনো বিচার হলো না। বাংলাদেশের ইতিহাসে আরেকটি কলঙ্কজনক অধ্যায় যুক্ত হলো।

মোশতাক এ সময় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী নানা প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যোগ নেন। যেমন- মুক্তিযুদ্ধের রণধ্বনি 'জয় বাংলা' বাতিল করে দেন। 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' এর অনুকরণে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' স্লোগান চালু করেন। রেডিও পাকিস্তানের ন্যায় করলেন 'রেডিও বাংলাদেশ'।

মোশতাকের সবচেয়ে নিন্দনীয় ও জঘন্য কাজ হলো ১৯৭৫-এর ২০এ আগস্ট একটি আদেশ জারি। এই আদেশ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না। কোনো সভ্য সমাজে এই ধরনের আইন হতে পারে না যে হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না।

মানবতাবিরোধী এই কালো আইন 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৫' নামে ১৯৭৫-এর ২৬এ সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ গেজেট' এ প্রকাশিত হয়। ইনডেমনিটি অধ্যাদেশে বলা হয়, ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্ট সরকার পরিবর্তনের জন্য যেসব পরিকল্পনা বা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে এবং যারা এর সাথে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি বিধানের জন্য কোনোরূপ আইনের আশ্রয় নেওয়া যাবে না। শুধু তাই নয়, খোন্দকার মোশতাক ১৫ই আগস্টের খুনিচক্রকে দেশে-বিদেশে উচ্চপদ ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দিয়ে পুরস্কৃতও করেন।

আগস্ট হত্যাকাণ্ডের পর মোশতাক ও তার সহযোগিরা ক্ষমতাকে স্থায়ী ও নিরাপদ করার জন্য সেনাবাহিনীর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। এরই অংশ হিসেবে সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল কে এম শফিউল্লাহর চাকরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। ২৫এ আগস্ট মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন মোশতাক। ভারতে প্রশিক্ষণরত ব্রিগেডিয়ার এইচ এম এরশাদকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনাবাহিনীর উপপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দানকারী প্রথম রাষ্ট্র পাকিস্তান। বঙ্গবন্ধুর নির্মম হত্যাকাণ্ডে জুলফিকার আলী ভুট্টোর আনন্দের সীমা ছিল না। ভুট্টো খুনিচক্রকে অভিনন্দন জানিয়েছে, কারণ এটা ছিল তার কাছে পাকিস্তানের বিজয়, যা ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে হারানো ভূখণ্ড ফিরে পাওয়ার শামিল। চীন ও সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় যথাক্রমে ১৬ ই ও ৩১এ আগস্ট, ১৯৭৫। জনসমর্থনহীন মোশতাকের সামরিক সরকারের পতন হয় ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর।

খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান ও পাল্টা অভ্যুত্থান

১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের ফলে দেশে চরম রাজনৈতিক শূন্যতার পাশাপাশি সেনাবাহিনীতে দেখা দেয় নৈরাজ্যকর অবস্থা। মোশতাকের পক্ষে এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব ছিল না। কারণ বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডে-র সঙ্গে যুক্ত সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই মোশতাক ক্ষমতা দখল করেছেন। তাই এই সৈনিকদের ওপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বঙ্গভবনে অবস্থান করে খুনিচক্র রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নেয়। এতে সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড একেবারে ভেঙে পড়ে।

উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের দাবির মুখেও নবনিযুক্ত সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়া সেনাবাহিনীতে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্যোগ নেন নি। কারণ ১৫ই আগস্ট হত্যাকণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের সহায়তায় জিয়া সেনাপ্রধানের পদ লাভ করেছেন। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেওয়া জিয়ার পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমনি পরিস্থিতিতে জিয়ার নিষ্ক্রিয়তা সেনাবাহিনীর মধ্যে অসন্তোষ আরও বাড়িয়ে দেয়।

চিফ অব জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেনাবাহিনীর মধ্যে নেতৃত্বের সংকট নিরসনে উদ্যোগী হন। তিনি উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলেন সামরিক অভ্যুত্থান ছাড়া চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কর্নেল সাফায়াত জামিল এই অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ১লা নভেম্বর খালেদ মোশাররফ বিশ্বস্ত কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে গোপন বৈঠকে মিলিত হন। পাল্টা অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২রা নভেম্বর রাতে বঙ্গভবন থেকে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যরা সেনানিবাসে ফিরে যাওয়ার মধ্য দিয়ে অভ্যুত্থান শুরু হয়। ৩রা নভেম্বর ভোর রাতে জিয়াউর রহমানকে গৃহবন্দি করা হয়। খালেদ মোশাররফের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল নিয়ে খন্দকার মোশতাকের দেন দরবার চলতে থাকে। একপর্যায়ে জেনারেল ওসমানীর পরামর্শে ১৫ই আগস্ট হত্যাকাণ্ডের খুনিচক্র পরিবার পরিজনসহ ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছেড়ে যায়। ৪ঠা নভেম্বর সকালে খালেদ মোশাররফ বর্বর, নৃশংস জেলহত্যার কথা জানতে পারেন।

১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর গভীর রাতে দেশত্যাগের পূর্বে ঘাতকের দল প্রেসিডেন্ট মোশতাকের অনুমতি নিয়ে বেআইনিভাবে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারা অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সেখানে বন্দি অবস্থায় থাকা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী ও এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। মোশতাক নানা ভয়ভীতি দেখিয়েও জাতীয় চার নেতাকে তার সরকারের মন্ত্রীপদ গ্রহণে সম্মত করাতে পারেন নি। যে কারণে খুনিচক্র কারাগারের ভেতরে এ রকম নারকীয় হত্যাযজ্ঞ ঘটাল। এ হত্যাকাণ্ড ছিল ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত, স্বাধীনতাবিরোধী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর সম্মিলিত ষড়যন্ত্র ও নীলনকশার বাস্তবায়ন। উভয় হত্যাকাণ্ডের মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের অর্জনসমূহ ধ্বংস, দেশকে নেতৃত্বশূন্য এবং পাকিস্তানি ভাবাদর্শ প্রতিষ্ঠা করা। ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড একই গোষ্ঠী সংঘটিত করে।

৪ঠা নভেম্বর খালেদ মোশাররফ এক ঘোষণায় জানালেন যে জিয়াউর রহমান সেনাপ্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। মোশতাকের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন তাঁকে পদোন্নতিসহ সেনাপ্রধান নিয়োগের জন্য। ক্ষমতার পালাবদলে মোশতাককে সম্মত করাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। শেষ পর্যন্ত ৫ই নভেম্বর মাঝ রাতে মোশতাক ক্ষমতা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। এই পরিস্থিতিতে খালেদ মোশাররফ ও অভ্যুত্থানকারী অফিসাররা তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণে অনুরোধ করেন। ৬ই নভেম্বর বিচারপতি সায়েম বঙ্গভবনের দরবার কক্ষে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। মোশতাক ও জিয়াকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে এবং বঙ্গভবনকে খুনি চক্রদের কবল থেকে মুক্ত করে খালেদ মোশাররফ রাষ্ট্রক্ষমতায় তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। সাহসী, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেনাবাহিনীতে খালেদ মোশাররফের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা ছিল। মুক্তিযুদ্ধে 'কে' ফোর্সের কমাণ্ডার হিসেবে বহুবার সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেন। কিন্তু সামরিক অভ্যুত্থানের নেতৃত্বে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। ৩রা থেকে ৬ই নভেম্বর, মাত্র চারদিনের জন্য তিনি রাষ্ট্রক্ষমতায় তাঁর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। ৭ই নভেম্বর কর্নেল (অবঃ) আবু তাহেরের পাল্টা অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হন খালেদ মোশাররফ। পরে খালেদ মোশাররফ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের হত্যা করা হয়।

বিচারপতি সায়েমের সরকার

বিচারপতি সায়েমের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণের পরের দিন ৭ই নভেম্বর পাল্টা অভ্যুত্থান ঘটে যায়। জিয়াউর রহমান গৃহবন্দি থাকা অবস্থায় টেলিফোনে কর্নেল তাহেরকে অনুরোধ করেন তাঁকে মুক্ত করার জন্য। বীর মুক্তিযোদ্ধা তাহের মুক্তিযুদ্ধে বোমার আঘাতে একটি পা হারান। জিয়া জানতেন জওয়ানদের মধ্যে তাহেরের বাম রাজনীতির অনেক সমর্থক ছিল। রাজনৈতিক সমর্থনের জন্য তাহের জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলকেও এই অভ্যুত্থানে সম্পৃক্ত করেন। এটি সামরিক বাহিনী ও বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত অধ্যায়। পরিকল্পনা মোতাবেক ৬ই নভেম্বর মধ্যরাতে তাহেরের নেতৃত্বে খালেদ মোশাররফের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান শুরু হয়। সৈন্যরা জিয়াকে গৃহবন্দি অবস্থা থেকে মুক্ত করে আনলে জিয়া কর্নেল তাহেরকে বুকে জড়িয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ জানান। কোনো বাধা ছাড়াই সৈন্যরা জিয়াকে সেনাবাহিনীর প্রধান ঘোষণা করে।

জিয়ার ক্ষমতায় ফিরে আসার মধ্য দিয়ে মোশতাকও আশা করেছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হবেন। কিন্তু, জিয়ার সমর্থনের অভাবে মোশতাক ক্ষমতার কেন্দ্রে আর আসতে পারলেন না, রাষ্ট্রপতির পদও ফিরে পেলেন না। বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি পদে বিচারপতি সায়েম থাকলেও, প্রকৃত ক্ষমতা ছিল সেনানিবাসে; সেনাপ্রধান জেনারেল জিয়ার হাতে। যে কারণে বিচারপতি সায়েম তাঁর সময়ে কোনো সিদ্ধান্তই স্বাধীনভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে তিনি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তা রক্ষা করতে পারেন নি। ১৯৭৭ সালের ২১এ এপ্রিল জিয়াউর রহমান বলপূর্বক আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপতির পদ দখল করে নেন। অবশ্য এর অনেক পূর্বেই সায়েমের সরকার অকার্যকর হয়ে পড়ে। নির্বাচন আয়োজনের জন্য তিনি বিচারপতি সাত্তারকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু সাত্তার নির্বাচন আয়োজনে আগ্রহী ছিলেন না, বরং তিনি জেনারেল জিয়াকে ইন্ধন যুগিয়েছেন ক্ষমতা দখলে। প্রতিদান দিতেও জিয়া কার্পণ্য করেন নি। সাত্তারকে তিনি উপরাষ্ট্রপতি পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন।

জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা সংহতকরণে নানা পদক্ষেপ

জিয়াউর রহমান একজন উচ্চাভিলাষী সামরিক কর্মকর্তা ছিলেন। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সেনাবাহিনীতে তাঁর জনপ্রিয়তা ছিল। স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু সরকার তাঁকে স্বল্প সময়ের মধ্যে একাধিক পদোন্নতি দিয়ে মেজর জেনারেল পদে উন্নীত করেন। তাঁকে ১৯৭২ সালের জুন মাসে সেনাবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ নিয়োগ দেওয়া হয়। মুক্তিযুদ্ধে অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বঙ্গবন্ধু তাঁকে 'বীর উত্তম' উপাধি প্রদান করেন। মাত্র ৪০ বছর বয়সে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে জিয়া দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাঁর ক্ষমতাকে স্থায়ী করার জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আবু তাহেরের বিচার

৭ই নভেম্বর সেনাবিদ্রোহ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে ১৯৭৫ সালের ২৪এ নভেম্বর কর্নেল (অব:) আবু তাহেরকে গ্রেফতার করা হয়। একই সঙ্গে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) বিপুলসংখ্যক নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কারণ ওই সময়ে তাহের বা তাহের সমর্থিত রাজনৈতিক দল হিসেবে জাসদই কেবল জিয়ার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারত। ব্যাপক নিরাপত্তার মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাহেরের বিচার শুরু হয় ১৯৭৬ সালের ২১এ জুন। বিশেষ সামরিক ট্রাইব্যুনালে গোপন বিচারকাজ শেষ হয় ১৯৭৬ সালের ১৭ই জুলাই। এই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান ছিলেন পাকিস্তান ফেরত সেনা কর্মকর্তা কর্নেল ইউসুফ হায়দার। ট্রাইব্যুনাল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে। প্রহসনের বিচারের রায় অনুযায়ী তাহেরের ফাঁসি কার্যকর হয় ১৯৭৬সালের ২১এ জুলাই।

বিচার চলাকালীন প্রায়ই ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান কর্নেল ইউসুফ হায়দার বঙ্গভবনে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে দেখা করতেন। অনেক সময় ধরে দুইজনে পরামর্শ করতেন। এতে তাহেরের শাস্তি হবেই ভাবলেও ফাঁসি হবে তা কেউ ভাবতে পারে নি। তাহেরের ফাঁসির পর কর্নেল ইউসুফ পদোন্নতি পেয়ে ব্রিগেডিয়ার হন। মামলার চিফ প্রসিকিউটর এ.টি.এম. আফজালকে পরবর্তীকালে হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিয়োগ দেন। ৭ই নভেম্বর অভ্যুত্থানের অপরাধে তাহেরকে ফাঁসি দেওয়া হলো। অথচ এই অভ্যুত্থানের সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী ছিলেন জিয়া নিজে। তাহের যাঁর জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন, তথাকথিত বিচারের নামে তাঁর হাতেই তাহেরের জীবনাবসান হয়।

সেনাবাহিনীতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা

অভ্যুত্থান-পাল্টা অভ্যুত্থান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ব্যাপকভাবে সন্দেহ-অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতার জন্ম দেয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট, ৩রা নভেম্বর ও ৭ই নভেম্বর প্রায় তিন মাসের মধ্যে তিনটি সামরিক অভ্যুত্থানে চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়ে। সর্বশেষ অভ্যুত্থানে সেনাবাহিনীর ভেতরে রক্তপাত হয় বেশি, বিশেষভাবে অফিসারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই অভ্যুত্থানে সাধারণ সৈনিকদের স্লোগান ছিল 'সিপাই সিপাই ভাই ভাই, অফিসারদের রক্ত চাই' এবং 'সিপাহী সিপাহী ভাই ভাই, সুবেদারের ওপরে অফিসার নাই।' অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে সেনাবাহিনীতে শৃংখলা বলে কিছু ছিল না। এছাড়া পেশাগত সুযোগ-সুবিধা নিয়েও সেনাবাহিনীতে দীর্ঘদিন যাবৎ অসন্তোষ ছিল।

জিয়া যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন যে সেনাবাহিনীতে শৃংখলা প্রতিষ্ঠাই তাঁর প্রধান দায়িত্ব। কারণ সেনাবাহিনীই ছিল তাঁর ক্ষমতার উৎস। তাঁর ক্ষমতা গ্রহণের কোনো আইনগত বৈধতা ছিল না। তিনি নিজের স্বার্থে, ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সেনাবাহিনীকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে তুষ্ট করার চেষ্টা করেন। সিপাহিদের মানসম্মত পোশাক, খাবার, অস্ত্র ও সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা করা হয়। অফিসারদেরও মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। বঙ্গবন্ধু সরকারের তুলনায় জিয়া বহুগুণে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করেন। ১৯৭৪-৭৫ সালে প্রতিরক্ষা বাজেট ছিল ৭৫ কোটি টাকা। জিয়া তা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি করে করলেন ২০৬ কোটি ২০ লাখ টাকা। ১৯৭৬-৭৭ সালে আরও বৃদ্ধি করে ২১৯ কোটি ৪০ লাখ টাকা করা হয়।

সামরিক ফরমান জারি

বিচারপতি সায়েমের কাছ থেকে জোরপূর্বক রাষ্ট্রপতির পদ দখলের তিন দিনের মাথায় ২৩এ এপ্রিল, ১৯৭৭ সামরিক ফরমান জারি করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত বাহাত্তরের সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করেন।

ক. বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় ছিল বাঙালি হিসেবে। জিয়া এদেশের নাগরিকদের নতুন পরিচয় দিলেন বাংলাদেশি।

খ. সংবিধানের শুরুতে প্রস্তাবনার পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' এই শব্দগুলো যুক্ত হয়।

গ. রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' বিলুপ্ত করে বলা হলো, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলির ভিত্তি।'

ঘ. মূলনীতি 'সমাজতন্ত্র'-এর ব্যাখ্যা দেওয়া হলো 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' হিসেবে।

ঙ. বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ে বলা হলো, 'রাষ্ট্র ইসলামি সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ এবং জোরদার করতে সচেষ্ট হবেন।'

চ. 'মুক্তি সংগ্রামের' পরিবর্তে 'স্বাধীনতা যুদ্ধ' ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়।

জিয়ার সংবিধান সংশোধনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ বা আওয়ামী লীগবিরোধী দল ও ব্যক্তির সমর্থন লাভ করা। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও জনগণের পরিচয়ের ওপর ধর্মীয় ছাপ প্রকট করে তোলা। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীতে পাকিস্তানি চেতনাকে ফিরিয়ে এনে জিয়া তাঁর ক্ষমতাকে স্থায়ী করতে চেয়েছেন।

ঘরোয়া রাজনীতি চালু

সামরিক সরকার রাজনৈতিক অসন্তোষ হ্রাসের জন্য ১৯৭৬ সালের ২৮এ জুলাই 'রাজনৈতিক দলবিধি' জারি করে। বিশেষ কিছু শর্তে রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়। আইন অনুযায়ী সামরিক সরকারের অনুমোদন ছাড়া কোনো দল রাজনীতি করতে পারবে না। কোনো কোনো রাজনৈতিক দলকে অনুমতি প্রদানে জিয়া বিলম্বের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ৫৭টি রাজনৈতিক দল অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করলে ২৩টিকে ঘরোয়া রাজনৈতিক তৎপরতা চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়।

গণভোট

তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই সামরিক শাসকরা অবৈধ ক্ষমতা দখলের পর গণভোটের আয়োজন করে। উদ্দেশ্য ক্ষমতা দখলকে একপ্রকার বৈধতা প্রদান করা। বিচারপতি সায়েমের কাছ থেকে ক্ষমতা দখলের পরের দিন ১৯৭৭ সালের ২২এ এপ্রিল জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান ৩০এ মে গণভোট আয়োজনের ঘোষণা দেন। এটি হ্যাঁ/না ভোট নামেও পরিচিত। ৩০এ মে ১৯৭৭ অনুষ্ঠিত গণভোটে জেনারেল জিয়া এবং তাঁর নীতি ও কর্মসূচির প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থন দেখানোর চেষ্টা করা হয়। নির্বাচনে বানোয়াটভাবে শতকরা ৮৮.৫ ভোটদাতা ভোট প্রদান করেছেন বলে সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, ১৯৭৮

সামরিক শাসনের অধীনে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আয়োজন করা হয়। ১৯৭৮ সালের ৩রা জুন নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়। নির্বাচনে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দুইজন : জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এম এ জি ওসমানী। ইতোমধ্যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুইটি জোট গড়ে ওঠে। জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের প্রার্থী ছিলেন জিয়াউর রহমান, অন্যদিকে গণতান্ত্রিক ঐক্য জোটের প্রার্থী ছিলেন এম এ জি ওসমানী। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, ইসলামী ডেমোক্রেটিক লীগ, সাম্যবাদী দল (তোয়াহা), পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি জিয়াকে প্রত্যক্ষ সমর্থন জানায়। ওসমানীর পক্ষে ছিল আওয়ামী লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, জনতা পার্টি, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর), গণ আজাদী লীগসহ আরও কিছু দল।

নানা রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে অংশ নেয়। জিয়ার সঙ্গে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ওসমানী যে পেরে উঠবেন না এ নিয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। জিয়া ও তাঁর সমর্থকদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নির্বাচনকে দেশে-বিদেশে কীভাবে গ্রহণযোগ্য করা যায়। জিয়া কারচুপির মাধ্যমে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭৬.৬৩ ভাগ ভোট পেয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। ওসমানীকে দেখানো হয়েছিল মাত্র ২১.৭০ ভাগ ভোট। এই নির্বাচনের পরেও সামরিক শাসন থাকায় জনগণ গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরে পায়নি।

নতুন রাজনৈতিক দল গঠন

ক্ষমতা দখলের পর অন্যান্য সামরিক শাসকদের ন্যায় জেনারেল জিয়াও রাজনৈতিক দল গঠনের চিন্তা করেছেন। আওয়ামী লীগবিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক সমর্থন নিয়ে জিয়ার যাত্রা শুরু। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানপন্থী জামায়াতে ইসলামি, নেজামে ইসলামি, মুসলিম লীগসহ ধর্মীয় দলগুলোর বাংলাদেশবিরোধী ভূমিকার কারণে স্বাধীনতার পর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। জিয়া দালাল আইন বাতিল এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠনের সাংবিধানিক অন্তরায় দূর করে স্বাধীনতা বিরোধীদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দেন। জিয়া ১৯৭৮ সালের ১লা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল, (বিএনপি) নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। তিনি নিজেই এই দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিলেন। স্বাধীনতাবিরোধী, বামপন্থী, ডানপন্থী বিভিন্ন দল ও ব্যক্তি বিএনপিতে যোগ দেয়।

মূলত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার আশায় জিয়ার আশেপাশে অনেক রাজনীতিবিদ ভিড় করেছিলেন। জিয়া তাদেরকে পদ-পদবি দিয়ে নানাভাবে পুরস্কৃত করেছেন। জিয়ার আমলে উপদেষ্টা/মন্ত্রীর একটা বড় অংশ আইয়ুব ও ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। আবার, অনেকে স্বাধীনতার বিরোধী ভূমিকায় ছিলেন। জিয়া স্বাধীনতাবিরোধী শাহ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন।

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ১৯৭৯

রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমানের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৭৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। জিয়ার নেতৃত্বাধীন বিএনপি ২০৭টি আসন লাভ করে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (মালেক) ৩৯টি আসন পেয়ে বিরোধী দলের দায়িত্ব পালন করে। বিরোধী দলের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারণায় নানা রকম বাধা-হুমকির মুখে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে সামরিক সরকারের অধীনে নির্বাচন কমিশন স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে নি।

পঞ্চম সংশোধনী আইন ১৯৭৯

১৯৭৯ সালের ৫ই এপ্রিল বাংলাদেশ সংবিধান পঞ্চম সংশোধনী আইন জাতীয় সংসদে গৃহীত হয়। এই সংশোধনীতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারবর্গকে হত্যার পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল পর্যন্ত অসাংবিধানিক সরকারগুলো যে সমস্ত সামরিক আইনসহ বিভিন্ন আদেশ, অধ্যাদেশ, প্রবিধান জারি করে, তার সবকিছুইকেই আইনগত বৈধতা দেওয়া হয়। ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল জিয়া সামরিক আইন প্রত্যাহার করেন।

ইনডেমনিটি আইন

ইনডেমনিটির আভিধানিক অর্থ দাঁড়ায় কাউকে নিরাপদ করা বা নিরাপত্তা বিধান করা। বাংলাদেশের কোনো আদালতে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং জাতীয় চার নেতাকে হত্যাকারী এইসব অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না– এই মর্মে হত্যাকারীদের ইনডেমনিটি বা নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছিল। এটি একটি মানবতাবিরোধী আইন। জেনারেল জিয়া প্রবর্তিত এই কালো আইনের মাধ্যমে হত্যাকারীদের বিচার করা যাবে না মর্মে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দেওয়ায় বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে হেয় করা হয়েছে। পরবর্তীতে শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৬ সালের ১২ই নভেম্বর জাতীয় সংসদে ইনডেমনিটি আইন বাতিল করে।

উন্নয়ন কর্মসূচি

সব সামরিক সরকারই পূর্ববর্তী সরকারের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তুলে নিজের ক্ষমতা দখলের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে। জিয়া এবং তাঁর অনুসারীরা সাফল্যের সঙ্গে প্রচার-প্রচারণা চালান যে বঙ্গবন্ধুর আমলে দেশের কোনো উন্নয়ন হয়নি; এ দেশের উন্নতি, সুখ-সমৃদ্ধি সবকিছুই করেছেন জিয়া। তিনি ১৯৭৭ সালের ৩০এ এপ্রিল ১৯ দফা নীতি ও কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

জিয়ার কর্মসূচিতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কৃষি উন্নয়নসহ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, নারীর মর্যাদা, সকলের জন্য চিকিৎসা, শ্রমিকদের উন্নতি, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকারসহ বেশ কিছু জনপ্রিয় কর্মসূচি ছিল। তাঁর সময়ে সরকারি কিছু উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যাপক প্রচার লাভ করে। এর মধ্যে খাল খনন, গ্রাম সরকার, যুব সমবায় কেন্দ্র, গণশিক্ষা উল্লেখযোগ্য।

খাল খনন

জিয়ার আমলে সবচেয়ে বেশি আলোচনা হয়েছে খাল খনন কর্মসূচি বা খাল কাটা বিপ্লব। ১৯৭৯ সালের ১লা ডিসেম্বর যশোরের উলশী যদুনাথপুরে খাল কাটা কর্মসূচির সূচনা হয়। তবে খাল খনন কর্মসূচি কৃষির উন্নয়নে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়।

গ্রাম সরকার

প্রতিটি গ্রামে থাকবে একটি গ্রাম সরকার। স্থানীয় সমস্যা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, গণশিক্ষাসহ গ্রামের উন্নয়নে সহায়তা করবে গ্রাম সরকার। ১৯৮০ সালের ৩০এ এপ্রিল সাভারের জিরাবোতে প্রথম গ্রাম সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

গণশিক্ষা

গণশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। ৫৭ লক্ষ শিক্ষার্থীকে পঠন-পাঠনের উপযোগী করার লক্ষ্য নিয়ে জিয়ার সরকার ১৯৮০ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি গণশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করে। যথাযথ পরিকল্পনা ও সমন্বয়ের অভাবে গণশিক্ষা কার্যক্রম সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি।

জিয়া শিল্পখাতের উন্নয়নে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করেন। অনেক সময় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প নামমাত্র মূল্যে ব্যক্তিমালিকানায় বিক্রি করে দেন। তারপরও বিদেশি বিনিয়োগ খুব একটা বৃদ্ধি পায়নি। জিয়াউর রহমানের সময়ে গতানুগতিকভাবে জাতীয় আয়, রাজস্ব আয় ও মাথাপিছু আয় কিছুটা বাড়লেও সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান বৃদ্ধি পায় বহুগুণে।

এসময়ে বিদেশি সাহায্য ও আমদানি নির্ভর অর্থনীতি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। যে কারণে কর ফাঁকি, কালো টাকা, কমিশন এজেন্ট, বিদেশে অর্থ পাচার ঘটনা বাড়তে থাকে। নানা রকম আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে জিয়া শহরে ও গ্রামে এক নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে তোলেন। এই নব্য ধনিক গোষ্ঠী ছিল জিয়ার সামরিক শাসনের সুবিধাভোগী। ব্যবসা ও শিল্পের নামে ব্যাংক থেকে অবৈধ ঋণের অর্থে অনেকে কোটিপতি বনে যায় রাতারাতি। একসময় এই কোটিপতিরাই ঋণখেলাপিতে পরিণত হয়। দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য জাতীয় সম্পদের বিরাট অংশ নষ্ট হয়েছে। অপরিকল্পিত সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি জাতীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে। ১৯৭৫-৭৬ সালের তুলনায় ১৯৭৬-৭৭ সালে খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায় প্রায় ৮ লাখ টন। ১৯৭৯ সালে দেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫১ ভাগে দাঁড়ায়। জ্বালানি, বিদ্যুৎসহ রেশনের চালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের জীবনযাপন বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। সামরিক শাসনের অধীনে দেশের সাধারণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার তেমন উন্নতি হয়নি।

বৈদেশিক সম্পর্ক

অভ্যন্তরীণ নীতির সঙ্গে মিল রেখেই প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমান পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করেন। তিনি মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে জোর দেওয়ার বিষয়টি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন। পররাষ্ট্রনীতি পরিবর্তনের যৌক্তিকতা হিসেবে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের মুসলিম পরিচয়কে বড় করে তোলা হয়। যে কারণে জেনারেল জিয়া শুরু থেকেই রুশ-ভারতবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন।

ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক বেশ শীতল, বৈরি ও তিক্ত হয়ে পড়ে। পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস আর আস্থাহীনতার কারণে দুইদেশের সম্পর্কের অবনতি হয়। বিশেষভাবে ফারাক্কা বাঁধ ও সীমান্তে সংঘর্ষ বাংলাদেশের রাজনীতিকে উত্তপ্ত করে তোলে। ফারাক্কা বাঁধ নিয়ে দেশে-বিদেশে ভারতবিরোধী প্রচারণা ব্যাপক আকার ধারণ করে। জেনারেল জিয়া জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় ফারাক্কা বাঁধের বিষয় উত্থাপন করেন। ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের পরিবর্তনের পর মোরারজি দেশাই ক্ষমতায় এলে জিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন হয়।

জিয়ার সময়ে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের যথেষ্ট উন্নতি হয়। যদিও প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আমলেই। ১৯৭৫ সালের মে মাসে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিও সম্পাদিত হয়। মোশতাক ক্ষমতায় থাকাকালীন ৩১এ আগস্ট, ১৯৭৫ চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। জিয়ার চীন সফরের মধ্য দিয়ে দুইদেশের সম্পর্ক আরও বন্ধুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।

পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে জিয়া বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রদূত বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে দুইদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। বঙ্গবন্ধুর সময়ে পাকিস্তানের কাছে দাবিকৃত সম্পদের হিস্যা ও অবাঙালি পাকিস্তানি নাগরিকদের ফেরত নেওয়ার বিষয় অমীমাংসিত থেকে যায়। জিয়ার অতিমাত্রায় পাকিস্তানপ্রীতির কারণে স্বল্প সময়ে দুইদেশের মধ্যে টেলিযোগাযোগ, বিমান ও নৌ যোগাযোগ, বাণিজ্য চুক্তি ও উচ্চপর্যায়ের শুভেচ্ছা সফর সম্পন্ন হয়। পাকিস্তান সরকার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বারবার পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের দাবি তোলে। তারা জাতীয় সংগীত, জাতীয় পতাকা পরিবর্তনসহ ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে প্রচারণা চালায়। কিন্তু, সংখ্যাগরিষ্ঠ স্বাধীনতা প্রিয় বাঙালির দৃঢ় মনোভাবের কারণে জেনারেল জিয়া এ সকল বিষয়ে অগ্রসর হননি।

জিয়া সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে চেষ্টা করেন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বৃদ্ধির জন্য জিয়া ১৯৮০ সালে সহযোগিতা সংস্থার প্রস্তাব করেন। যদিও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পর বঙ্গবন্ধু প্রথম আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরামের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৮৫ সালে সার্ক গঠনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রস্তাব দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে স্বীকৃতি পায়।

জিয়া হত্যাকাণ্ড

প্রায় সাড়ে পাঁচ বছর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা জিয়াউর রহমানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। দেশে রাজনীতিতে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষ থাকলেও বড় কোনো আন্দোলন তাকে মোকাবেলা করতে হয় নি। দমন-পীড়ন আর ভয়ভীতির কারণে বিরোধী দল তার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে নি। তাই রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়ে জিয়ার ভাবনার কিছু ছিল না। তবে সামরিক বাহিনীর মধ্যে জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করার উদ্দেশ্যে প্রায় সতেরোটি অভ্যুত্থান হয়। প্রতিবার তিনি বিদ্রোহী অফিসারদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন। অভ্যুত্থানের সঙ্গে যুক্ত শত শত সেনাসদস্যেকে মৃত্যুদণ্ড এবং চাকরিচ্যুত করা হয়। তারপরও সেনাবাহিনীর ভেতর থেকেই তাঁর জীবনের ওপর আক্রমণ এসেছে। রাজধানী থেকে প্রায় ১৭০ মাইল দূরে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ১৯৮১ সালের ৩০এ মে সার্কিট হাউসে এক অভ্যুত্থানে তাঁকে হত্যা করে কতিপয় সেনাসদস্য।

বিচারপতি সাত্তারের সরকার

প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়ার হত্যাকাণ্ডের পর সংবিধান অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান এইচ এম এরশাদ উপস্থিত থেকে ৭৮ বছর বয়স্ক সাত্তারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে ১৮০ দিনের মধ্যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৮১ সালের ২১এ সেপ্টেম্বর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ধার্য করা হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিচারপতি সাত্তারকে মনোনয়ন দেয়। কিন্তু সংবিধান অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতির লাভজনক পদে থাকায় নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না। সংসদে বিএনপির সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে ৬ষ্ঠ সংশোধনীর মাধ্যমে ঘোষণা করা হলো উপরাষ্ট্রপতির পদ লাভজনক নয়। সুতরাং বিচারপতি সাত্তারের নির্বাচন করার আর আইনি বাধা থাকল না। সেনাপ্রধান জেনারেল এরশাদ অতিমাত্রায় আনুগত্য দেখাতে গিয়ে ঘোষণা দিলেন যে সেনাবাহিনী নির্বাচনে বিচারপতি সাত্তারের পক্ষে থাকবে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ছিলেন ড. কামাল হোসেন। বিএনপি প্রার্থী সাত্তার সরকারি সুযোগ-সুবিধাসহ নির্বাচনী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। বিরোধী দল নির্বাচনে কারচুপিরও অভিযোগ তোলে। মোট ভোটারের শতকরা ৫৫.৪৭ ভাগ ভোট দান করেন। বিচারপতি সাত্তার প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৬৫.৮০ ভাগ ভোট লাভ করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ড. কামাল হোসেন পেয়েছেন শতকরা ২৬.৩৫ ভাগ ভোট।

নির্বাচিত হয়ে বিচারপতি সাত্তার ২৮এ নভেম্বর ১৯৮১ বিয়াল্লিশ সদস্যের বিশাল মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু, জিয়ার মৃত্যুর পর বিএনপির মধ্যে দলীয় কোন্দল চরম আকার ধারণ করে। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক সংকট এবং আইন-শৃংখলার অবনতির কারণে সাত্তারের জন্য প্রশাসন চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। সীমাহীন দুর্নীতির কারণে বিচারপতি সাত্তার মাত্র সাড়ে তিন মাসের মন্ত্রিসভা বাতিল করেন। এসব করেও তিনি শেষ রক্ষা করতে ব্যর্থ হন। সেনাপ্রধান এরশাদ বলপূর্বক নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জেনারেল এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪এ মার্চ থেকে সামরিক আইন জারি করে বলেন 'দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার লক্ষ্যে এবং সামরিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংকট হতে জনসাধারণকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র বাহিনীকে দেশের শাসনভার গ্রহণ করতে হয়েছে।' অবৈধ ক্ষমতা দখলকারীরা এমনি নানা অজুহাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিজেদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এরশাদ ১৯৮২-১৯৯০ পর্যন্ত শাসনকালে জনসাধারণকে সংকটমুক্ত করার পরিবর্তে নতুন নতুন সংকট সৃষ্টি করেছেন।

সামরিক শাসন : জেনারেল এরশাদের সরকার

লেঃ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালে ক্ষমতা দখল করে ১৯৯০ সালে পর্যন্ত বাংলাদেশ শাসন করেন। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক আর ১৯৮৩ সালের ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ছিলেন রাষ্ট্রপতি। এরশাদ অল্প সময়ের জন্য বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে (২৭এ মার্চ, ১৯৮২ থেকে ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৮৩) রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত রাখেন। সুবিধাজনক সময়ে তাঁকেও অপসারণ করতে দ্বিধা করেন নি। একই সাথে এরশাদ জাতীয় সংসদ বাতিল করেন।

প্রশাসনিক সংস্কার

লেঃ জেনারেল হুসেইন মোঃ এরশাদ ক্ষমতায় এসে বেসামরিক প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। তিনি ১৯৮২ সালের ২৮এ এপ্রিল প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে তিনি প্রশাসনিক কাঠামোতে কিছু পরিবর্তন করেন।

ক. উপজেলা ব্যবস্থা: থানা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় সংস্কার করে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। উপজেলায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির অধীনে সরকারি আমলাদের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালিত হবে। ১৯৮২ সালে ৭ই নভেম্বর

৪৫টি থানাকে উপজেলা করার মধ্য দিয়ে এই ব্যবস্থার যাত্রা শুরু। পর্যায়ক্রমে ৪৬০টি থানা উপজেলায় পরিণত হয়। ১৯৮৩ সালে ১৪ই মার্চ থানার পরিবর্তে উপজেলা নামকরণ করা হয়।

খ **মহকুমাকে জেলা ঘোষণা**:প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশকে মোট ৬৪টি জেলায় ভাগ করা হয়।

গ. **বিচারব্যবস্থায় সংস্কার** :বিচারব্যবস্থায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। উপজেলায় পৃথক ম্যাজিস্ট্রেট ও মুন্সেফ আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া রংপুর, যশোর বরিশাল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং সিলেটে হাইকোর্টের স্থায়ী বেঞ্চ প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের কারণে ঢাকার বাইরের বেঞ্চগুলো বাতিল করা হয়।

এরশাদ শিক্ষা, কৃষি, ভূমি, ঔষধনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু নীতিগুলোর জনবিরোধী ধারার কারণে সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষের সমর্থন পায় নি। কারণ প্রকৃত সুফল জনগণ পায় নি। এরশাদ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের ব্যাপকভাবে নিয়োগ দিতে শুরু করেন। উদ্দেশ্য সরকারি আলমাতন্ত্রের ওপর সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ড

এরশাদ নানাভাবে নিজেকে একজন জনদরদি নেতা হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। সভা-সমাবেশ ও সরকারি প্রচারমাধ্যমে বলা হয়েছে এরশাদের উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন। ১৯৮৩ সালের ১৭ই মার্চ তিনি জনগণের সার্বিক কল্যাণে ১৮ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। জাতীয় সংহতি থেকে শুরু করে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, কর্মসংস্থানসহ পররাষ্ট্রনীতি পর্যন্ত সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সরকারি টেলিভিশন, রেডিও, সংবাদপত্রে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রচারণা চালানো হলেও সামগ্রিকভাবে তাঁর আমলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক ছিল না। প্রকৃত উন্নয়ন না হওয়ার প্রধান কারণ দুর্নীতি আর সীমাহীন লুটপাট। এরশাদের সময়ে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা হতাশাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮০-৮১ সালে উন্নয়ন বাজেটের ৬৫ শতাংশ ছিল বিদেশি সাহায্যনির্ভর, ১৯৮৮-৮৯ সালে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১২৬.৩ শতাংশ। ঋণখেলাপি সংস্কৃতিতে সামরিক-বেসামরিক আমলা ও দলছুট রাজনীতিবিদরা লাভবান হয়েছেন। খাদ্য উৎপাদন, জিডিপি, গড় প্রবৃদ্ধি সব ছিল নিম্নগামী। তবে সামরিক খাতে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ নিজের ক্ষমতার ভিত শক্তিশালী করার জন্য ব্যাপকভাবে সামরিক বাহিনীর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করেছিলেন।

বৈদেশিক সম্পর্ক

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জেনারেল এরশাদ নতুন কিছু করেন নি। তিনি জেনারেল জিয়ার পথই অনুসরণ করেন। ভারতের বিপরীতে চীনের সঙ্গে সুসম্পর্ক আরও দৃঢ় করার উদ্যোগ নেন। বিশেষভাবে সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণ, অস্ত্রশস্ত্রের জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়।

পাকিস্তান, সৌদি আরব, ইরাকসহ মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। তবে তিনি অতিমাত্রায় মার্কিনপন্থী ছিলেন। মার্কিন সরকারকে সন্তুষ্ট করার জন্য ঢাকা থেকে সোভিয়েত কূটনীতিককে বহিষ্কার করেন। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরশাদ উত্তেজনা পরিহারের চেষ্টা করেন। তিনি ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে কোনো উদ্যোগ নেননি।

বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এরশাদের একটি বড় সাফল্য হলো সার্ক গঠন। দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)। এই সংস্থার প্রথম শীর্ষ সম্মেলন ১৯৮৫ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

গণভোট

সামরিক শাসকদের গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী এরশাদও বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকে বৈধতা দেওয়ার জন্য গণভোটের আয়োজন করেন। এরশাদ রাজনৈতিক দলগুলোর বিরোধিতার কারণে রাষ্ট্রপতি ও জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে ব্যর্থ হন। অবশেষে ১৯৮৫ সালের ২১এ মার্চ গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ জনগণ এই নির্বাচনে কোনো আগ্রহ দেখায় নি। তারপরও জেনারেল এরশাদ প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৯৪.১৪ ভাগ ভোট লাভ করেন। সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের কারসাজির কারণে তাঁর পক্ষে বিপুল ভোট পাওয়া সম্ভব হয়।

রাজনৈতিক দল গঠন

ক্ষমতা দখলকে পাকাপোক্ত করার জন্য এরশাদ একটি রাজনৈতিক দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৮৪ সালের জুলাই মাসে 'জনদল' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই দলের অঙ্গসংগঠন হিসেবে গড়ে উঠে নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ, নতুন বাংলা যুব সংহতি, নতুন বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন ইত্যাদি। সুবিধাবাদী, দলছুট বিভিন্ন নেতাকর্মী নিয়ে জনদল গঠিত হয়। এরপর তিনি ১৯৮৫ সালের ১৬ই আগস্ট প্রতিষ্ঠা করেন জাতীয় ফ্রন্ট। জনসমর্থনহীন কিছু রাজনৈতিক দল ও নেতা ফ্রন্টে যোগ দেন। অবশেষে, ১৯৮৬ সালের ১লা জানুয়ারি জেনারেল এরশাদের রাজনৈতিক দল 'জাতীয় পার্টি'র যাত্রা শুরু হয়।

নির্বাচন

১৯৮৬ সালের ৭ই মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে এরশাদের জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট এবং জামায়াতে ইসলামিসহ মোট ২৮টি দল অংশগ্রহণ করে। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট নির্বাচন বর্জন করে। নির্বাচনে জাতীয় পার্টি মোট ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে। আওয়ামী লীগ এককভাবে ৭৬টি আসন লাভ করে দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় আসন গ্রহণ করে। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য দল এরশাদের বিরুদ্ধে মিডিয়া ক্যু'র মাধ্যমে বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে। পর্যবেক্ষকগণও এ অভিযোগের যথার্থতাকে সমর্থন করেন। ১৯৮৬ সালের ১৫ই অক্টোবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিরোধী দলগুলো নির্বাচন বয়কট করে। প্রহসনমূলক এ নির্বাচনে এরশাদকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম

লে: জেনারেল হুসেইন মো: এরশাদ সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম বলে ঘোষণা করেন। এই সংশোধনীর মাধ্যমে তিনি ইসলামপন্থী দলগুলোর সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এরশাদ এই সংশোধনী আনেন। বলার অপেক্ষা রাখে না ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা ছিল মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থী।

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের শাসকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ছাত্র-জনতার প্রতিরোধ, আন্দোলন, সংগ্রাম, হরতাল মোকাবেলা করেছেন জেনারেল এরশাদ। ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে ছাত্ররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যে কারণে এরশাদ বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন।

এরশাদবিরোধী আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলো বিভিন্ন জোট গড়ে তোলেন। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বে বাম সংগঠনের ৫ দলীয় জোট গড়ে উঠে (যা পরবর্তীতে ১৫ দলীয় জোটে রূপান্তরিত হয়)। অন্যদিকে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট গড়ে উঠে।

আন্দোলন দমনে জেনারেল এরশাদ দমন, পীড়ন, অত্যাচার ও হত্যার পথ বেছে নেন। ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশের ট্রাক তুলে দেওয়া, সরাসরি গুলি করার ঘটনাও কম হয়নি। ১৯৮৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে জাফর, জয়নাল, মোজাম্মেল নিহত হন; বহু নেতাকর্মী আটক হয়। ছাত্র আন্দোলন দমনে এরশাদের নতুন বাংলা ছাত্রসমাজ সন্ত্রাসের পথ অবলম্বন করে। ১৯৮৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি এরশাদের ছাত্র সংগঠনের হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাউফুন বসুনিয়া নিহত হন। এরশাদবিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য ২২টি ছাত্র সংগঠন মিলে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

১৯৮৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রধান রাজনৈতিকদলগুলো উপলব্ধি করে যে এরশাদের বিরুদ্ধে অভিন্ন কর্মসূচি ছাড়া আন্দোলন সফল হবে না। উল্লেখ্য ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর থেকেই এরশাদ সরকারের বিরুদ্ধে সকল রাজনৈতিক দল, সাধারণ জনগণ এবং নাগরিক সমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। এরশাদের পদত্যাগ ও একটি অর্থবহ নির্বাচনের দাবিতে বিরোধী দল দুর্বার গণ-আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৭ সালে সংসদ থেকে একযোগে বিরোধী দল পদত্যাগ করলে ডিসেম্বরে জাতীয় সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়। ১৯৮৮ সালের ৩রা মার্চ চতুর্থ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ দেশের প্রধান দলগুলো নির্বাচন বর্জন করে। ভোটারবিহীন, দলবিহীন এ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ২৫১টি আসন পেয়ে বিজয়ী হয়। সরকার অনুগত আ.স.ম. রবের নেতৃত্বাধীন সম্মিলিত বিরোধী জোট (কপ) পায় ১৯টি আসন। বাকি আসনের ৩টি জাসদ (সিরাজ), ২টি ফ্রিডম পার্টি এবং ২৫টি স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পান।

নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান ও এরশাদের পতন

দীর্ঘ নয় বছরের প্রায় পুরো সময়টাই জনগণ জেনারেল এরশাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ১৫ দলীয় জোট, বিএনপির নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট, শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), আইনজীবী সমন্বয় পরিষদ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, কৃষক সংগঠনসহ এরশাদবিরোধী চেতনা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যায়। হরতাল-অবরোধে প্রশাসনে একপ্রকার স্থবিরতা দেখা দেয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে ১৯৮৭ সালের ১০ই নভেম্বর বুকে ও পিঠে 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক, স্বৈরাচার নিপাত যাক' লেখাসহ ঢাকার জিপিও-এর নিকট জিরো পয়েন্টে পুলিশের গুলিতে নূর হোসেন নিহত হন। এতে জনগণ আরও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

১৯৮৭ সালের ১২ই নভেম্বর শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে গ্রেফতার করে এবং ২৭এ নভেম্বর এরশাদ সরকার দেশে জরুরি অবস্থার ঘোষণা দেন। ১৯৮৮ সালের ২৪এ জানুয়ারি চট্টগ্রামে শেখ হাসিনার এক সমাবেশে নির্বিচারে জনতার উপর গুলি চালায়, অল্পের জন্য শেখ হাসিনা রক্ষা পান। এর বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। ১৯৯০ সালের ১০ই অক্টোবর বিরোধী জোট ও দলগুলোর সচিবালয় ঘেরাও কর্মসূচি রাজনৈতিক অঙ্গনকে উত্তপ্ত করে তোলে। এদিন মিছিলে গুলি বর্ষণে ৫ জন নিহত এবং তিন শতাধিক আহত হয়। ধারাবাহিক আন্দোলনের পথ ধরে ওই বছরই সালের ২৭এ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির পাশে পুলিশের গুলিতে ডা: শামসুল আলম খান মিলন নিহত হলে এরশাদবিরোধী আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ ধারণ করে। ২৭এ নভেম্বর সরকার জরুরি অবস্থা ও কারফিউ জারি করে। ২৭এ নভেম্বর সাংবাদিকরা সংবাদপত্র বন্ধ করে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক সম্মিলিতভাবে মিছিল বের করে কারফিউ ও জরুরি আইন অমান্য করেন। রাজপথ চলে যায় জনতার দখলে। ঢাকা পরিণত হয় মিছিলের শহরে। এ অবস্থায় বিরোধী রাজনৈতিক ৩ জোটের রূপরেখা অনুযায়ী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদকে প্রধান করে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়। ১৯৯০ সালের ৬ই ডিসেম্বর তাঁর কাছে এরশাদ ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হন। ছাত্র-জনতার এই গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদের পতনের ফলে দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে।

অনুশীলনমূলক প্রশ্ন

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. কে 'ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ, ১৯৭৫' জারি করেন?

ক. খোন্দাকার মোশতাক আহমদ খ. জেনারেল জিয়াউর রহমান

গ. ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ঘ. বিচারপতি সায়েম

২. ক্ষমতা সুসংহতকরণে জেনারেল জিয়াউর রহমানের বিশেষ কৌশলের মধ্যে ছিল-

i. সামরিক বাজেট বৃদ্ধি করা

ii. অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সূচনা করা

iii. 'সার্ক' গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

অগণতান্ত্রিক সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে তার সমভাবাপন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত গণহত্যা, অসাংবিধানিক ক্ষমতা দখল ইত্যাদি অবৈধ কাজের নিরাপত্তা ও বৈধতা দেয় একই সাথে তাদের অপরাধের বিচারের পথ রুদ্ধ করে সংসদে একটি আইনও পাশ করে।

৩. উদ্দীপকের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশ সংবিধানের কোন সংশোধনীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?

ক. প্রথম খ. দ্বিতীয়

গ. চতুর্থ ঘ. পঞ্চম

৪. এই সংশোধনীর মাধ্যমে-

i. আইনের শাসন রুদ্ধ হয়

ii. বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়

iii. সামাজিক জীবন বাধাগ্রস্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. একটি চলচিত্রে সামরিক শাসনবিরোধী এক গণ-অভ্যুত্থানে মানুষের জোয়ার দেখে এলিন বিস্মিত হয়েছিল। সামরিক শাসনের নিপীড়নে মানুষ ছিল নির্যাতিত ও অবরুদ্ধ। ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাধারণ জনগণ, কৃষক, শ্রমিক, আইনজীবী, ডাক্তার, সাংস্কৃতিক জোট বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের মুখে ছিল গণতন্ত্রের মুক্তির স্লোগান। পুলিশের বাঁধা-গুলি কোন কিছুই তাদেরকে দমাতে পারছিল না। উপরন্তু এসব বাঁধা -বিপত্তি জনগণকে আরও ক্ষিপ্ত করে তোলে, চারিদিকে শুধু মিছিল আর মিছিল।

ক. উপজেলা ব্যবস্থা কার সময় প্রবর্তিত হয় ?

খ. 'ইনডেমনিটি আইন' বলতে কী বুঝায় ?

গ. উদ্দীপকে স্বাধীনতা পরবর্তী কোন অভ্যুত্থানের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'এই আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশে গণতন্ত্র মুক্তি পায়'– মূল্যায়ন কর।

সমাপ্ত

২০১৭
শিক্ষাবর্ষ
৯–১০ ইতিহাস

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মুক্তিযোদ্ধারা দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯২১ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
বাংলাদেশ

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য